ছিন্নমুকুল

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত

"ওরে রে বিকট-কীট নিদারুণ শোক,
এহেন কোমল পুষ্পে তোর কিরে বাসা ?"

তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য

(চতুর্থ সংস্করণ)

মূল্য ১।০

১৩২০ সাল

ছিন্নমুকুল

প্রথম পরিচ্ছেদ

সমর্পণ

বোম্বাই সহরের পারেল পাহাড়-শিখরস্থ একটি অট্টালিকাকক্ষে চারুশীলা রুগ্নশয্যায় শয়ান; নিকটে ভগিনী সুশীলা আসীন। তখন প্রাতঃকাল; দূরে পাহাড়ের নিম্নদেশে সুনীল সমুদ্র প্রাতঃ-সমীরে সুধীর ভাবে তরঙ্গিত হইতেছিল, এবং বক্ষঃস্থিত নৌকাসমূহকে বিলাস ভাবে মৃদুমন্দ দোলাইয়া, লীলাচ্ছলে বেলাভূমিতে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল। সূর্য্য উঠিয়াছে, তাহার সহস্র কিরণমালা বিদ্যুৎ রাশির ন্যায় সেই সমুদ্র-উরসে প্রতিফলিত হইয়া ঝিকমিক করিতেছে। পাহাড়ের শিখরে শিখরে, দূরস্থ পর্ব্বতের শিখরে শিখরে, প্রাতঃসূর্য্যের হেমাভ রশ্মি জ্বলিতেছে। তটেই বোম্বাই সহর, পাহাড় হইতে সেই মহানগরীর বিচিত্র রমণীয়তা দ্বিগুণ রমণীয় বলিয়া বোধ হইতেছিল। এখনও সহর সম্পূর্ণ জাগরিত হয় নাই, এখনও বৈষয়িক কোলাহল আরম্ভ হয় নাই, এখনও প্রকৃতির অকৃত্রিম শোভাই চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

সুশীলা সাশ্রুলোচনে ভগিনীর সহিত কথা কহিতে কহিতে মাঝে মাঝে মুক্ত বাতায়ন দিয়া এক একবার নিম্নস্থ সহরের প্রতি, এক একবার সেই সূর্য্যরশ্মিশোভিত সমুদ্রের প্রতি চাহিতেছিলেন। সুশীলার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতির অধিক হইবে না। দেখিতে সুশ্রী, চক্ষু নাসিকা ওষ্ঠাধর সকলি সুগঠন, কিন্তু বিধবার বেশ; যুবতী-মুখে প্রৌঢ়ার বিজ্ঞতা ব্যাপ্ত হওয়ায় তাঁহার সৌন্দর্য্যের তেমন আকর্ষণী শক্তি ছিল না। ইহাঁরা দুই-জনেই এলাহাবাদের সঙ্গতিপন্ন ব্রাহ্ম স্বর্গীয় তারাকান্ত মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। চারুশীলা বিবাহের পর হইতে স্বামীর সহিত বোম্বাই সহরে ছিলেন; সুশীলার বাল্যকাল হইতেই পিত্রালয়ে বাস। সুশীলা একদিন হঠাৎ শুনিলেন যে, বাণিজ্যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ভগিনীপতির মৃত্যু হইয়াছে, এবং চারুশীলাও শয্যাগত; শুনিয়া সুশীলা ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহার দূর সম্পর্কীয় দেবর হিরণকুমারকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিয়াছেন।

কত দিন পরে আজ দুই ভগিনীতে সাক্ষাৎ, সেই চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় স্বামীর সহিত চারুশীলা বোম্বাই চলিয়া আসেন, তখন সুশীলা দশম বর্ষীয়া মাত্র; সেই অবধি আর তাঁহাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। তাহার পর এই অল্প দিনের মধ্যে দুজনের জীবনে কত ঘটনা ঘটিয়াছে, কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেই বিদায়ের সময় জীবনের কেবল আরম্ভ মাত্র, তখন জীবনে কতই সুখের আশা ছিল, কিন্তু ইহার মধ্যেই সব ফুরাইয়াছে, ইহার মধ্যেই দীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে, দুজনেই বিধবা হইয়াছেন। এখন এই অবস্থায় দুজনের দেখা হইয়া তাঁহারা কত কাঁদিতেছিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে দুজনে কতই দুঃখের কথা কহিতেছিলেন, সে সকল এস্থলে বলা বাহুল্য মাত্র। অশ্রু মুছিতে মুছিতে একবার সুশীলা বাটীর সন্নিধানস্থ উদ্যানে দৃষ্টিপাত করিলেন—দেখিলেন উদ্যানে দুইটি বালক বালিকা খেলিতেছে,

কিছু দূরে হিরণকুমার দাঁড়াইয়া তাহাদের খেলা দেখিতেছেন। হিরণকুমার অষ্টাদশবর্ষীয়, তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বলশ্যাম, চক্ষু সুদীর্ঘ, দৃষ্টি শান্ত অথচ জ্যোতির্ম্ময়। যৌবনের প্রাক্কালে যে সকল মনের গুণ স্ফূর্ত্তি পাইয়া মানুষের বাহ্য আকৃতিকেও স্ফূর্ত্তিময় করিয়া তোলে, সেই সকল গুণের প্রাচুর্য্যবশতঃ যেন হিরণকুমারের মুখে এবং সমস্ত শরীরে একটি অলৌকিক তেজের প্রভাব প্রকাশ পাইতেছিল। হিরণকুমার দেখিলেন, বালকটি কখনও উদ্যানে কোদাল লইয়া মাটি কাটিতেছে, কখনও দৌড়িয়া গাছের কোন শুষ্ক শাখা ভাঙ্গিতেছে, কখনও বা কোন জলপাত্র হস্তে লইয়া ফুলগাছের গোড়ায় জল ঢালিতেছে। বালকটি দশমবর্ষীয়, শরীর সুগোল সুঠাম হৃষ্টপুষ্ট, মুখাবয়ব সুন্দর, কৃষ্ণ ভ্রূযুগলের নীচে চঞ্চল চক্ষুর্দ্বয় যেন জ্বলিতেছে, কুঞ্চিত কেশরাশি উন্নত ললাট বেষ্টন করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। মুখশ্রী দেখিলে বালকটিকে সরল উদারচেতা, এবং কিছু উদ্ধতস্বভাব বলিয়া বোধ হয়।

বালিকাটি কিছু কৃশ, ক্ষুদ্র মস্তকে নিবিড় কেশজাল,—তাহা স্কন্ধদেশের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত আবরিত করিয়াছে; মধ্যে মধ্যে সেই স্থানচ্যুত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশি বক্ষে কপোলে পড়িয়া তাহার গোলাপকলিকা সদৃশ মুখখানির মধুরতা বৃদ্ধি করিতেছে। তাহার সেই সুদীর্ঘ কেশর-ঘন চক্ষু দুইটির দৃষ্টি শান্ত ও করুণ; দৃষ্টিতে যেন কেমন সঙ্কুচিত, কেমন শশঙ্কিত ভাব; নেত্রপল্লব যেন কিসের ভারে সর্ব্বদাই ভারাক্রান্ত, তাহাদের যেন সেই দীর্ঘায়তন চক্ষুর সমস্ত আয়তন বিকাশ করিবার সামর্থ্যই নাই। মুখখানি শৈশবের চঞ্চলতাপূর্ণ প্রফুল্লভাবে স্ফূর্ত্তিযুক্ত নহে। তাহা কেমন যেন ঈষৎ বিষণ্ণভাবে আবরিত, পূর্ণিমার জ্বলন্ত উজ্জ্বলতার উপর যেন মেঘের ছায়া পড়িয়া সমস্ত মূর্ত্তিতে একটু ভয়ের ভাব, একটি বিষণ্ণ ভাব, একটি করুণ ভাব আঁকিয়া দিয়াছে।

খেলা করিতে করিতে সহসা বালকটি বালিকার নিকটে দৌড়িয়া আসিয়া বলিল "কনক, আয়, আয়, দেখবি কেমন ফুল ফুটেছে ?" বালিকা আস্তে আস্তে বলিল "কোথায় ?" "ঐ দিকে"—এই কথা বলিয়াই বালক কনকের হস্তাকর্ষণ পূর্ব্বক সেই দিকে তাহাকে লইয়া চলিল। বালিকা দুর্ব্বল, ভ্রাতার সঙ্গে সমান দৌড়িতে পারে না, কষ্টে খানিক দূর আসিয়া, পড়িবার উপক্রম করিল, অমনি বালক "তুই চল্‌তে পারিস্‌ নে—তুই থাক্‌" বলিয়া মনের বেগে সেই প্রস্ফুটিত ফুলবৃক্ষের নিকট দৌড়িল, তাহার আর বিলম্ব সহে না। বালকটি চঞ্চল অসংযতচিত্ত, যখনি যা মনে আসে তখনি তাহা না করিয়া থাকিতে পারে না। বালক হইতে বালিকাটি আবার সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, সে যেন দৌড়িতে জানে না, যেন চলিতে জানে না, একস্থানে দাঁড়াইয়া নিস্তব্ধে, অনিমেষলোচনে, সমুদ্রক্রীড়া দেখিতেই সেই সপ্তমবর্ষীয়া বালিকা নিমগ্ন ছিল। দেখিতে দেখিতে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে কত কি ভাবের উদয় হইতেছিল কে বলিবে। সহসা একটি পুষ্পবৃক্ষস্থিত প্রজাপতির প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। সে অতি ধীরে ধীরে, অতি ভয়ে ভয়ে পদক্ষেপ করিয়া যে গাছে প্রজাপতি বসিয়াছিল সেই গাছের নিকট আসিয়া একদৃষ্টে প্রজাপতির দিকে চাহিয়া রহিল, পরে কি ভাবিয়া কে জানে আস্তে আস্তে তাহার ক্ষুদ্র হাতটি তুলিয়া প্রজাপতির গাত্র স্পর্শ করিতে গেল, অমনি প্রজাপতিটা উড়িয়া আর একটি বৃক্ষে গিয়া বসিল। বালিকার মুখকান্তি যেন বিষণ্ণতর হইয়া পড়িল, যেন মনে মনে বলিতে লাগিল "প্রজাপতি, তুমি পলাইলে কেন, আমি আদর করিয়া ছুঁইতে গেলাম, তবে পলাইলে কেন ?" বালিকা ক্ষুণ্ণমনে সেখান হইতে সরিয়া একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলের নিকট গেল; বিষণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ফুলটি দেখিতে লাগিল। দেখিতেও ভয়, কে যেন এখনি আসিয়া তাহার দেখায় বাধা দিবে, কে যেন তাহার সেই ভালবাসার

ফুলটি তাহার দেখা বন্ধ করিবার জন্যই তুলিয়া লইবে। বালিকা ফুলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ধীরে ধীরে সেই ফুলটির বৃন্তে আপনার কুসুম-হস্ত রাখিল, ধীরে ধীরে সেই ফুলটি তুলিয়া হস্তে লইয়া সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতে লাগিল। ফুল তুলিবার সময় বালক দেখে নাই; হঠাৎ এদিকে দৃষ্টি পড়ায়, ভগিনীর হস্তে ফুল দেখিতে পাইবামাত্র, সক্রোধে ছুটিয়া আসিয়া ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিল "আমার গোলাপ ছিঁড়্‌লি যে?" বালিকা ভয়ে জড়সড় হইয়া কাঁদ' কাঁদ' ভাবে ভ্রাতার দিকে চাহিয়া রহিল, কি যেন বলিতে গেল কিন্তু পারিল না, কথা আটকিয়া গেল। আবার আরক্ত নয়নে তাহাব ভ্রাতা বলিল "তুই যে বড় আমার ফুল ছিঁড়্‌লি।" বালিকা তেমনি করুণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। যেন নীরবে ছল ছল নেত্রে কত ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে, কিন্তু কোন কথা ফুটিয়া বাহির হইল না। একবার অতি অস্ফুট মৃদুস্বরে, অতি ধীরে ধীরে বলিল, "আর তুল্‌ব না"; সে কথা ক্রুদ্ধ বালকের কর্ণে প্রবেশ করিল না। ভগিনীকে মৌন দৃষ্টে বালক উত্তরোত্তর অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া, "কেন ফুল ছিঁড়্‌লি" বলিতে বলিতে সরোষে বালিকাকে মারিতে হস্তোত্তোলন করিল, এমন সময় কে একজন অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। সেই অপরিচিত ব্যক্তিটি হিরণকুমার। তিনি এতক্ষণ দাঁড়াইয়া তাহাদের খেলা দেখিতেছিলেন। বালকটি বালিকাকে মারিতে উদ্যত দেখিয়া তিনি আর নিরপেক্ষ থাকিতে পারিলেন না। তিনি ছুটিয়া আসিয়া বালকের হাত চাপিয়া ধরিলেন। বালক তাঁহার ব্যবহারে অত্যন্ত আশ্চর্য্য, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল; সে কখনো কিছুতে বাধা পায় নাই, যখনি যাহা মনে করিয়াছে তখনি তাহা করিয়াছে, সহসা আজ বাধা পাইয়া নিতান্ত অপমানিত বোধে সরোষে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু চেষ্টা নিষ্ফল হওয়ায় মনে মনে গর্জ্জিতে লাগিল। বালক একদিকে সরল ও উদার, অন্যদিকে গর্ব্বিত ও উদ্ধত—কাহারো প্রভুত্ব

সহ্য করিতে পারে না, কিছুতে বাধা প্রাপ্ত হইলে অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠে। সে মিষ্ট কথার দাস কিন্তু বল-পুর্ব্বক কেহ তাহাকে কিছুই করাইতে পারে না, অতি অল্পেতেই সে ক্রুদ্ধ হয়, আবার অল্পেতেই তাহার ক্রোধ নিবিয়া যায়। ছেলেবেলা হইতে বালক বাপ মায়ের অতিশয় আদুরে, তাঁহাদের নিকট হইতে কখনো কোন বিষয়ে প্রায় ধমক্ খায় নাই, যখনি তাহার সহিত তাহার ভগিনীর বিবাদ হইয়াছে, সে পিতামাতার কাছ হইতে স্বপক্ষেই সমর্থন পাইয়া আসিয়াছে, এই কারণে তাহার স্বভাব অন্যের সুখ দুঃখের প্রতি কতকটা উদাসীন ও আত্মম্ভরি হইয়া পড়িয়াছে। তাহা না হইলে—তাহার পিতামাতা যত্ন করিয়া শিক্ষা দিতে জানিলে এই উদার বালকটির স্বভাব অতি উৎকৃষ্ট হইতে পারিত। তাহার অদৃষ্টে যাহা কখনও হয় নাই তাহা আজ হওয়াতে সে অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িল। এই অপমান তাহার যেন শিরায় শিরায় বিঁধিতে লাগিল। বালক যখন দেখিল হাত ছাড়াইতে একান্ত অক্ষম, তখন সে আর কিছু না করিয়া, মৌনভাবে আরক্ত লোচনে হিরণের দিকে চাহিয়া রহিল। পাছে হাত ছাড়িলে বালক আবার বালিকাকে মারে, সেই ভয়ে হিরণ হাত না ছাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিলেন "আর বোন্‌টিকে মার্‌বে না বল!" বালক এই কথায় কেবল ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিল "মার্‌বো।"

হিরণ। তবে তোমার হাত ছাড়্‌ব না।"

বালক। "হাত ছেড়ে দেও, তুমি হাত ধরবার কে?" হিরণ আবার বলিলেন "বল মার্‌বে না, তা হলে এখনি ছেড়ে দেব।" বালক আর একবার হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া বলিয়া উঠিল "আমার বোন্, আমি মারব—তুমি বলবার কে?" তাহাকে এইরূপ ক্রোধান্ধ দেখিয়া, হিরণকুমার মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। বালক তাহাতে আরও যেন অপমানিত বোধ করিয়া নীরবে ফুলিতে লাগিল। বালিকা এতক্ষণ ভয়ে এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল.

এখন আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া হিরণকে বলিল "দাদার হাত ছেড়ে দাও"—হিরণ হাত ছাড়িয়া দিলেন। বালক তখন গম্ভীর ভাবে আরক্ত অথচ অশ্রুময় লোচনে নিস্তব্ধে বাগান হইতে প্রস্থান করিল। অন্য সময় হইলে সে হয় তো মাতার নিকট আসিয়া কত অভিযোগ করিত—কিন্তু আজ তাহা করিল না, একাকী আজ শয়নগৃহে আসিয়া অনেকক্ষণ শুইয়া রহিল। হিরণ বালিকার হাত ধরিয়া গৃহাভিমুখী হইলেন। গৃহে আসিতে আসিতে বালিকা বলিল "কেন তুমি দাদার হাত ধর্‌লে?"

ইহার অনেকক্ষণ পরে বালক বালিকা দুইটি, রুগ্নকক্ষে মাতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। বালকটি অন্য দিনের ন্যায় তত প্রফুল্ল নহে—যেন কিছু ম্রিয়মাণ, তাহা দেখিয়া পীড়িতা মাতা ব্যাকুল ভাবে তাহাকে কাছে ডাকিলেন। কাছে বসিলে চারুশীলা তাঁহার দুর্ব্বল রুগ্নহস্তে ধীরে ধীরে পুত্রের মস্তকে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "কেন রে প্রমোদ, আজ তোর মুখখানি শুক্‌নো দেখছি কেন।" বালক কথা কহিল না। ততক্ষণ বালিকা কনকলতা ভয়ে ভয়ে গৃহের একটি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে তাহার মাতা কিছুই বলিলেন না—একবার তাহার দিকে চাহিয়াও দেখিলেন না। মাতার পক্ষপাতিতা দেখিয়া সুশীলা তাহাকে ডাকিয়া কোলে বসাইয়া চারুশীলাকে বলিলেন "দিদি, এটি বুঝি তোমার ফেল্‌না মেয়ে?" চারুশীলার সেই রুগ্নওষ্ঠে দিবাভাগের বিদ্যুতের ন্যায় একটু হাসির রেখা পড়িল। ক্রমে দিন যাইতে লাগিল; কত চিকিৎসক আসিয়া দেখিল, কিছুতেই চারুশীলা আরোগ্য লাভ করিতে পারিলেন না। দুই সপ্তাহ কাল কষ্টে জীবন ধারণ করিয়া ভগিনীর হস্তে সন্তানগুলি সমর্পণ পূর্ব্বক তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। সুশীলা শোকসন্তপ্ত চিত্তে তাহাদিগকে লইয়া এলাহাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পথহারা

আট দশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। আজ শরৎকালের এই প্রশান্ত অপরাহ্ন সময়ে পূর্ণযৌবনা রমণীর মত ভাগীরথী হেলিতে দুলিতে কানপুরের ক্রোড়দেশ দিয়া আপনার আবেশেই বহিয়া যাইতেছে। পশ্চিম সূর্য্যের সহস্র কিরণে আকাশের সহস্র ছিন্নবিছিন্ন ভগ্নবিভগ্ন জলদখণ্ড সুরঞ্জিত হইয়া গঙ্গার বক্ষে প্রতিফলিত হইয়াছে।

সেই শোভাময়ী ভাগীরথীর অপর পারে একটি নিবিড় বনশ্রেণী দীর্ঘভাবে দূর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। বনশ্রেণী কোথাও সঙ্কীর্ণ, কোথাও বিস্তৃত, কোথাও নিবিড়। সেখানে কোথাও অশ্বত্থ বটের বিশাল শাখায় বসিয়া নানা বর্ণের পক্ষিগণ ঘোর কলরব করিতেছে, কোথাও ঝোপ ঝাপের মধ্য দিয়া কখনো দু একটি বন্য শৃগাল, বন্য বরাহ ছুটিয়া যাইতেছে, কখনো বা দুই একটী মৃগদম্পাতি অস্পষ্টভাবে দেখা দিয়া জঙ্গলে মিশাইয়া যাইতেছে। অনেক দূর পর্য্যন্ত মনুষ্যের বসতির চিহ্ন মাত্র নাই; যে দিকে চাও কেবলি বনশ্রেণী। সহসা আজ অপরাহ্নে এই নিভৃত নিস্তব্ধ অরণ্য বন্দুকের গর্জ্জনে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। দুই একটি বন্য পশু যাহাদিগকে ইতিপূর্ব্বে বিচরণ করিতে দেখা গিয়াছিল, তাহারা সভয়ে নিবিড় বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে লুকাইল, ভীতস্বরে কোলাহল করিয়া পক্ষিগণ নিকটস্থ ঝোপ-ঝাপ হইতে উড়িয়া স্থানান্তরে গিয়া বসিল। দেখিতে দেখিতে সম্মুখের অশ্বত্থ-বৃক্ষস্থিত দুইটি সুন্দর পক্ষিযুগলের মধ্যে একটি সেই বন্দুকের গুলিবিদ্ধ হইয়া বৃক্ষচ্যুত পল্লবের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে ভূমে লুটাইয়া পড়িল; আর একটি প্রাণভয়ে উড়িয়া দূরস্থিত অন্য বৃক্ষের উপর গিয়া বসিল। শীকারী যুবক সহর্ষে ভূপতিত পক্ষীটির প্রতি

বারেক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সঙ্গীকে বলিলেন "পাখীটি থলিতে রাখ আমি অন্যটির উদ্দেশে যাই।" বলিয়া তিনি তীর বেগে ছুটিলেন। যামিনী বন্ধুর কথামত মৃত পক্ষীটিকে স্কন্ধের থলিতে রাখিয়া বলিলেন—"কিন্তু প্রমোদ মনে রেখো—পাখীটি আমি মেরেছি।

আট বৎসর পূর্ব্বে পাবেল পাহাড়ে আমরা যে দুরন্ত বালক প্রমোদকে খেলিতে দেখিয়া আসিয়াছিলাম, সেই বালকই এখনকার এই পরিণতবয়স্ক যুবা-পুরুষ। বাল্যকালের সৌন্দর্য্য তাহার মূর্ত্তিতে এখন পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ পাইতেছে। সে সৌন্দর্য্যে তখন যাহা কিছুর অভাব ছিল, এখন যৌবনে তাহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু এখনও প্রমোদের মনোবৃত্তি কিছুমাত্র সংযত হয় নাই, বাল্যকালের দুরন্ত চঞ্চলচেতা প্রমোদ হইতে এখনকার যুবা প্রমোদ স্বভাবে অতি অল্পই পরিবর্ত্তিত। বাল্যকালের মত যদিও আর প্রমোদ কোদাল পাড়ে না, ফুল তুলিলে ভগিনীকে মারে না, কিন্তু তথাপি এখনও প্রমোদ সেই প্রমোদ। সেইরূপ ক্রীড়ার পরিবর্ত্তে এখন সে শীকারপ্রিয়, নানাবিধ ব্যায়ামের অনুরাগী এবং কলেজে ঝগড়া করিতে বড় পটু। তাহার দৌরাত্ম্যে কলেজের কোন ছাত্রের দুষ্টামি করিয়া পার পাইবার যো নাই। দুষ্ট ছাত্রের সে যম। এক কথায়, তখনকার সেই উদারচঞ্চল বালক, এখনকার উদারদুরন্ত যুবা। প্রমোদ এখন কালকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়েন, ছুটীতে কখনও কখনও এলাহাবাদে বাড়ী আসেন মাত্র। এবার আশ্বিন মাসে পূজার ছুটীতে প্রমোদ বাড়ী না গিয়া একটি বন্ধুর সহিত প্রথমেই কানপুরে বেড়াইতে আসিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রমোদ বড় শীকারপ্রিয়। কানপুরে আসিয়া গঙ্গার এ পারে শীকারের উপযুক্ত স্থান দেখিয়া শীকারের আশায় বন্ধুর সহিত এই জঙ্গলে আসিয়াছেন। কিন্তু বন্য পশু বধ করা তাঁহাদের অদৃষ্টে ঘটিল না, বন্দুকের শব্দে কেহই আর বাসস্থান হইতে নির্গত হইল না,

বরং দুই একটি বিচরণশীল পশুও সে শব্দে বাসস্থানে লুকাইল, সুতরাং নিরীহ পাখীগণকে মারিয়াই তাঁহাদের শীকার সাধ মিটাইতে হইল। যে বৃক্ষে সেই পলাতক পক্ষীটি আশ্রয় লইয়াছিল তাহার তলে আসিয়া প্রমোদ তাহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। তাহার পরিবর্ত্তে উভয়ে মিলিয়া একের পর একে বহু বিহঙ্গ বধ করিলেন বটে কিন্তু তথাপি সেই বিশেষ পক্ষীটি মারিতে না পারায় প্রমোদের নৈরাশ্য ঘুচিল না। শীকার শেষে তাঁহারা বৃক্ষতলে বসিয়াছেন—সহসা পত্রান্তরালে প্রমোদ তাহাকে দেখিতে পাইলেন, তৎক্ষণাৎ উৎফুল্ল হৃদয়ে উঠিয়া অতি সন্তর্পণে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িলেন কিন্তু এবারও লক্ষ্য বিফল হইল। পাখীটি অন্য বৃক্ষে উড়িয়া গেল। প্রমোদের ক্ষোভের সীমা রহিল না; তিনি মনের আবেগে, সেই পলাতক পক্ষীর অনুসরণ করিয়া, বৃক্ষতল হইতে বৃক্ষতলে ছুটিতে লাগিলেন। কিন্তু সম্ভবতঃ বহু জন্মের পুণ্যফলে বিহঙ্গপ্রবর প্রতিবারেই তাহার লক্ষ্য ব্যর্থ করিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত; কিন্তু প্রমোদ শীকারের উৎসাহে এত উন্মত্ত যে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নাই। যামিনীনাথ প্রমোদের এইরূপ নিরর্থক আগ্রহ দেখিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিবার জন্য দুই তিন বার বিফল চেষ্টা করিলেন। শ্রমক্লান্ত, ঘর্ম্মাক্ত, তথাপি প্রমোদ উৎসাহের সহিত সেই পক্ষীর উদ্দেশে অন্য একটি দূরবর্ত্তী বৃক্ষের দিকে গমন করিলেন; যামিনীনাথকেও অগত্যা বন্ধুর অনুসরণ করিতে হইল। তাঁহারা যখন বৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং পাখীটিকে তখন আর দেখিতে পাইলেন না। হতাশ মনে বিশ্রাম করিবার জন্য তাঁহারা সেই বৃক্ষতলে বসিলেন। দেখিতে দেখিতে অগণ্য নক্ষত্র আকাশে ফুটিয়া উঠিল, ঝোপ-ঝাপে খদ্যোতপুঞ্জ জ্বলিতে আরম্ভ করিল, তাঁহারা তখন বাড়ী যাইবার মানসে বৃক্ষতল হইতে উঠিলেন। কানপুরে আসিয়া তাঁহারা এই অল্প-

দিনের জন্য যে বাড়ীতে ছিলেন, এই বনের সন্নিহিত নদীর পরপারে সেই বাড়ী। তাঁহারা উঠিয়া, অন্ধকারে পথ চিনিয়া চিনিয়া চলিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণের পর বুঝিলেন, সেই অপরিচিত নূতন স্থান হইতে পথ চিনিয়া বাড়ী যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে সহজ নহে। দেখিলেন তাঁহারা যত চলিতেছেন, কিছুতেই জঙ্গল ফুরায় না, যে পথে যান, আবার ঘুরিয়া সেই জঙ্গলেই আসিয়া পড়েন। এইরূপে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া যামিনী প্রমোদের উপর ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নিজের দোষ বুঝিয়া লজ্জিত ও অনুতপ্তভাবে প্রমোদ বলিলেন—"তাই ত এমন বিপদ ঘটবে তাকি জানি। এখন কোনরকমে যে গঙ্গার ধারটা পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারলে বাঁচি।"

যামিনীনাথ বলিলেন, "আমার তো আর চলবার শক্তি নেই, আজ দেখছি এইখানেই পড়ে থাকতে হবে।" কথা কহিতে কহিতে সেই অরণ্যবাসী পশুর রবে তাঁহাদের কর্ণকুহর ধ্বনিত হইতে লাগিল। অন্ধকারময় ঝোপঝাপ ভেদ করিয়া, দুই একটি বন্য জীব তাঁহাদের নিকট দিয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া যাইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে প্রমোদের শীকার-লালসা আবার জ্বলিয়া উঠিল, প্রমোদ সেই অন্ধকারেই লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িলেন। শান্ত বনস্থল সহসা আবার ঝটিকাকম্পনে যেন আলোড়িত হইয়া উঠিল। বন্য পশুগণ ব্যস্ত ত্রস্ত হইয়া স্ব স্ব বাসস্থানে পলায়ন করিল, বৃক্ষস্থিত নিদ্রিত পক্ষিগণ সে শব্দে চমকিয়া একবার অস্পষ্ট স্বরে ডাকিয়া উঠিল, তাহাদের সভয় চমকে বৃক্ষপত্রগণ একবার কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত থামিয়া গেল, অরণ্যটি পূর্ব্ববৎ নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। এদিকে তাঁহারা পরিশ্রমে কাতর, ক্ষুধা তৃষ্ণায় আকুল ও প্রতিপদে লতাগুল্মজালে বাধা প্রাপ্ত হইতে হইতে সেই অন্ধকার জনশূন্য অরণ্যে অসহায় পথহারা হইয়া চলিতে লাগিলেন। ক্রমে নিতান্ত অবসন্ন, ক্লান্ত ও হতাশ হইয়া, অগত্যা একটি বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

সহসা তাঁহাদের কর্ণকুহর মুগ্ধ করিয়া নীরব নৈশ গগনে সঙ্গীতধ্বনি উথলিয়া উঠিল। বনমধ্যে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাঁহাদের দেহে যেন প্রাণ সঞ্চারিত হইল। সঙ্গীত ধ্বনি ক্রমে বাতাসে তাঁহাদের দিকেই আসিতে লাগিল। গানটী শুনিতে তাঁহারা এক মনে কান পাতিলেন। প্রথমে কেবল সুরমাত্র, পরে অস্পষ্ট, পরিশেষে স্পষ্ট কথাগুলি তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল, তাঁহারা শুনিলেন—

* সুশীতল মহীরুহ-সুশীতল ছায়
তেয়াগি অনলকুণ্ডে ঝাঁপিতে যে চায়,
রমণীয় বেলা-ভূমি করি পরিহার,
উন্মত্ত সাগর মাঝে যেতে সাধ যার,
দুর্গ ছাড়ি সহিবে যে সমর-পীড়ন,
যাক্ সে এ বন ছাড়ি যথা তার মন।
এমন সুখদ কানন-বাস,
পশে না হেথায় শোকের শ্বাস,
হেথায় শান্তি বিরাজমান,
কলহের হেথা নাহিক স্থান,
এ ছেড়ে কি দেবধামে কারো মন ধায়।

আকাশে পূর্ণচন্দ্র ভাসিয়া উঠিল, অন্ধকারের বিকট মূর্ত্তি ধীরে ধীরে উজ্জ্বলতার মধ্যে আত্মলোপ করিয়া দিল; বনানী সেই মধুর জ্যোৎস্নায় একখানি মধুর সুন্দর ছবির মত প্রতিভাত হইতে লাগিল। সহসা এ কি দৃশ্য! জ্যোৎস্না মূর্ত্তিমতী হইয়া কি বনানীর অস্ফুট অপূর্ণ সৌন্দর্য্য সহসা পরিস্ফুট সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন? সুমধুর সঙ্গীততানে

---

* রাগিণী বাহার।

রজনীর নিস্তব্ধতা অরণ্যের ভীষণতা দূর করিয়া কোন্ উপন্যাসের কোন্ পরী রাণী এ—এসময় এই কাননে আসিয়া উদয় হইলেন?

রমণী গাহিতে গাহিতে বন-মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল, যুবকেরা বিস্মিত নেত্রে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। বালিকার পৃষ্ঠে লম্বিত বেণী, অঙ্গে আকণ্ঠলগ্ন ক্ষুদ্র অঙ্গরক্ষা, পরিধানে জটিল গ্রন্থিযুক্ত কুঞ্চনবহুল গৈরিকবসন; বেশভূষায় বালা হিন্দুস্থানী ললনা; কিন্তু তৎকণ্ঠনির্গত গীতপদাবলীর উচ্চারণবিশুদ্ধতায় সে বঙ্গবালারূপে স্বপ্রকাশ।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহাদের যেন মোহ ভাঙ্গিল, তাঁহারা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, রমণীকে কি জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায়ে তাহার নিকটে গমন করিলেন। রমণী বনমধ্যে রজনীকালে অপরিচিত বন্দুকধারী মনুষ্য মূর্ত্তি দেখিয়া সহসা সভয়ে সবিস্ময়ে গান বন্ধ করিল। যামিনীনাথ সবিনয়ে বলিলেন—

"আমরা শীকার করতে এসে পথ হারিয়েছি—আপনি বোধহয় এখানকার অধিবাসিনী, অনুগ্রহ করে পথ বলে দিতে পারেন?"

বালা তখন আশ্বস্তচিত্তে উত্তর করিল—"পথ? আপনারা কে? কোথায় যাবেন?"

প্রমোদ কোনও কথা কহিলেন না; সেই নিস্তব্ধ নিশীথে, জ্যোৎস্না-লোকিত অরণ্যে জ্যোৎস্নামধুর রমণীমূর্ত্তি তাঁহাকে বিস্ময়াভিভূত করিয়াছিল। যামিনী বলিলেন—"আমরা কে তা চিনবেন্ না, অদৃষ্টফেরে এখানে শীকার করতে এসে পথ হারিয়েছি—এখন আপনার শরণাপন্ন—যদি এ গোলকধাঁধা থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন তবেই আমরা নদীতীরে পৌছতে পারি"।

রমণী বলিল—"নদীতীরে? তা পারি,—আমার সঙ্গে আসুন।"

বালিকার অনুসরণে বন্ধু দুইজন অনতিবিলম্বে নদীকূলে আসিয়া পৌছিলেন। কিন্তু সেখানে একখানি খেয়ানৌকাও নাই—নদীও

দুস্তরণীয়। সেতু কোথায়—তাহাও বালিকা বলিতে পারিলনা। দুস্তর বিপদে পড়িয়া প্রমোদের উপর যামিনীর অসংগত ক্রোধ জন্মিল, তীব্রস্বরে বলিলেন—

"আর যদি তোমার সঙ্গে কোথাও যাই ত আমার নামই মিথ্যে! এমন প্রলয়ঙ্করা বুদ্ধি যদি স্ত্রীলোকেরও দেখে থাকি! এখন বাড়ী যাই কি করে বল দেখি?"

প্রমোদ হাসিয়া বলিলেন,—"তা এত রাগ করছ কেন হে? নাহয় রাতটা এখানেই কাটান যাবে?"

যামিনী আরও ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন "রাতটা এখানে কাটান যাবে! তুমি কাটাও—পাখী শীকার করতে এসে বাঘভাল্লুকের শীকার হও ভালই—কিন্তু আমার সে ইচ্ছা মোটেই নেই—"

বালিকা তাঁহাদের কথা শুনিয়া নিঃশব্দে হাসিতেছিল,—সহসা দয়ার্দ্র স্বরে বলিল—"নিকটেই নদীতীরে আমাদের মন্দির—অনেক পথিক যাত্রী সময়ে অসময়ে এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন,—আজ রাত্রের মত মন্দিরে বাস করবেন?"

যামিনী বলিলেন—"যখন অন্য উপায় নেই অভাব পক্ষে সেই ভাল,—ক্ষিদেতে মরে যাচ্ছি—ফলটল কিছু পেলেও এ যাত্রা বেঁচে যাই।"

প্রমোদ বলিলেন—"আপনার করুণায় আমাদের প্রাণদান দিলেন।"

বালিকা একটু যেন সবিস্ময়ে বলিলেন—"এ মন্দির ত পথিককে আশ্রয় দেবার জন্যেই।"

যুবকেরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে যুবতীর অনুসরণ করিলেন।

যুবতী তখন, কেন তাঁহারা এখানে আসিলেন, কি করিয়া পথ হারাইলেন, তাঁহাদের নাম কি, এই সকল জিজ্ঞাসা করিতে করিতে পথ দেখাইয়া চলিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিজন কুটীর

অরণ্যপ্রান্তে নদীর অনতিদূরে অনুচ্চ বিজন মন্দির। মন্দিরসংলগ্ন দীর্ঘ দালান যাত্রীনিবাস। যুবতী পথিকদিগকে লইয়া এইখানে সমাগত হইল! দালানের নিভৃত একটি কোলঙ্গায় দ্বিসলিতা প্রদীপ জ্বলিতেছিল; সেই দীপালোকবিভাসিত প্রফুল্ল কুসুমসদৃশ সহাস্য রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহারা দ্বিতীয়বার যেন মোহমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। দীপালোকে বালিকার রূপকান্তি অধিকতর সুস্পষ্টভাবে তাঁহাদের নয়নে প্রতিভাত হইল! বালিকা যথার্থই বনবালা, সে মুখে যুবতীস্বভাবসুলভ লজ্জা নাই, সে মুখে বিলাসময় ভাবভঙ্গী কিছু মাত্র নাই; তাহা বালিকার উপযুক্ত ঈষৎ সরল হাস্যে মাত্র প্রফুল্ল।—তাঁহারা নীরবে বিস্মিতনেত্রে সেই বিজন মন্দিরবাসিনী বনদেবীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

মন্দিরে অন্য কোন যাত্রী সে দিন ছিলনা। দুইজন ভৃত্য দালানে বসিয়া ছিল,—বালিকাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং তাহার আজ্ঞাক্রমে একজন তাঁহাদের মুখহাত ধুইবার জল আনিতে গেল—অন্যজন মন্দিরব্রাহ্মণ,—তিনি পথিকদিগের আহারের আয়োজন করিতে গেলেন। —দাস জল আনিলে বালিকা পথিকদিগকে বলিল,—"আপনারা অস্ত্র শস্ত্র রেখে মুখ হাত ধুন, আমি খাবার আনি।" বলিয়া সে মন্দির পার্শ্বস্থ রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিল,—এবং অনতিবিলম্বে ব্রাহ্মণের সহিত খাদ্যাদি আনিয়া পরিবেশনতৎপর হইল। ভৃত্য পূর্ব্বেই আসন ও ভোজনপাত্রাদি দালানে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। পথিক দুইজন ভোজনে বসিলেন। যামিনী তৃপ্তি পূর্ব্বক মন্দিরভোগ উপভোগে প্রবৃত্ত হইলেন।—প্রমোদ

প্রায় কিছুই খাইলেন না,—যদিও কিছু পূর্ব্বে তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণায় যামিনীর মতনই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঘোর বিস্ময়ে পড়িয়া তাঁহার হৃদয় এত প্রকার ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল যে তখন ক্ষুধাতৃষ্ণা সকলই বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

পরিবেশন শেষ করিয়া বনবালা তাঁহাদের নিকট বসিয়া নিতান্ত সরলভাবে কত গল্প করিতে লাগিল। তাঁহারা শুনিলেন, বালিকার নাম নীরজা, তাঁহাব পিতা নৈমিষারণ্যে মানৎরক্ষা করিতে গিয়াছেন, রাত্রেই আসিবার কথা আছে। বালিকা কিছু পরে বলিল "বাবা যতক্ষণ না আসেন আমি ঘুমাব না। কিন্তু এখন আমি আমার কুটীরে যাই, আপনারা শ্রান্ত হয়েছেন এবার বিশ্রাম করুন।"

বলিয়া বালিকা বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক মন্দির হইতে কিছুদূরে প্রাঙ্গণস্থ স্বতন্ত্র কুটীরে গমন করিল। বলা বাহুল্য, নিদ্রার নাম গন্ধও এখন তাঁহাদের ছিলনা, কিন্তু রমণীর কথায় অগত্যা তাঁহারা দালানে নির্দ্দিষ্ট খাটিয়ার আশ্রয় লইলেন।

যামিনী শীঘ্রই নিদ্রামগ্ন হইলেন, কিন্তু প্রমোদের মন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তাতরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন "এমন বিজনে এ রমণী কে? উদ্যানের কুসুম বনে কেমন করিয়া ফুটিল? পৃথিবীর দুর্ল্লভ রত্ন এই কুটিরে কেন? এইরূপ চিন্তাতে অনেক রাত্রি অতিবাহিত করিয়া রাত্রিশেষে তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। যামিনীনাথ প্রত্যূষে কখন শয্যা ত্যাগ করিয়া গেলেন তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না।

এদিকে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল, তথাপি নীরজার পিতা তীর্থ হইতে ফিরিলেন না। নীরজা কখনও শুইয়া, কখনও বসিয়া, কখনও উদ্যানে গাহিতে গাহিতে বেড়াইয়া রাত্রি কাটাইল। প্রত্যূষে মধুময় সঙ্গীতধ্বনিতে যামিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি বাহিরে আসিয়া

দেখিলেন তখনও ঘোর ঘোর আছে, পশ্চিমগগনে চন্দ্রমা হাসিতেছে, শীতল মৃদু মৃদু বায়ু বহিতেছে, সেই সঙ্গীতধ্বনিবাহী, মধুরবায়ুহিল্লোলিত হইয়া প্রাতস্ফুট কুসুমনিকরের সুরভি সুগন্ধতর হইয়া বহিতেছে। যামিনী দেখিলেন, কৃষ্ণমেঘময় আকাশস্থিত একটি তারকার ন্যায় এই ম্লানাভ উদ্যান উজ্জ্বল করিয়া রমণী গাহিয়া বেড়াইতেছে। তাহাকে দেখিয়া যামিনী নিকটে আসিলেন। বালিকা জিজ্ঞাসা করিল "কেমন ঘুমাইলেন ?"

যুবা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কিছুক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া বলিলেন "তা আর কি বলব ?

রমণী ভুবনমুগ্ধকর সরল হাসি হাসিয়া বলিল "বুঝি ভাল ঘুম হয়নি ?"

যামিনীনাথ মুগ্ধ হইয়া বলিলেন "কেমন করে হবে ?"

বালিকা। "আমি আরো মনে করেছিলুম—সমস্ত দিনের শ্রান্তির পর সহজেই ঘুম আসবে !"

যুবা আর একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "ঘুম ! Nor poppy nor mandragora can give me that sweet sleep which"—

বালিকা সবিস্ময়ে বলিল, "কি বলছেন, আমি ত ও ভাষা জানিনে।"

যামিনী একটু হাসিয়া বলিলেন "বলছি ঘুম কি আর হয় ! যা দেখছি যে আলো চোখের সামনে—তাতে কি আর ঘুম আসে !"

এ কথার মর্ম্ম বালিকা বুঝিতে পারিল না—কি আলোক যামিনীর চোখের উপর, তাহার সহিত নিদ্রার কি যোগ এই দুরূহ সমস্যায় পড়িয়াই বুঝি বালিকা নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। যামিনী সেই নিস্তব্ধতায় আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন "সুন্দরি, সব কি খুলে বলব—আমার হৃদয় আর আমার নেই—ঐ—"

তাহার কথা শেষ না হইতে হইতে বালিকা বলিয়া উঠিল, "সকাল হয়েছে, আপনার সঙ্গী এখনো ওঠেন নি ? দেখে আসি।" এই বলিয়া

বালিকা মন্দিরাভিমুখে গমন করিল। যুবা স্তম্ভিতভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া গমনশীল বালিকার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বালিকা দালানে আসিয়া সুষুপ্ত প্রমোদের শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল—দেখিল, প্রমোদের ওষ্ঠাধরে ঈষৎ হাসির রেখা, ঈষদ্ভিন্ন পল্লবযুক্ত নয়নদ্বয় ঈষৎ আবেশময়। বালিকা দেখিল প্রমোদ কোন সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছেন। সত্যই প্রমোদ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন—যেন আকাশ হইতে একটি জ্যোতির্ম্ময়ী রমণী নামিয়া তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইলেন—তিনি আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া তাহাকে ধরিতে হাত বাড়াইবা মাত্র সে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। প্রমোদ জাগিয়া দেখিলেন—সত্যই তাঁহার মস্তকের নিকট সেই দেবীমূর্ত্তি। দুজনে মুগ্ধ নয়নে দুজনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, যামিনীনাথ যে কখন গৃহে প্রবেশ করিলেন—জানিতেও পারিলেন না। যামিনী আসিয়া দেখিলেন, প্রমোদের প্রতি রমণীর সে দৃষ্টি কি স্নেহময়, কি মধুময়! যামিনীর হৃদয়ে ঈর্ষ্যার অনল জ্বলিল। প্রমোদ যামিনীকে দেখিয়া চমকিতভাবে উঠিয়া বসিলেন। বালিকারও এতক্ষণে কথা ফুটিল।

সে বলিল "আপনারা কি নদীতে স্নান করবেন? কিন্তু আপনাদের মত কাপড় দিতে পারব না ত? বাবার গেরুয়া বস্ত্র আছে।"

তখন প্রমোদ শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সবিনয়ে বলিলেন, "এখন সকাল হয়েছে, আমরা স্বচ্ছন্দে পথ চিনে বাড়ী যেতে পারব। আপনাকে কাল কত কষ্ট দিয়েছি, কিছু মনে করবেন না। আপনি আশ্রয় না দিলে আমাদের যে কাল কি দুর্দ্দশা হোত তার ঠিক নেই, চিরকাল আপনার আতিথ্য আমাদের মনে থাকবে।"

রমণী ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলিল "অতিথি সৎকারে কষ্ট কি? পিতার সেবায় যেমন আনন্দ—অতিথি সৎকারেও তেমনি আনন্দ। আপনারা আহারাদি করে যান্ না?"

যামিনীনাথ বলিলেন—"তাতে আর আপত্তি কি ?"

কিন্তু প্রমোদ সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া বলিলেন, "আপনার পিতা তাহলে কাল আসেন নি ? আপনাকে এই বিজন মন্দিরে একা রেখে তিনি কি ক'রে দূরে থাকেন ?"

বা। না তিনি আমাকে ফেলে বেশী দিন কোথাও থাকেন না—এবার কেবল একটু দেরী হয়েছে—প্রায় দিন দশ হ'ল তিনি গেছেন।

প্র। আপনার ভয় হয় না ? এমন নির্জ্জন স্থান ?

বালিকা হাসিয়া বলিল "ভয় কিসের ? এত লোকজন তবু আপনারা বলছেন নির্জ্জন।"

বা। কিন্তু এখানে ত কই আপনার সঙ্গী মেয়ে কেউ নেই।

নী। আছে বই কি ! গরীব দুঃখী কাঠুরিয়ার মেয়েরা এখানে বনে প্রত্যহই কাঠ সংগ্রহ করতে আসে। বাবা কোথাও গেলে তারা কেউ না কেউ এসে আমার কাছে থাকে।

প্র। কই কালত কাউকে দেখিনি।

বা। কাল বিকালে তাদের একটা পার্ব্বণ ছিল, তাই আসতে পারে নি,—আজ আসবে এখন,—ঐ যে লছমী আসছে।

তাঁহারা দূরে এক অল্পবয়স্কা স্থূলাঙ্গী কৃষ্ণবর্ণা হিন্দুস্থানী রমণীকে দেখিলেন। প্রমোদ সে দিক হইতে বালিকার দিকে চক্ষু ফিরাইয়া আবার বলিলেন "একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—আমরা কাল এখানে ছিলেম শুনে আপনার পিতা কি বলবেন ?"

নী। তিনি কি বলবেন ? নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়েছি তিনি তাতে খুসীই হবেন ? কত সময় কত পথহারা যাত্রী এখানে আসে,—কত সময় কত বিপন্ন কাঠুরিয়াকে আশ্রয় দিই। এই ত আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

বালিকার সরলতা দেখিয়া প্রমোদ একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,

"তবে আমরা আসি, এ উপকার কখনো ভুল্‌ব না। যদি আমাদের মত নিরাশ্রয়কে আর কখনো আশ্রয় দেন তো তখন এই পথিকদের কথা মনে করবেন।"

বালিকা কোন উত্তর করিল না, স্থির নেত্রে প্রমোদের দিকে চাহিয়া রহিল। যামিনীকে প্রমোদ বলিলেন "তবে চল যাওয়া যাক্।"

যামিনী নীরজার দিকে চাহিয়া "তবে আসি," এই কথা ব্যতীত কিছুই বলিলেন না, রমণীও ইহার কোন উত্তর করিল না, সে যেন তখন কি ভাবনায় মগ্ন ছিল। প্রমোদ আর একবার প্রশান্ত নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া সেখান হইতে গমন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মোহ-মুগ্ধ

যুবকেরা বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু অন্য দিনের ন্যায় সে দিন পরস্পরে কথোপকথন চলিল না। দু'জনেই আপন মনে থাকিয়া প্রায় নিস্তব্ধ ভাবেই দিন কাটাইলেন। আশ্চর্য্য! পূর্ব্বদিনকার ঘটনার কথা লইয়া কোথায় দু'জনের গল্প থামিবে না, না দু'জনেই আজ নিস্তব্ধ, দুজনেই চিন্তামগ্ন। কিন্তু কেহ মনোনিবেশ পূর্ব্বক উভয়কে দেখিলে বুঝিতেন যে তাঁহাদের সেই নিস্তব্ধ মুখমণ্ডল পরস্পর কেমন ভিন্ন-ভাব-ব্যঞ্জক। প্রমোদ গম্ভীর, প্রশান্ত, যেন বহির্জ্জগতের সহিত তাঁর কোন সম্পর্কই নাই, তাঁহার দৃষ্টি লক্ষ্যশূন্য, মুখে প্রফুল্লতা নাই; আর যামিনী-নাথের অধীর ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাসে যেন অনল বহিতেছে, কখনও কখনও কিসের ভাবে কে জানে তাঁহার ওষ্ঠাধর আহ্লাদে কাঁপিয়া উঠিতেছে, আবার কখনও যেন আপনাআপনি ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া পড়িতেছে।

উভয়ের মনে মনে চিন্তাস্রোত বহিয়া যাইতেছে, কিন্তু কেহই কাহারও নিকট আপন মনোভাব প্রকাশ করিতেছেন না, একজন ভাব-প্রকাশ বিষয়ে যেন সম্পূর্ণ উদাসীন, আর একজন সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক।

এইরূপেই প্রায় সে দিনটি কাটিল। দু'একটি সামান্য কথা ছাড়া তাঁহাদের কোন কথাই আর হইল না। দু'জনের কেহই পূর্ব্বদিনকার কথা তুলিলেন না। অপরাহ্নে যামিনীনাথ বাহিরে গেলেন। আগামী কল্যই তাঁহাদের কানপুর ছাড়িবার কথা—তাহার আগে কানপুরের আলাপী বন্ধুদিগের সহিত একবার দেখা সাক্ষাৎ করা উচিত; কিন্তু প্রমোদকে আজ ইহাতে নিতান্ত অনিচ্ছুক দেখিয়া অবশেষে যামিনীনাথ একাকীই গমন করিলেন। প্রমোদ নিঃসঙ্গ হইয়া ক্ষণকাল পাঠে মন দিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহাতেও অকৃতকার্য্য হইয়া—চিন্তাভারাক্রান্ত মনকে শান্তি দান করিতেই যেন, সুদৃশ্য ভাগীরথীর তীরে আগমন করিলেন। সেখানে আসিয়া দেখিলেন—পরপারেই সেই অরণ্য। সেই বনদেবীর বাসস্থান। পূর্ব্বদিনের স্মৃতি জ্বলন্তভাবে তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। ভাবিতে ভাবিতে তিনি যে পুনরায় সেই অরণ্যের দিকেই চলিতেছেন—তাহা নিজেই বুঝিতে পারিলেন না। অজ্ঞাত তাড়িতশক্তির প্রভাবেই যেন পদে পদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অরণ্যে আসিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিল,—কিন্তু তখন আর ফিরিয়া যাইতে পা উঠিল না—ভাবিলেন সন্ন্যাসীর সহিত একবার দেখা করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আসিলে হয় না। পূর্ব্বরাত্রে যে পথ দিয়া মন্দিরে গিয়াছিলেন, প্রবল ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া সেই পথ ধরিলেন। কিন্তু দূর হইতে মন্দিরচূড়া যখন নজরে পড়িল তখন সহসা কেমন একটা লজ্জার ভাবে, সঙ্কোচের ভাবে, তিনি সেইখানেই বদ্ধপদ হইয়া দাঁড়াইয়া

রহিলেন। একবার মনে করিলেন, 'ফিরিয়া যাই—আবার ভাবিলেন, "এতদূর আসিয়া সন্ন্যাসীকে একবার না দেখিয়া ফিরিয়া যাইব তাহাই বা কিরূপে হয়।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, ধরণী ধূসরবর্ণ আবরণে আচ্ছন্ন। মন্দিরচূড়া ক্রমশঃ প্রমোদেব দৃষ্টি হইতে অন্তর্ধ্যান হইল। প্রমোদ হতাশচিত্তে শূন্যমনে কাননের চতুর্দ্দিক অবলোকন করিলেন।--সেদিনের মত কোন দেবীপ্রতিমা কি তাঁহার নেত্রগোচর হইবে না?—সেইরূপ মধুর সঙ্গীতধ্বনিতেও কি একবার তাঁহার তৃষিত কর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করিবে না? সহসা প্রমোদের হৃত্তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল,--আজও বনদেবী গাহিতে গাহিতে ক্রমে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রমোদকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিল—"একি আজও!"

প্রমোদ কি উত্তর দিবেন! আসিয়াছেন বলিয়া মনে মনে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। বালিকা সরলভাবে আবার বলিল—"আজও কি পথ হারিয়েছেন? মন্দির ত কাছেই—বিশ্রাম করবেন?"

প্রমোদ লজ্জিতভাবে বলিলেন "না আজ আমার কোন পরিশ্রম হয়নি আমি শুধু বেড়াতে এসেছি—এখনি ফিরে যাব।"

বা। না, তা হবে না; একবার মন্দিরে আসুন না—বাবার সঙ্গে দেখা হবে।"

প্রমোদ বলিলেন—"মন্দিরে? হ্যাঁ তা আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করব বলেই এসেছি—কিন্তু অন্ধকার হয়ে পড়েছে—আজ ফিরে যাই, আপনিও এইবেলা যান্।"

বালিকা হাসিয়া বলিল—"অন্ধকার হয়ে পড়েছে, এখনি চাঁদ উঠবে এখন,—এমন কত অন্ধকার রাতে আমি একলা এখানে বেড়াই।"

প্র। অন্ধকারে ভয় করে না! বলেন ত আপনাকে মন্দির পর্য্যন্ত পৌঁছে আসি।

নী। ভয় কিসের? ছেলাবেলা থেকে এই বনে আছি—অমাবস্যার রাতেও একলা বেড়াতে আমার ভয় করে না। বাবা অনেক সময় কুটীরে শাস্ত্র পাঠ করেন, আমি বনে গান গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়াই—তিনি ডাকলে তখন ঘরে ফিরি। আমার মনে হয় তমসা মুরলা আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াচ্ছেন।"

প্রমোদ উত্তররামচরিত পড়েন নাই,—তমসা মুরলার উল্লেখ বুঝিলেন না,—বলিলেন—"তমসা মুরলা! তাঁরা কে?"

বা। তাঁরা বনদেবী, সীতাদেবীর সখী; আমারো সখী।"

প্র। আপনি ত নিজেই বনদেবী, শকুন্তলা পড়েছেন? আপনাকে দেখলে আমার সেই তাপসীকন্যাকে মনে পড়ে।"

বা। আমার দুষ্মন্তকে মোটেই ভাল লাগে না, তিনি কি সত্যিই শকুন্তলাকে ঋষির শাপে ভুলে গিয়েছিলেন? আমার তা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

প্র। আপনি দেখছি খুব সংস্কৃত জানেন। বাঙ্‌লা পড়েছেন কি?

বা। পড়ি বইকি? বাবা আমার জন্যে কত বই আনেন। আমার রামায়ণ আছে, মহাভারত আছে, সীতার বনবাস আছে, সাধকসঙ্গীত আছে, আরো কত সঙ্গীত আছে,—আর দুর্গেশনন্দিনী বলে একখানি বই আছে—সেখানা কিন্তু আমার যেমন ভাল লাগে এমন কোন বই না। বাবা আমাকে যখন গীতার মানে বলে দেন—আমার তখন তিলোত্তমার কথা মনে পড়ে। শাস্ত্র পড়তে আমার মোটে ভাল লাগে না। উত্তররামচরিত, শকুন্তলা, রত্নাবলী আগে খুব ভালবাসতুম, এখন দুর্গেশনন্দিনী সব চেয়ে ভালবাসি। আসুন আমার সব গাছগুলি আপনাকে দেখিয়ে আনি। ঐ যে শিরীষ ফুলের গাছ দেখ্‌ছেন,—ওর তলায় দাঁড়ালে ধ্রুব তারাটি ঠিক চোখের সামনে পড়ে, দেখছেন?

প্র। ঐ ধ্রুবতারা! আপনি সব নক্ষত্রের নাম জানেন?

নী। আপনি জানেন না? ঐ দেখুন সপ্তর্ষি। চলুন এখন আপনাকে আর একটি জিনিষ দেখাই। ঐ ঝুমকো লতামণ্ডপের মধ্যে একটি খাঁচায় পাতার বিছানা করে একটি বউকথাকওকে শুইয়ে রেখেছি দেখিয়ে আনি।"

প্র। বউকথাকওটি খুব পোষ মেনেছে?

নী। না, এটি পোষা নয়। আহা, আজ সকালে ঐ ছানাটি গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল, তাই তাকে অমন যত্নে রেখেছি। পাখী খাঁচায় ধরে রাখতে আমার মায়া করে,—ছানাগুলি কুড়িয়ে মানুষ করি, বড় হলে উড়িয়ে দেই। স্বাধীনভাবে তারা কত সুখী।

প্র। চলুন, কিন্তু ভয় হয় পাছে আপনার পিতা ডাকলে শুনতে না পান।

প্রমোদ নীরজার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, নীরজা সেই নিস্তব্ধ নৈশ-গগন চমকিত করিয়া গান গাহিতে গাহিতে পথ দেখাইয়া চলিল—

নিঃঝুম নিঃঝুম গম্ভীর রাতে,
কম্পিত পল্লব দক্ষিণ বাতে,
পেখল সজনি সতিমির রজনী,
অম্বরে চন্দ্র ন তারকা ভাতে,
ঝিল্লি-ধ্বনি-কৃত, বন পরিপূরিত,
কলয়ত জাহ্নবী মৃদুল প্রপাতে।

বালিকা থামিয়া বলিল "আমি বাঙ্গলা গান শিখতে বড় ভালবাসি, বাঙ্গালী যাত্রী এলেই আমি গান শিখি। আপনি গাইতে পারেন না?"

প্রমোদ সে কথায় উত্তর না করিয়া বলিলেন "আপনি যে গানটি এখন গাইলেন ওকি কোনও যাত্রীর কাছে শিখেছেন?"

বা। না ওটি আমি তৈরি করেছি। আমি যাত্রীদের কাছে গান শিখি—বাবার কাছে শিখি—কেতাবের গানের সুর জানিনে, কিন্তু যেটা ভাল লাগে একটা যে কোন সুর তাতে বসিয়ে নিই, আর নিজে কথা তৈরি করে তাতে সুর দিয়ে গাই—সব চেয়ে সেই গান গাইতে আমার বেশী আনন্দ হয়।

প্র। আপনি নিজে গান রচনা করেন? যে গানটি গাইলেন ওকি আপনার রচনা? আর একবার গাবেন কি?

বালিকা পূর্ণকণ্ঠে গানটি আবার গাহিতে লাগিল।

প্রমোদের শরীর হর্ষবিহ্বল ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, প্রমোদ ভাবিলেন "এই অরণ্যটিই কেন সমস্ত পৃথিবী হইল না? এই দুইটি জীবন বই আর পৃথিবীতে জীবন রহিল কেন?" সহসা পশ্চাৎ দিকে কাহার পদশব্দে তাঁহার সে চিন্তা ভঙ্গ হইল, তিনি মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন—একজন সন্ন্যাসী। নীরজার তখন গান শেষ হইয়াছিল, সন্ন্যাসী ঈষৎ তীব্র স্বরে বলিলেন "নীরজা, তোমাকে কতক্ষণ ধরে ডাকছি? আহারের সময় হয়েছে, এস কুটীরে এস—?" প্রমোদ লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িলেন, নীরজাও কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইল। কিন্তু নীরজা বনবালা, তাহার সে ভাব অধিকক্ষণ রহিল না, সরল ভাবে পিতাকে বলিল "কে জানে কেমন অন্যমনে ছিলাম—আপনার ডাক আজ শুনতেই পাইনি; অনেকক্ষণ ধরে ডাকছেন কি?" কন্যার কাতর ভাবে সন্ন্যাসী স্বাভাবিক নরম স্বরে বলিলেন "না, আমি বেশীক্ষণ ডাকি নাই; ও যুবাটি কে?"

নীরজা বলিল "সেই যে সেদিন পথহারা হয়ে দুজন পথিক এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন, যাঁদের কথা আমি আপনাকে বলেছিলুম, ইনি তাঁদেরি মধ্যে একজন। নাম প্রমোদ; আপনার সঙ্গে দেখা করতে ইনি মন্দিরে যাচ্ছেন।"

তখন প্রমোদ বলিলেন "মহাশয়, ইনিই সেদিন বনদেবীরূপে আমাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন, সেজন্য আমরা চিরঋণী। এই জঙ্গল মধ্যে আমরা সেদিন কি বিপদেই পড়েছিলেম।

সন্নাসী বলিলেন "নীরজা সন্ন্যাসীকন্যা, অতিথি-সৎকারই উহার ধর্ম্ম। নীরজা কর্ত্তব্য কাজ করেছে, সেজন্য তোমরা কেন ঋণী হবে? সে যাই হ'ক, আজও কি শীকার অভিপ্রায়ে আসা হয়েছিল?"

প্রমোদ একটু লজ্জিতভাবে ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "না, আজ বেড়াতেই এসেছি।"

স। আজও রাত হয়ে পড়েছে, কুটীরে থাকলে হয় না?

এই কথায় নীরজা ব্যগ্রভাবে প্রমোদকে বলিল "চলুন তবে কুটীরেই চলুন, এত রাতে কি করে বাড়ী যাবেন?"

কিন্তু প্রমোদ ইহাতে অসম্মত হইলেন, ভাবিলেন তাহা হইলে যামিনীনাথ বড়ই চিন্তিত হইবেন, সমস্ত রাত্রি তাঁহার অন্বেষণ করিবেন। সন্ন্যাসী বলিলেন "কিন্তু এত রাতে তোমাকে অনাহারে আমি ছেড়ে দিতে পারি না; তা'হলে আমার ব্রত ভঙ্গ হয়, অতিথি-সৎকারই আমার ব্রত।" এই কথায় তখন প্রমোদ আর কিছু না বলিয়া সন্ন্যাসীর সহিত মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন। নীরজা প্রফুল্লচিত্ত বিহঙ্গীর ন্যায় আগে আগে যাইতে যাইতে গান ধরিল—

আয় আয় আয়, কে আছিস তোরা,
মরমব্যথায় যার,
দিবস রজনী পড়িছে বিফলে
নয়ন-সলিল ধার;
কাতর হৃদয়ে কাঁদিছে যেজন
হারায়ে বিভব মান,

হতাশ প্রেমের হুতাশে সদাই,
জ্বলিছে যাহার প্রাণ।
কাঁদিতে হবে না, যাতনা রবে না,
রবে না ভাবনা-ভার,
আয় আয় আয়, কে আছিস তোরা,
খোলা এ কুটীর দ্বার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিদায়

গান গাহিতে গাহিতে নীরজা সহসা থামিল। পার্শ্বস্থ বটবৃক্ষতল হইতে হঠাৎ যেন মনুষ্যের চঞ্চল পদনিক্ষেপশব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, সে চমকিত হইয়া সেইখানে দাঁড়াইল, সেই দিকে চাহিবামাত্র তাহার মনে হইল, কে যেন ছায়ার মত বৃক্ষান্তরাল হইতে সহসা সরিয়া পড়িল। ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসী ও প্রমোদ দু'জনেই কিছুক্ষণ বৃক্ষতল অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না, তখন নীরজার ভ্রম বুঝিয়া আবার মন্দিরাভিমুখী হইলেন। কুটীরে পৌঁছিয়া আহারান্তে সন্ন্যাসী প্রমোদকে তাহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন; পরিচয় লাভে সহসা যেন কেমন মুহ্যমান্ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ মাত্র স্তব্ধ থাকিয়া স্বাভাবিক ধীর শান্তভাবে পুনরায় কহিলেন—"কানপুরে কেন আসা হ'ল?"

প্র। "পূজার ছুটীতে বেড়াতে এসেছি।"

স। "কতদিন এখানে থাকা হ'বে?"

প্রমোদ একটু থামিয়া থামিয়া বলিলেন, "আর দু'চার দিনের মধ্যেই

আমাদের কলেজ খুলবে, কাজেই আর বেশীদিন এখানে থাকতে পারব না। কাল আমাদের কানপুর ছাড়তেই হ'বে। কলকাতা যা'বার আগে আমার আবার বাড়ী গিয়ে দু চার দিন থাকা চাই ত,—নইলে—"

এই সময় নীরজা বলিয়া উঠিল—"আমার বউকথাকওটি ত দেখান হ'ল না—আপনি কি আর আসবেন না?"

প্রমোদ এই কথায় একটু হাসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসীও সেই কথায় একটু হাসলেন, কিন্তু কিছু পরেই আবার সে হাসি বিষাদরূপে পরিণত হইল, সন্ন্যাসীর মুখকান্তি গম্ভীর হইয়া পড়িল। প্রমোদ বালিকার দিকে চাহিয়া স্বগতচিন্তার অসাবধানতায় আস্তে আস্তে বলিলেন "এমন সরলা বালিকা আর কখনও দেখি নাই।"—এই কথাগুলি যদিও প্রমোদ মৃদুস্বরেই বলিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা সন্ন্যাসীর কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি বলিয়া উঠিলেন "সত্য, এমন সরলা আর নাই; কিন্তু উপযুক্ত পাত্র কোথায়? যোগ্য পাত্রে অর্পণ ক'রে হরিদ্বারে যাওয়া কি আমার অদৃষ্টে ঘটবে?"

শুনিয়া নীরজা বাল্যভাব ছাড়িয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "বাবা হরিদ্বারে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না? আমি সঙ্গে যাব। হরিদ্বার কতদূর?"

স। "অনেক দূর।"

"তা হোক্ অনেক দূর! আমরা যদি যাই আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে বেড়িয়ে আসবেন?" শেষের কথাগুলি প্রমোদের দিকে চাহিয়া বালিকা বলিল। সন্ন্যাসী অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে নীরজার প্রতি চাহিলেন, কি ভাবে এই কথাটি তাহার অন্তঃস্থল হইতে বাহির হইল, তিনি তাহা যেন জানিতে চেষ্টা করিলেন। যে একটী ভাবে সমস্ত পৃথিবী মুগ্ধ, সমস্ত জগৎ সংসার চলিতেছে, সন্ন্যাসী দেখিতে চাহিলেন, নীরজার ঐ ব্যাকুলতা সেই ভাবের অঙ্কুর কি না? কিন্তু কিছু

বুঝিতে পারিলেন না। প্রমোদ বলিলেন, "তা যেতে পারি হরিদ্বার কতই বা দূর!"

নী। বাবা ত বল্লেন সে অনেক দূর—অতদূর কি আপনি যাবেন?

প্রমোদ প্রত্যুত্তরে একটু হাসিলেন, সন্ন্যাসী ওকথা বন্ধ করিবার জন্য বলিলেন "নীরজ, তোকে রেখে কি আর আমি হরিদ্বার যাব? তোর আগে বিবাহ হ'ক। কিন্তু তাহ'লেই কি যেতে পারব? উঃ মায়ার কি প্রচণ্ড পীড়ন, জানছি কিছুই কিছু না, জানছি সেই পরব্রহ্ম বই আর গতি নাই, দিনও প্রায় অবসান হ'য়ে এল, তথাপি

'মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়াপ্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণ॥

সন্ন্যাসী চক্ষু নিমীলিত করিলেন, দুই এক বিন্দু অশ্রুবারি তাঁহার গণ্ড বাহিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইবার পর, প্রমোদ বাড়ী যাইবার নিমিত্ত বিদায় প্রার্থনা করিলেন। তখন সন্ন্যাসী, স্বয়ং পথপ্রদর্শক হইবার ইচ্ছায় উঠিলেন। নীরজা সঙ্গে আসিতে চাহিল, কিন্তু সন্ন্যাসী নিষেধ করিয়া বলিলেন "কাল প্রাতে আমি আবার নৈমিষারণ্যে যাব, তোমার খুব রাত থাকতে উঠতে হবে, শুতে আর বিলম্ব করো না।" নীরজা ইহাতে কিছু ক্ষুণ্ণ হইল, কিন্তু পিতার কথায় বিরক্ত না হইয়া শয়ন করিতে গমন করিল।

প্রমোদ বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, যামিনীনাথ সেখানে নাই, ভৃত্যের নিকট শুনিলেন, অপরাহ্নে কলিকাতার এক পত্র পাইয়া বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ সেই রাত্রেই তাঁহাকে কলিকাতায় যাইতে হইয়াছে।

একাকী সেখানে সে রাত্রি কাটাইয়া পরদিন প্রমোদও প্রয়াগ যাত্রা করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কনকলতা

এইখানে আমরা কনকের কথা কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কনক এখন পঞ্চদশবর্ষীয়া, কিন্তু তাহার এখনো বিবাহ হয় নাই। সুশীলা ও প্রমোদ দুজনেরই বাল্যবিবাহে বিশেষ ঘৃণা বলিয়া কনকের এখনো তাঁহারা বিবাহ দেন নাই। কনক স্নেহময়ী প্রতিমা। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানির সমস্তই ভালবাসায় পূর্ণ। সুশীলাকে সে মাতার মতই ভাল বাসে—আর তাহার ভাইটিকে? কোন প্রণয়িনী বুঝি তাহার প্রণয়ীকেও এত ভালবাসিতে পারে না। যদি সম্ভব হইত—তবে প্রমোদের পায়ে ধূলা লাগিতে না দিয়া মাটীতে সে বুক পাতিয়া রাখিত।

যতদিন প্রমোদ কলিকাতায় থাকিতেন, ততদিন অত্যন্ত কষ্টে কনকের দিন কাটিত, সে কেবল দিন গণিত কবে ছুটীতে তিনি বাড়ী আসিবেন; এবং ইহার মধ্যে ভ্রাতার জন্য মোজা গলাবন্ধ কতই বুনিয়া রাখিত। ভাইটি আসিলে কি করিয়া তাহাকে আদর যত্ন করিবে, কি গল্প করিবে, কি ভাষায় তাহার বিরহদুঃখ প্রকাশ করিবে; এই সমস্ত বিষয় লইয়া কতই ভাবিত, কতই না কল্পনা করিত! কিন্তু অনেক কল্পনাই তাহার মনের মধ্যে সৃষ্ট হইয়া মনের মধ্যেই লয় পাইয়া যাইত;—মুখ ফুটিয়া কোন আদরের কথা, ভালবাসার কথা ব্যক্ত করিতে সে লজ্জিত হইত, সাহসেও কুলাইত না—হাজার ইচ্ছা হইলেও সে তাহা পারিত না। তবে, কনকের সকল কার্য্যেই, একটি সাধারণ ক্ষুদ্র কথাতেও তাহার মনের প্রগাঢ় স্নেহভাব প্রকাশ পাইত। কনক সর্ব্বদাই প্রমোদকে পত্র লিখিত,

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কিন্তু সময়াভাবে প্রমোদ কনকের সকল পত্রের উত্তর দিতে পারিতেন না। আপনার দশখানির উত্তরে কনক দু'একখানি যাহা পাইত, তাহাতেই তাহার আহ্লাদ ধরিত না। প্রমোদ কিন্তু ভগিনীর সেই নিঃস্বার্থ ভালবাসা কিছুই বুঝিতেন না। তবে সর্ব্বপ্রথমে তিনি যখন বাড়ী হইতে কলিকাতায় পড়িতে আসেন তখন, প্রথম বিদেশে আসিয়া স্নেহের অভাব কিছু বুঝিয়াছিলেন। কলিকাতায় প্রথমে আসিয়া প্রমোদ দেখিলেন এখানে আর তাঁহার জন্য কেহ যত্নে বাদাম কুড়াইয়া দেয় না, যত্নে তাঁহার পড়িবার বইগুলি কেহ গুছাইয়া রাখে না, তাঁহার বিষণ্ণ মুখ দেখিলে কেহ কাতরভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকে না, তাঁহার কষ্টে কেহ ভ্রূক্ষেপও করে না। প্রমোদ তখন তাঁহার ভগিনীর স্নেহ বুঝিতে পারিলেন, স্নেহের অভাব কি ভয়ানক—বুঝিতে পারিলেন। আগে কত সময় কনককে মর্ম্মে আঘাত দিয়াছেন, বিষণ্ণ ভ্রাতাকে কনক কাতরভাবে সান্ত্বনা দিতে আসিলে, প্রমোদ বিরক্তভাবে উঠিয়া গিয়া তাহাকে কত মর্ম্মপীড়া দিয়াছেন, আদর করিয়া খাওয়াইতে আসিলে কতবার হাত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া তাহাকে কাঁদাইয়াছেন, তাহার ভালবাসার প্রতিদানে বিরক্তি ও তাচ্ছল্য উপহার দিয়া তাহাকে কত কষ্ট দিয়াছেন, কাছে থাকিতে প্রমোদের তখন এ সকল কিছুই মনে হয় নাই, এখন সহসা অপরিচিতের মধ্যে আসিয়া স্নেহের অভাব বুঝিয়া এই সকল কথা তাঁহার মনে পড়িল। কি করিয়া ভ্রাতার দোষ ভ্রাতার অজ্ঞাতভাবে আপন স্কন্ধে লইয়া সে প্রমোদকে সুশীলার নিকট নির্দ্দোষী প্রতিপন্ন করিত, কত সময় সেই জন্য কনক কত কষ্ট পাইত, প্রমোদের তাহা মনে পড়িল। তাঁহার মনে পড়িল, এক দিন বৃষ্টির পর তাঁহারা ভ্রাতাভগিনীতে বৃষ্টির জলে উদ্যানে খেলা করিতেছিলেন, হঠাৎ বাতায়ন হইতে সুশীলা তাহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ডাকিলেন, প্রমোদ তাঁহার নিকট যাইতে যাইতে আবার

অনিচ্ছুক হইয়া অন্য স্থানে পলায়ন করিল, প্রমোদের পলায়নে কনক হৃষ্টচিত্তে একাকী সুশীলার নিকট গেল। কনকের সন্তুষ্টির কারণ তখন প্রমোদ বুঝিতে পারেন নাই, তাহার পর বুঝিলেন যে কনক এখন একাকী গেলে, তাহার উপর দিয়াই যাহা ঝড় বহিবার বহিয়াই ক্ষান্ত হইয়া যাইবে, প্রমোদের আর কোন কষ্ট পাইতে হইবে না, এই মনে করিয়াই কনক আহ্লাদপূর্ণ হইয়াছিল। আপন পৃষ্ঠে শাস্তি লইয়া ভ্রাতাকে বাঁচাইতে পারিল, এইজন্য কনকের যে প্রচুর আহ্লাদ হইয়াছিল, তাহা প্রমোদের মনে পড়িল। এইরূপ কত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নেহময় ঘটনাগুলি তখন প্রমোদের মনে পড়িতে লাগিল। তখন কনকের ভালবাসা তাঁহার নিকট অমূল্য বলিয়া বোধ হইল। আপনাব সমস্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার মনে করিয়া প্রমোদের অনুতাপ হইতে লাগিল। ভাবিলেন এবার বাড়ী গিয়া আর কনককে কষ্ট দিবেন না। কিন্তু দিন কতক কলিকাতায় থাকিতে থাকিতে আবার যখন কলিকাতা সহিয়া গেল, তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনি সে সকল কথাও ভুলিয়া গেলেন, কনককেও ভুলিলেন, অনুতাপেরও ক্রমে অবসান হইল। কিন্তু কনক ভাইটিকে দেখিবার জন্য কতই ব্যাকুল হইত, সারা বৎসর তাহার জন্য কতই উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিয়া থাকিত, পরে ছুটিতে প্রমোদ বাড়ী আসিলে সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। যে ক'দিন প্রমোদ বাড়ী থাকিতেন কি সুখে যে দিনগুলি তাহার কাটিত তাহা বলিবার নহে। এবারও সারাবৎসর অপেক্ষা করিয়া করিয়া আশ্বিন মাস আসিল, কত ব্যগ্রভাবে কনক প্রমোদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল তাহা বলা যায় না। কিন্তু অবশেষে এক দিন হতাশ হইয়া তাহার শুনিতে হইল যে, প্রমোদ আপাততঃ রানপুরে বেড়াইতে যাইতেছেন, সেখান হইতে কিছুদিন পরে আসিবেন। কনক বালিকার বড়ই কষ্ট হইল, কিন্তু কি

করিবে?—সহিষ্ণুতার সহিত আবার দিন গণিতে লাগিল। প্রমোদ যে দিন কানপুর হইতে বাড়ী আসিলেন, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টি অপরিমিত সুখে ভাসিতে লাগিল। বিশেষতঃ প্রমোদের ভাবভঙ্গী এবারে অন্যবার হইতে স্নেহমমতাময়। প্রমোদের সদা প্রফুল্ল মুখখানি এবারে এমন এক নূতন অমায়িক উজ্জ্বল জ্যোৎস্নাময় ভাবে পরিপ্লুত, যে দেখিলে বোধ হয় তাঁহার হৃদয়ে একটি নূতন ভাবের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। কিন্তু ছুটির দিন শীঘ্রই অবসান হইল, কনকের সুখের দিনও অবসান হইল; প্রমোদের আবার কলিকাতায় যাইবার দিন আসিয়া পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভ্রাতা-ভগিনী

প্রমোদ আজ সন্ধ্যাকালে কলিকাতায় যাইবেন, তাঁহার সঙ্গে লইবার সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী কনক গুছাইয়া দিল। পোর্টম্যাণ্টে কাপড় রাখিল, বই সাজাইল; হাতব্যাগে অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির সহিত স্বহস্তনির্ম্মিত পশমের মোজা গলাবন্ধ এবং টিফিন বাক্সে নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে বাগানের কতকগুলি বাদাম পর্য্যন্ত পুরিয়া বাক্সগুলি বন্ধ করিল। তাহার পর চাকরের হাতে চাবি সমর্পণ করিয়া পাঠগৃহে আসিয়া বসিল। পাঠে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া একখানি পাঠ্য পুস্তক লইয়া পড়িতে গেল। শীঘ্র শীঘ্র অনেকগুলি পাতা উল্‌টাইল বটে, কিন্তু পড়িয়া তাহা উল্‌টাইল কিম্বা অশ্রুসিক্ত হওয়াতে তাহা উল্‌টাইতে বাধ্য হইল, তাহা আমরা ঠিক

বলিতে পারিলাম না। কিছু পরে কনক বিরক্তভাবে বইখানি মুড়িয়া অঞ্চলে অশ্রু মুছিতে লাগিল, মুছিয়া মুছিয়া আবার কি ভাবে জানি না, বইখানি খুলিয়া পড়িতে গেল, এই সময় প্রমোদ ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আস্তে আস্তে তাহার নিকট আসিয়া একখানি চৌকিতে স্থিরভাবে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি পড়ছিলে?"

"ভারতবর্ষের ইতিহাস।"

"কই দেখি" বলিয়া প্রমোদ বইখানি হাতে লইলেন, কিন্তু তাহাতে একবার চক্ষু বুলাইয়াই আবার সশব্দে টেবিলের উপর ফেলিয়া রাখিয়া বলিলেন "কনক!—"

কনক বলিয়াই প্রমোদ থামিলেন, কি বলিতে গিয়াছিলেন আর বলিলেন না, কনক তাহা বুঝিয়া বলিল "দাদা, কি? কি বলছিলে বল না?"

"না, কিছু না—জিজ্ঞাসা করছিলুম তোর ইতিহাস বেশ মনে আছে? বল দেখি নূরজাহান কে?"

"সের আফগানের স্ত্রী, পরে জাহাঙ্গীরের রাণী হয়।"

"জাহাঙ্গীর নূরজাহানকে চিন্‌লে কি করে?"

"অল্পবয়স্কা নূরজাহান আকবরের অন্দরে প্রায়ই থাকত, সেই সময় যুবরাজ জাহাঙ্গীর তাহাকে দেখে রূপে মুগ্ধ হন।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তার পর সের আফগানের সঙ্গে বিবাহের পর আবার জাহাঙ্গীরের রাণী হ'ল কি করে?"

"জাহাঙ্গীরের আদেশে সের আফগান নিহত"

কনকের কথাটি শেষ না হইতে হইতেই প্রমোদ বলিলেন—

"ছিঃ ছিঃ, জাহাঙ্গীরের প্রেম প্রেমই নয়, সে প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন কই?" বলিতে বলিতে প্রমোদের মনে কত ভাব বহিয়া গেল। মনে হইল নীরজা যে তাঁহার হইবে, ইহা তো তাঁহার দুরাশা।

নীরজা এক দিন অন্যের হইবেই, নিতান্তই পর হইয়া যাইবে, যদি তখন কখনও দেখা হয় তো তাঁহার কাছ হইতে লুকাইবে, আর হয় তো কখনও দেখিতেও পাইবেন না। ভাবিতেও তাঁহার কষ্ট হইল, নৈরাশ্যাবেগে প্রমোদের ওষ্ঠাধর মৃদু মৃদু কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি প্রশান্ত ভাবে চৌকি হইতে উঠিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন, "নূরজাহানের ছবি কখনো দেখেছিস্?"

"দেখেছি। আমার ইচ্ছা হয় আমাদের অমনি একটি বেশ সুন্দর বৌ হয়। দাদা, তুমি বিয়ে করবে না? তাহলে আমার বেশ একটী সঙ্গী হয়।"

প্রমোদের প্রফুল্ল অমায়িকতায় আশ্বস্ত হইয়া কনক আজ মুক্তকণ্ঠ, তাহাকে ঈষৎ প্রগল্‌ভ বলিতেও আমাদের সঙ্কোচ হইতেছে না। প্রমোদ কনকের সেই সরল প্রশ্নে ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, কি ভাবিতে ভাবিতে একটি সেল্‌ফের উপর, যেখানে কতকগুলি পুস্তক সজ্জিত ছিল সেইখানে আসিলেন, অন্য মনে তাহার মধ্য হইতে একখানি বই তুলিয়া হাতে লইলেন। কনক বলিল, "দাদা তোমাকে আজ অমন দেখছি কেন, তুমি আমাকে কি বলতে যাচ্ছিলে, কই বল্‌লে না?"

প্রমোদ বলিলেন, "বলতে গিয়েছিলুম সত্য, কিন্তু কেন যে তোকে বলতে গেলুম তা তো জানি না"। কনক মুখটী চুন করিয়া বলিল, "আমাকে বল্‌লে কি দোষ হয়?"

"তুই ছেলে মানুষ, তোর কাছে সে কথা বলতে যাওয়াই পাগলামি?"

"কখনো তো কিছু বলতে আস না, তবে যে আজ বলতে এলে?"

"পাগলামি, মনের চঞ্চলতা। কি আর বলব, কিছুই না।—তোকে আর এক দিন পড়া শুনা জিজ্ঞাসা করব, এখন পড়।"

কনক দেখিল প্রমোদের মুখে তাঁহার সেই স্বাভাবিক চঞ্চল

ভাব নাই, তিনি ঈষৎ বিষণ্ণ, কথা ধীর অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক। কথা কহিতে কহিতে প্রমোদ অন্যমনে সেই সেল্‌ফের এক একখানি বই লইয়া টেবিলে ফেলিতে লাগিলেন, কনক অন্যমনস্কতা বশতঃ তাহা দেখিল না; দুঃখিত ভাবে প্রমোদকে বলিল· "তুমি দাদা আমাকে কোন কথাই বলতে চাও না।" কনকের মুখখানি ম্লান হইল, চোখ দু'টি ছল ছল করিয়া আসিল। প্রমোদ কনকের কথায় নিরুত্তর হইয়া রহিলেন, তাহার কথা শুনিতে পাইলেন কি না তাহাও বোঝা গেল না। ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া প্রমোদ সে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। তাহাতে কনকের বড় দুঃখ হইল, কনকের কান্না আসিল, কাঁদিয়া কিছু হাল্‌কা হইলে গৃহান্তরে যাইবার জন্য উঠিল, উঠিয়া সেল্‌ফের বইগুলি টেবিলে স্তূপাকার দেখিয়া সহসা তাহার যেন চমক ভাঙ্গিল, ব্যস্ত হইয়া বইগুলি গুছাইয়া সেল্‌ফে তুলিতে গেল।

সে বইগুলি সুশীলার যত্নের বই, বাল্যকালে তাঁহার পিতা তাঁহাকে আদর করিয়া পড়িতে দিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সুশীলা তাহা অতি যত্নে রাখিয়াছিলেন। কেহ তাহাতে হাত দিলে তিনি অতিশয় বিরক্ত হইতেন, স্বহস্তে সেগুলি তিনি প্রত্যহ মুছিয়া রাখিতেন। একদিন কনক আপন পড়ার বই একখানি হারাইয়া সেই সেল্‌ফে তাহা খুঁজিতে গিয়াছিল, তাহাতে সুশীলা তাহাকে বকিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে সেই সেল্‌ফে হাত দিতে বিশেষরূপে বারণ করিয়াছিলেন। সেই অবধি আর কনক তাহাতে হাত দিত না। এখন কনক তাড়াতাড়ি বই গুছাইতে যাইতেছে, এই সময় সহসা সুশীলা এই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বালিকার মুখখানি শুকাইয়া গেল, চোরের ন্যায় সে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বইগুলির ঐরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া সুশীলা অতিশয় বিরক্ত হইলেন।

সুশীলা স্বভাবতই কিঞ্চিৎ বাহুল্যরূপে কর্ত্তব্যজ্ঞান-সম্পন্ন, আপন আজ্ঞা পালিত না হইলে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতেন। অল্প ত্রুটিতেই কিঞ্চিৎ কঠোর হইয়া পড়িতেন। তাঁহার বিশেষ বারণ সত্ত্বেও কনক উহাতে হাত দিয়াছে, তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন; ভাবিলেন, "সেদিন বারণ করিলাম, বিশেষরূপে বারণ করিলাম, আবার সেইকাজ! আমার কথায় অবহেলা! গুরুলোকের আজ্ঞাপালনে অবহেলা! কি করিয়া এ মেয়েকে কর্ত্তব্য শিখাইব?"

সুশীলা পিতাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন, তাঁহার দত্ত বইগুলিও সেই হেতু তিনি ভক্তির চক্ষে দেখিতেন। তিনি ভাবিলেন, কনক যদি সুশীলাকে তেমন ভক্তি করিত, তাহা হইলে তাঁহার কথা কখনই অগ্রাহ্য করিতে পারিত না। মেয়েছেলের গুরুজনের প্রতি ভক্তি নাই, কি ভয়ানক কথা! সুশীলা বড় ভাবিত হইয়া পড়িলেন। গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "বইগুলিতে হাত দিতে আমার বারণ তা কি তুমি জান না? কেনই বা বারণ, তাও কি আমি তোমাকে বলি নাই? তবুও তুমি কথা মাননা?"

কনক চুপ করিয়া রহিল, কি উত্তর দিবে? যদি বলে—আমি ওরূপ করি নাই, তাহা হইলে সুশীলা আবার জিজ্ঞাসা করিবেন, কে তবে করিয়াছে, প্রাণ থাকিতে ভ্রাতার নাম বলিতে পারিবে না। কোন উপায় না দেখিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। সুশীলা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তথনও কনক নিরুত্তর। একে দোষী, তাহাতে আবার এইরূপ ব্যবহার! তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তবু হাল ছাড়া উচিত নহে, তবু তো চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে, দেখা যাক, যদি শাস্তি দিয়াই তাহার স্বভাব শোধরাইতে পারেন, তিনি শাস্তি স্বরূপ বলিলেন, "প্রমোদের সঙ্গে আজ দেখা করতে পাবে না, সে আজ রাত্রে যাবে, সে সময় তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।" সুশীলা জানিতেন, এ শাস্তি তাহার

পক্ষে শাস্তির পরাকাষ্ঠা হইবে। রাত্রিকালে যাইবার সময় প্রমোদ সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কনক আজ কোথায়? তাকে আজ অনেকক্ষণ দেখি নি, আমার আবার যাবার সময় হয়ে এল, এখনো যে তার দেখা নেই?" সুশীলা বলিলেন, "সে আজ দোষ করেছে, শাস্তি স্বরূপ তাকে বন্ধ রেখেছি।" প্রমোদ শুনিয়া একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং বিমর্ষভাবে বাড়ী হইতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু গাড়ীতে গিয়া সে কথা ভুলিয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হরিণী-জালে

সন্ন্যাসী নৈমিষারণ্যে গিয়াছেন। নীরজা মন্দির হইতে কিয়দ্দূরে পাথরবাঁধান বকুল-তলে বসিয়া, ৩০।৩২ বয়স্ক একটি কৃষ্ণবর্ণ স্থূলকায় স্ত্রীলোকের সহিত হিন্দুস্থানী ভাষায় গল্প করিতেছিল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে অস্ফুট জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়া বকুল-তলাটি ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়াছিল, মৃদু মৃদু বাতাস বহিতেছিল, সেই বাতাসে একটি একটি করিয়া বকুল খসিয়া বৃক্ষতল ছাইয়া ফেলিয়াছিল।

নীরজা সেই ফুলরাশির মধ্য হইতে কতকগুলি ফুল হস্তে লইয়া খেলিতে খেলিতে তাহার গল্প শুনিতেছিল। স্ত্রীলোকটি তাহার ঘর-কন্নার কথা, দুঃখধান্ধার কথা, তাহার পুত্রকন্যার কথা বলিতেছিল, নীরজা কৌতূহলের সহিত তাহা শুনিতে শুনিতে মাঝে মাঝে দুই একটি প্রশ্ন করিতেছিল। কাঠুরিয়া রমণীর নববিবাহিতা কন্যার কথা শুনিয়া নীরজা বলিল "বসু, আজ তাকে সঙ্গে আনলে না কেন?"

বসুমতী বলিল "সে শ্বশুর বাড়ী গেছে, মা।" এই কথায় নীরজা, ভূমি হইতে এক অঞ্জলি বকুল কুড়াইয়া বসুর অঞ্চলে দিয়া বলিল "আহা, সে ব'লেছিল তার স্বামী এলেই আবার সে এই বকুল ফুল নিয়ে যাবে, তুমি এই গুলি তাকে পাঠিয়ে দিও।"

"বসু বলিল "মা! আমরা দুঃখ করে খাই, কে আবার কাল তার শ্বশুর বাড়ী ঐ ফুল দিতে যায় বল?" কথা কহিতে কহিতে সহসা পেচকের বিকট চীৎকারে তাহারা চমকিয়া উঠিল, নীরজা ত্রস্তে, একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, বসু অমঙ্গলসূচক পেচকশব্দে ভীত হইয়া "দূর দূর"করিয়া উঠিয়া বলিল "গাটা যেন চমকে উঠলো, সন্ন্যাসীমশয় নেই, অমনিতেই কেমন ভয় হয়। ঠাকুরকে ডাকৃব নাকি।"

নী। "হ্যাঁ একটা পেঁচা ডাকৃছে তাই ঠাকুরকে ডাকতে হবে! আমিও প্রথমটা চমকে উঠেছিলুম বটে। যাকৃ, তুমি তোমার মেয়ের গল্প কর। যমুনা তার স্বামীকে খুব ভালবাসে—না?"

আবার এই সময় পূর্ব্বের ন্যায় পেচক ডাকিয়া উঠিল, সেই অমঙ্গল-সূচক কর্কশ স্বরে নীরজাও কেমন শিহরিয়া উঠিল, গল্প ছাড়িয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল। অস্ফুট চন্দ্রালোকে সে দেখিতে পাইল, চারিজন লোক তাহাদের নিকটেই আসিতেছে, দেখিতে দেখিতে লোকেরা নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। নীরজা অরণ্য-পালিত হইয়াও তাহাদের এই ভীমমূর্ত্তি, সেই কঠোর কটাক্ষ দেখিয়া কেমন ভীত হইয়া পড়িল, বসুও সভয়ে তাড়াতাড়ি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কে?" কিন্তু এই সময় চকিতের ন্যায় এক ব্যক্তি নীরজাকে শূন্যে তুলিয়া লইল এবং দুইজন বসুকে গিয়া ধরিল। তাহারা ইহাতে চমকিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু সে শব্দ মন্দির পর্য্যন্ত পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বস্ত্রদ্বারা উভয়ের মুখ বন্ধ হইয়া গেল। নীরজা দস্যুক্রোড়ে হস্ত পদ ছুঁড়িয়া বলপ্রকাশ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সেই

বলবান ব্যক্তির হস্তপেষিত হইয়া ক্রমে সে শক্তির অবসান হইল। নীরজাকে লইয়া একজন দস্যু পলাইল, আর তিন জন সেই বলপ্রকাশকারী কাঠুরিয়া‚ স্ত্রীলোককে রজ্জুদ্বারা বৃক্ষে বন্ধনপূর্ব্বক দ্রুতগতিতে জঙ্গল ছাড়াইয়া তাহাদের সহিত মিলিয়া নদীতীরে উপস্থিত হইল। নদীতীরে একখানি নৌকায় উঠিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল; নৌকা চলিতে আরম্ভ করিলে তাহারা বালিকার মুখের বন্ধন মোচন করিয়া দেখিল—বালিকা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। মুখে জলসিঞ্চন করিতে করিতে কিছুক্ষণ পরে নীরজার জ্ঞানোদয় হইল; নীরজা চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—ব্যাকুল ভাবে চাহিয়া দেখিল—কোথায় সে পরিচিত বনভূমি—কোথায় বা সে মন্দির! দেখিল—তাহার পরিবর্ত্তে চারিদিকে ভীমদর্শন অপরিচিত মূর্ত্তিসমূহ তাহাদের তীব্র কঠোর দৃষ্টি মেলিয়া তাহাকে যেন গ্রাস করিতে উদ্যত! পূর্ব্বঘটনা নিমেষে স্মরণ হইল, বালিকা ঠাকুরজি—ঠাকুরজি করিয়া চাৎকার করিয়া উঠিল, অমনি একজন বলবান লোক হস্ত দ্বারা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "চীৎকারে কোন ফল নাই, চীৎকার করলেই মুখ বেঁধে ফেলব, কিন্তু ভালয় ভালয় চললে কিছু বলব না।" আর একজন বলিল—"আমরা কি তোমাকে খেয়ে ফেলব না কি? ভাল মানুষের মত চল—আমরাও ভাল মানুষ—নইলে আমরা সায়েস্তা করতে জানি।" বালিকার হৃদ্‌স্পন্দন যেন নিরুদ্ধ হইয়া আসিল, আতঙ্কে সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। তাহাকে নীরব নিস্তব্ধ দেখিয়া দস্যু তাহার মুখ হইতে হস্ত সরাইয়া লইল। যখন পুনরায় বালিকা চক্ষু খুলিল তখন নিকটে কাহাকেও দেখিল না। বালিকাকে নিদ্রিত ভাবিয়া একজনকে মাত্র লোককে প্রহরীরূপে নৌকার প্রকোষ্ঠ-দ্বারে রাখিয়া অন্য সকলে দাঁড় টানিতে বসিয়াছিল। উক্ত প্রহরী খানিকক্ষণ বসিয়া বসিয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িয়াছিল। নীরজা তাহাকে নিদ্রামগ্ন ভাবিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিল, নৌকার গবাক্ষে

মুখ সংলগ্ন করিয়া নদীর দিকে চাহিয়া রহিল। সেই ভয়ানক অবস্থায় কিরূপ প্রচণ্ড ঝটিকা তাহার মনে বহিয়া যাইতেছিল, তাহা বর্ণনাতীত। কি প্রকারে দস্যু-হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে, ক্রমাগত তাহাই সে ভাবিতে লাগিল কিন্তু কোনও উপায়ই দেখিল না। বুঝিল তাহার আশা নাই, ভরসা নাই, এই দস্যুদের হস্তে একাকী সে অসহায়! তাহার ভাবিতেও আর শক্তি রহিল না। সে তখন সেই নৌকা-গবাক্ষ হইতে নদীতে ঝাঁপ দিবার সঙ্কল্প করিয়া ধীরে ধীরে তাহার উপর উঠিয়া বসিয়া পদদ্বয় নির্গত করিয়া দিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রহরী ঘুমায় নাই; সে তাহার অভিসন্ধি বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গবাক্ষের নিকট হইতে নীরজাকে টানিয়া আনিল। নীরজা দস্যুহস্ত স্পর্শে শিহরিয়া উঠিয়া ছিন্নলতিকার ন্যায় পুনরায় নৌকা মধ্যে লুটাইয়া পড়িল।

নবম পরিচ্ছেদ

দূরে নৌকা

নিদারুণ যন্ত্রণায় আকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রমে যখন বালিকা একান্ত ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল, তখন শোকতাপহারী তন্দ্রা আসিয়া তাহাকে বিশ্রাম প্রদান করিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সহসা কাহার কঠিন হস্তস্পর্শে বালিকা চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠিল। তখন চারিদিক ঘনঘোর অন্ধকার, কিছুপূর্ব্বে নৌকায় যে আলো জ্বলিতেছিল তাহাও নিভিয়া গিয়াছে, অনুবরত দাঁড়ের ঝপ্ ঝপ্ শব্দ

নিস্তব্ধ রজনীর ভয়ঙ্কর ভাব বৃদ্ধি করিয়া তুলিতেছে, তাহা হইতেও ভয়ানক, তাঁহার শিয়রে বসিয়া একজন মনুষ্য অস্ফুটকণ্ঠে তাহাকে কি বলিতেছে। নিদ্রিত হইয়া সে তাহার বিপদের কথা সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছিল, তাই নিদ্রাভঙ্গে সহসা শীর্ষদেশে মনুষ্য দেখিয়া সে পুনরায় চীৎকার করিবার উপক্রম করিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপনার বিপন্ন অবস্থা ও দস্যুদিগের সেই নিষেধ বাক্য মনে পড়ায় অমনি থামিয়া গেল। সে ব্যক্তি মৃদুস্বরে বলিল "ভয় নাই আস্তে কথা কও, আমি তোমাকে উদ্ধার করব।" যখন নীরজা ভাবিতেছিল তাহার আশা ভরসা কিছুই নাই—সে অকূল পাথারে ভাসিয়াছে, তখন রক্ষার কথা শুনিয়া মুমূর্ষু ব্যক্তির সুরা সেবনের ন্যায় সহসা আনন্দে তাহার হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিল—কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যেই হতাশ্বাস হইয়া সন্দিগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে? এখানে যারা ছিল তারা কোথায় গেল? তুমি আমাকে কেমন করে রক্ষা করবে?"

উত্তর হইল "তারা ঘুমোতে গেছে, আমি এখন পাহারায় আছি, আমি এ নৌকার একজন দাঁড়ি, তোমার দুর্দ্দশায় দয়া হয়েছে। আমার কথামত কাজ করলে তোমাকে উদ্ধার করতে পারি।"

নীরজা ভাবিল 'আমি নিরুপায়, যদি এর প্রতারণার ইচ্ছা থাকে তা হলেও মরব, এখানে থাকলেও মরব, এরূপ স্থলে এ'কে বিশ্বাসই করা যাক।' সে বলিল "কি করতে হবে?"

"এখন কিছুই করতে হবে না, তুমি কেবল পালাবার চেষ্টা কর' না, পরে আমি গোপনে কোন ভদ্রলোকের সাহায্য নিয়ে তোমাকে উদ্ধার করব। কিন্তু যা বলি বিশ্বাস করে কাজ করো।"

নীরজা সে কথায় সম্মত হইল, তখন দাঁড়ি সেখান হইতে গিয়া নৌকার দ্বারদেশে শুইয়া রহিল। ক্রমে দিন যাইতে লাগিল, প্রত্যহই নীরজা উদ্ধারের জন্য লালায়িত হইতে লাগিল। দুই তিন দিনের মধ্যে

নৌকা এলাহাবাদে আসিয়া লাগিল। যে দাঁড়ি নীরজাকে আশা দিয়াছিল, সে তীরে খাদ্য দ্রব্য কিনিতে নামিল, সুতরাং নৌকা তীরে লাগাইয়া অন্যেরা তাহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। মাঝি খাদ্য সামগ্রী লইয়া নৌকায় উঠিয়া নীরজাকে চুপে চুপে বলিল "আর ভয় নেই, তোমার উদ্ধারের জন্য শীঘ্রই একখানি নৌকা আসছে।" নীরজা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, সে আকাঙ্ক্ষিত সময়ের জন্য বড়ই অধীর হইয়া পড়িল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, একটু একটু মেঘ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, গবাক্ষপথে মুখ দিয়া অন্ধকার জলরাশির দিকে চাহিয়া চাহিয়া নীরজা উদ্ধারের আশায় ব্যাকুল হইয়া রহিল। প্রত্যেক নৌকাই ঝপ্ ঝপ্ শব্দে তাহার আশা বাড়াইয়া আবার চোখের উপর দিয়া অন্য দিকে চলিয়া যায়, নীরজা অমনি হতাশ অবসন্ন হইয়া পড়ে। দেখিতে দেখিতে অবশেষে সত্য সত্যই একখানি নৌকা তীব্রবেগে এই নৌকার নিকট আসিয়া ইহার গতিরোধ করিল, ভয়ে মাঝিরা নৌকা থামাইল, অমনি একটি ভদ্র যুবা লাফাইয়া এ নৌকায় উঠিয়া আসিলেন। ঘন ঘন বন্দুকের শব্দে ভীত হইয়া নৌকার লোকেরা তাঁহার সহিত বিবাদ করিল না; কে কোথায় লুকাইল, কে কোথায় পলাইল তাহার ঠিকানা রহিল না। সুতরাং অনায়াসে যুবা নৌকামধ্যে নীরজার নিকট আসিলেন। নৌকার দীপালোকে নীরজা সেই যুবাকে চিনিতে পারিল, নীরজা দেখিল— 'যামিনীনাথ তাঁহার উদ্ধারকারী। যামিনীনাথ তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য ভাবে বলিলেন "তুমি বনবালা! এস আমার সঙ্গে এই বোটে শীঘ্র এস।" দস্যুহস্তমুক্ত হইয়া আহ্লাদে নীরজার কথা কহিবার শক্তি ছিল না, সে নিঃশব্দে যামিনীনাথের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া তাঁহার বোটে উঠিল। বোট ছাড়িয়া দিল।

———

দশম পরিচ্ছেদ

অবিশ্বাস

বিডন উদ্যানের অনতিদূরে একটি বাড়ী, সেই বাড়ীর একটি কক্ষে একাকী বসিয়া প্রমোদ অধ্যয়নে নিযুক্ত ছিলেন। প্রমোদ যে চৌকিতে বসিয়াছিলেন, তাহারি সম্মুখে একটি টেবিল, টেবিলের মধ্যভাগে একটি বাতি জ্বলিতেছিল এবং তাহার আশপাশ পুস্তক রাশিতে পূর্ণ হইয়া ছিল। কিন্তু এ কি জ্বালা? বই লইয়া পড়িতে বসিলেই মনে এত প্রকার ভাবনা আসিয়া পড়ে যে, চমকিয়া ক্ষণকাল পরে দেখিতে হয় খোলা পাতাটি তেমনিই খোলা আছে, তাহার একটুও পড়িয়া উঠিতে পারেন নাই। এদিকে নিকটেই তাঁহার বি-এ পরীক্ষা; পড়িতে না মন লাগিলেই বা চলিবে কেন? পড়া হৌক্ না হৌক্, সম্মুখে বই না রাখিলেও আবার মন বোঝে না। অনেকক্ষণ হইতে একখানি বিজ্ঞান পুস্তক লইয়া মাথা ঘোরাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু অবশেষে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তিনি বই খানি মুড়িয়া দূরে ফেলিলেন। হাতের কাছেই একখানি কোল্‌রিজ পড়িয়া ছিল, ভাবিতে ভাবিতে সেইখানি খুলিলেন, প্রথমেই যে কবিতাটিতে তাঁহার চক্ষু পড়িল তাহা যেন তাঁহার মনের প্রতিধ্বনি বলিয়া বোধ হইল, কথাগুলি তাঁহার হৃদয়ে যেন মিশিয়া গেল, তিনি পড়িলেন "Oft in my waking dreams do I live o'er again that happy hour;" তাঁহার আর পড়া হইল না—একজন ভৃত্য আসিয়া তাঁহার পড়ায় বাধা দিয়া বলিল "একজন সন্ন্যাসী এসেছেন, তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।" সন্ন্যাসীর নাম শুনিয়া প্রমোদ চমকিত হইলেন,

তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ উপরে আনিতে ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, ভৃত্য বলিল "তিনি আসবেন না, বস্‌বেন না, পথে দাঁড়িয়ে আছেন, পথেই আপনার সঙ্গে কি কথা ক'য়ে চলে যাবেন।" প্রমোদ কিছু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "তবে চল।" এই বলিয়া ভৃত্যের সহিত প্রমোদ সন্ন্যাসীর নিকট আসিলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং আহ্লাদের সহিত প্রণাম করিয়া বলিলেন, "যদি অনুগ্রহ করে আমাকে মনেই করলেন, তবে একবার ভিতরে এসে বসুন।"

সন্ন্যাসী মৃদুগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "না আমার সঙ্গে একটু বিরলে এস, বিশেষ প্রয়োজন আছে।" বলিয়া সন্ন্যাসী অগ্রে অগ্রে গমন করিলেন, প্রমোদ তাঁহার অনুসরণ করিয়া বিডন উদ্যানের এক নিভৃত প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, আকাশের ক্ষীণ চন্দ্র ক্ষীণালোকে এতক্ষণ পর্য্যন্ত পৃথিবীকে অল্প পরিমাণে উজ্জ্বল করিতেছিল, ক্রমে তাহাও আকাশের কোলে ডুবিয়া গিয়াছে। রজনী অন্ধকার, কিন্তু অসংখ্য খদ্যোতমালা এই অন্ধকারে, বাগানের গাছপাতার মধ্যে নিবিয়া নিবিয়া জ্বলিতেছে, এবং সহরের দীপমালা শ্রেণীবদ্ধ তারকারাজির মত দূরে শোভা পাইতেছে। এই নিস্তব্ধ বিজনে আসিয়া, নিশার গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সন্ন্যাসী মেঘনির্ঘোষবৎ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "প্রমোদ, তোমার এ কি আচরণ?"

সন্ন্যাসীর স্বরে সন্ন্যাসীর কথায় প্রমোদ আশ্চর্য্যভাবে বলিলেন—

"আমার কি আচরণ?"

সন্ন্যাসী অধিকতর গম্ভীর স্বরে অধিকতর ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—

"পাষণ্ড! নরাধম! আমার নীরজা কোথায়?"

"নীরজা কোথায়!" সে কি কথা! তখন বজ্র পড়িলেও প্রমোদ অধিকতর স্তম্ভিত হইতেন না। সন্ন্যাসী অধীরচিত্তে গর্জ্জন করিয়া আবার বলিলেন "আমার নীরজা কোথায়?" প্রমোদ তখন ধীরে ধীরে বিকম্পিতস্বরে প্রতিধ্বনির মত বলিলেন "নীরজা কোথায়!" সন্ন্যাসী আর সহিতে পারিলেন না, এই কথায় তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, বিশাল নয়নে যেন বিজুলি ঝলসিত হইতে লাগিল, সরোষে প্রমোদের কণ্ঠদেশ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া কহিলেন—

"পামর! তুই কি কিছুই জানিসনে? বিশ্বাসঘাতক, আমার নীরজাকে হরণ ক'রে কোথায় রেখেছিস দে, নইলে তোর নিস্তার নেই।" প্রমোদ কষ্টে সন্ন্যাসীর হাত ছাড়াইয়া বলিলেন "মহাশয়, আপনি কি বলছেন? বাস্তবিক কি নীরজাকে তবে কেহ হরণ করেছে? নীরজা—নীরজা অপহৃত?" প্রমোদের আর বাক্য সরিল না, নীরজা অপহৃত হইয়াছে এই কথাটি তাঁহার মনে এতই লাগিল যে, প্রমোদ আর আপনাকে আপনি সামলাইতে পারিলেন না, চারিদিক অন্ধকার দেখিতে দেখিতে নত মস্তকে একটি বৃক্ষ শাখা ধরিয়া দাঁড়াইলেন। সন্ন্যাসীর সন্দেহ ইহাতে আরও বদ্ধমূল হইল; ভাবিলেন—দোষ প্রকাশ পাইয়াছে এই ভয়ে সহসা প্রমোদের মস্তক বিকম্পিত। আগে হইতেই সন্ন্যাসী মনে মনে প্রমোদকে দোষী ভাবিতেছিলেন। মনে মনে তাঁহার বিরুদ্ধে তিনি রাশি রাশি প্রমাণ পাইয়াছিলেন। প্রথমতঃ সেদিন কথাবার্ত্তায় নীরজার প্রতি প্রমোদকে অনুরক্ত বোধ হইয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ প্রমোদের প্রতি নীরজারও অনুরাগ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এমন কি, প্রমোদ চলিয়া যাইবার পরেও নীরজা তাঁহার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রমোদেরই কথা কহিয়াছিল। তারপর সন্ন্যাসীর নৈমিষারণ্যে যাইবার কথা প্রমোদ বই আর কেহই জানিতেন না, প্রমোদই জানিয়াছিলেন সে সময়ে নীরজা একরূপ অরক্ষিতাবস্থায়

থাকে। এই সব যুক্তিপরম্পরা দ্বারা সন্ন্যাসী প্রমোদকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। এখন আবার প্রমোদকে এতদূর অপ্রকৃতিস্থ হইতে দেখিয়া তিনি নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে, উগ্রগম্ভীর দৃঢ়ভাবে বলিলেন "নীরজাকে কোথায় রেখেছ ? ভালয় ভালয় আমার হাতে সমর্পণ কর, আমি সমস্ত দোষ ক্ষমা করব, নইলে—"

প্রমোদ উত্তেজিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন "আপনি বিশ্বাস করবেন না কিন্তু নীরজা-হরণ শুনে আপনার কি আমার কার বেশী লেগেছে জানি না।" এই কথা, এই ভণ্ডামী, সন্ন্যাসীর অসহ্য হইল, তিনি বলিলেন, "আর কেন, যথেষ্ট হয়েছে, এখন নীরজা কোথায় ?"

"মহাশয় বাস্তবিক নীরজা কোথায় আমি জানি না। আমি নিরপরাধ। আপনি ত জানেন যে আপনাদের অরণ্যে শেষ যে দিন যাই, তার পরদিনই আমার এলাহাবাদ যাবার কথা ছিল, আমি পরদিনই কানপুর ছাড়ি, আপনার অরণ্যের সংবাদ সেই থেকে আমি কিছুই জানি না।"

"অরণ্যের সংবাদ না জান্‌তে পার, কিন্তু নীরজা কোথায় ?"

প্রমোদ দেখিলেন, সন্ন্যাসীর সেই অটল সন্দেহ ভঞ্জন করা সহজ নহে। তিনি আপন নির্দোষিতার পক্ষে যতদূর বলিতে পারেন তাহার কিছু ত্রুটি করিলেন না, কিন্তু সন্ন্যাসী সেই অস্বীকার বাক্যে নির্দোষিতার প্রমাণ না পাইয়া বরঞ্চ তাঁহার ঘোর ভণ্ডামীরই প্রমাণ দেখিতে লাগিলেন। কোন উপায় না দেখিয়া প্রমোদ বলিলেন "আমিই যদি নীরজাকে এনে থাকি তাহলে আমার বাড়ীতেই ত রাখব, আপনি বরং আমার বাড়ী খুঁজে দেখুন।"

"সে খবর আমি না নিয়ে তোমার কাছে আসিনি, তোমার এবাড়ীতে তাকে তুমি রাখনি, তা হলে যে শীঘ্র ধরা পড়বে, আর কোথায় লুকিয়ে রেখেছ বল ?"

প্রমোদ ইহার কি উত্তর দিবেন? ক্রোধে, কষ্টে, হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অন্য কেহ হইলে প্রমোদের অপরিসীম ক্রোধ হইত, ক্রোধান্ধ হইয়া কি করিতেন ঠিক নাই, কিন্তু সন্ন্যাসী বলিয়া —নীরজার পিতা বলিয়া, ক্রোধ অপেক্ষা কষ্টের ভাগই অধিক হইল। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া সন্ন্যাসী আবার বলিলেন "আবার বলছি তুমি যদি ভালয় ভালয় তাকে ফিরিয়ে দাও তো আমি তোমার সকল দোষ মার্জ্জনা করব,—"

প্রমোদ আর মৌন হইয়া থাকিতে না পারিয়া ঈষৎ রোষগর্ব্বিতস্বরে বলিলেন "মহাশয় নীরজা কোথায় আমি জানি না, আমি শপথ করে ঈশ্বর সম্মুখে আপনাকে বলছি, এতেও যদি আপনি বিশ্বাস না করেন তো আপনার যা ইচ্ছা—"

সন্ন্যাসী সহিষ্ণুভাবে প্রমোদের বাক্য শেষ পর্য্যন্ত আর শুনিতে পারিলেন না। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—

"চুপ, আর কথা না, তোমার প্রত্যেক কথায় আমার আপাদ মস্তকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটছে, নরাধম! পাষণ্ড! আজ দেখছি এ হস্ত তোর রক্তে প্লাবিত হবে, আজ দেখছি নরহত্যায় এ হস্ত কলুষিত হবে।"

বলিয়া ক্রোধে অজ্ঞানবৎ প্রমোদের দিকে দুই এক পদ অগ্রসর হইলেন, কিন্তু দুই এক পদ চলিয়াই আবার যেন জ্ঞান হইল, তিনি সহসা থমকিয়া দাঁড়াইলেন, একবার সেই সহস্র তারকাপ্রজ্জ্বলিত আকাশের দিকে চাহিয়া একবার আপনার চারিদিকে সেই নিস্তব্ধ প্রকৃতির অন্ধকার মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া—মুহূর্ত্তমাত্র সময় লইয়া সেই নীরব নৈশগগন কাঁপাইয়া প্রমোদকে চমকিত করিয়া বলিলেন—

"না নরাধম, আমি তোর অপবিত্র রক্তে হস্ত কলঙ্কিত করব না, আমি তোকে মারব না, তোকে মারলে নীরজাকে পাবার উপায় নেই,

তুই মরলে নীরজা কোথায় কে বলবে? না, তোকে মারব না, মৃত্যুতে তোর মত লোকের শাস্তি হবে না, তোকে মারলে আমারি কলঙ্ক। আমি বিচারালয়ে তোকে শাস্তি দিব, পৃথিবীর এক সীমা থেকে আর এক সীমা পর্য্যন্ত তোর নাম, তোর দুর্নাম তোর জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা ঘোষণা করব, পৃথিবীর সকলে তোকে দেখবামাত্র সর্পের মত ঘৃণায় স'রে দাঁড়াবে। তোকে মারব না, মারলে তোর পাপের শাস্তি হবে না"—বলিয়া সন্ন্যাসী আর মুহূর্ত্তমাত্র না দাঁড়াইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। নিস্তব্ধ অন্ধকার রজনীকে কাঁপাইয়া, সেই কথাগুলি বজ্রের মত প্রমোদের কর্ণে প্রবেশ করিল। সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন, প্রমোদ অনেকক্ষণ ধরিয়া বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যখন তাঁহার চিন্তা করিবার শক্তি জন্মিল, তখন সন্ন্যাসীর সহিত যত কথা হইয়াছিল, পূর্ব্বাপর ক্রমে মনে পড়িতে লাগিল। কি করিয়া তিনি এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবেন ভাবিতে লাগিলেন। মন এতই চঞ্চল, যে তখনই কাহারও সহিত ঐ বিষয়ে পরামর্শ করিতে ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু এ কথা কাহাকে বলেন? যাহাকে তাহাকে বলা যায় না, বলিতে ইচ্ছাও করে না। তিনি ভাবিতে ভাবিতে যামিনীনাথকে ছাড়া আর পরামর্শ করিবার লোক দেখিলেন না। প্রথমতঃ যামিনীনাথ তাঁহার হৃদয়বন্ধু, দ্বিতীয়তঃ যামিনীনাথও সেই অরণ্যে গিয়াছিলেন, তিনিও নীরজাকে দেখিয়াছেন, তিনি সকলই জানেন, তিনিই এ সম্বন্ধে একমাত্র পরামর্শ দিবার উপযুক্ত পাত্র। প্রমোদ সেই রাত্রেই ব্যাকুলভাবে যামিনীনাথের বাড়ী যাত্রা করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বিস্ময়

যামিনীনাথ ভবানীপুরের এক জন ধনশালী যুবা। তিনি চতুর্ব্বিংশ বর্ষীয়। শরীর কিছু কৃশ, মুখাবয়বও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে, কিন্তু বর্ণ গৌর এবং দেখিতে কুরূপ নহেন। ললাট প্রশস্ত না হউক, নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, চক্ষু আয়ত, কিন্তু দৃষ্টি তত সরল নহে বলিয়া চক্ষুর তেমন সৌন্দর্য্য নাই; নাসিকা সুবঙ্কিম, তাহা কার্য্যতৎপরতার চিহ্ন।

মাতা ও এক বৃদ্ধা জ্যেষ্ঠতাতপত্নী এবং একমাত্র ভগিনী ছাড়া যামিনীনাথের আর কেহ নাই। যামিনীর অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। এই অল্প বয়সে সমস্ত বিভবের অধিপতি হইয়া তাঁহার মস্তক কিছু ঘুরিয়া গিয়াছিল; পিতার মৃত্যুর পরেই তিনি স্কুল ছাড়িয়া দেন। সেই অবধি পুস্তকের সহিত তাঁহার সম্পর্ক রহিত। যেমন হইয়া থাকে, কতকগুলি চাটুকার লইয়া, কতকগুলি সঙ্গী বন্ধুবান্ধব লইয়া তিনি সময় কাটাইতে লাগিলেন। তিনি ন্যায়ান্যায় যে কাজই করুন, চাটুকারগণ তাহাতেই তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে থাকে। যামিনীনাথ যে তাহাদের অন্যায় প্রশংসা বোঝেন না তাহা নহে, তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান, কিন্তু বুঝিয়াও তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হন না। যামিনীর হাত বিলক্ষণ দরাজ। প্রশংসা পাইবার নিমিত্ত চাটুকারদিগকে তুষ্ট করিতে, মানের জন্য বন্ধুদের কথা রাখিতে, নাম কিনিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে দান করিতে, তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। একে পিতার অনেক ধন, তাহাতে যামিনীর জ্যেষ্ঠতাতপত্নী আপন পিতার যে পাঁচলক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন, যামিনীনাথ সে টাকারও ভাবী অধিপতি হইবেন আশা ছিল, কেন না জ্যেষ্ঠতাত-

পত্নীর আর কেহই ছিল না। সুতরাং ব্যয় করিতে প্রথম প্রথম তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু এই রূপে দুই চারি বৎসরেই তিনি যখন পিতৃসঞ্চিত ধনের অর্দ্ধেক খোয়াইয়া ফেলিলেন তখন তাঁহার চেতনা হইল। তিনি দরাজ হাত ক্রমে গুটাইয়া আনিলেন, দানের মাত্রা সকলই প্রায় কমাইয়া ফেলিলেন। এখন তিনি সুবিধা পাইলে নিজেই কোন বন্ধুর ঘাড় ভাঙ্গিতে পারিলে ছাড়িতেন না।

তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে, পিতার মৃত্যুর আগে যখন যামিনীনাথ কলেজে পড়িতেন তখন প্রমোদের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। তাহার পর কলেজ ছাড়িয়াও যামিনী প্রমোদকে সর্ব্বদা নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ করিতেন, সর্ব্বদাই প্রমোদের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন। আসল কথা প্রমোদ, ধনবান তারাকান্তের বিষয়ের ভবিষ্য-মালিক, সুতরাং এখন হইতেই যামিনীনাথ তাঁহাকে আপন দলে টানিবার অভিপ্রায়ে ছিলেন। পরস্পর নানা মতের বিভিন্নতা সত্ত্বেও ক্রমে এইরূপে যামিনীর সহিত প্রমোদের বিশেষ বন্ধুতা জন্মিল; কিন্তু নীরজা যামিনীনাথের সহিত তাঁহার বাড়ী আসা অবধি আর প্রমোদের সহিত যামিনীর দেখা শুনা হয় নাই। সেই অবধি আর প্রমোদকে নিমন্ত্রণ করা বা প্রমোদের বাড়ী যাওয়া যামিনীর ঘটিয়া উঠে নাই। প্রমোদও অবকাশ অভাবে এখানে আসিতে পারেন নাই। আজ প্রমোদ এখানে আসিয়া শুনিলেন—যামিনীনাথ বাড়ী নাই, কিন্তু শীঘ্রই ফিরিবেন শুনিয়া তাহার বৈঠকখানা গৃহে আসিয়া বসিলেন।

যামিনীনাথের একটু বিশেষরূপে পরিচয় দিবার নিমিত্ত এই স্থলে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। যামিনীনাথ বিদেশীয় রীতিনীতি ও আচারব্যবহারের বড় বিদ্বেষী; ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্ এ সকলের প্রতি তাঁহার দারুণ ঘৃণা। এমন কি বিদেশীয় ভাষা আর শিখিবেন না বলিয়াই তিনি স্কুল ত্যাগ করেন। কিন্তু যে ঘরটিতে

প্রমোদ আসিয়া বলিলেন সেটি সম্পূর্ণ ইংরাজি প্রথায় সজ্জিত। মধ্যে টেবিল, চতুঃপার্শ্বে কৌচ চৌকি, তাহাতেই সর্ব্বদা যামিনী বন্ধুবান্ধব লইয়া বসিতেন। বোধ করি নীচের বিছানায় বসিতে পৃষ্ঠ-বেদনা করিত সেই হেতু সুবিধার অনুরোধে স্বদেশানুরাগী যামিনীনাথের অগত্যা বিদেশীয় অনুকরণ করিতে হইয়াছিল।

গৃহের একটি প্রান্তে একটি লম্বা শ্বেত প্রস্তরের টেবিল, তাহার মধ্যস্থলে একটি ফুলদানি, ফুলদানির দুই পার্শ্বে দুই খানি অ্যালবম্। সময় কাটাইবার অভিপ্রায়ে প্রমোদ সেই টেবিলের নিকট একখানি চৌকিতে বসিয়া অ্যালবম্ খুলিয়া ছবি দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন তাহাতে য়ুরোপের সমস্ত রাজা রাণীর এবং সে দেশীয় প্রসিদ্ধা সুন্দরীগণের ছবি রহিয়াছে। ফ্রান্সের রাজ্ঞী ইয়ুজিনী ইংলণ্ডের যুবরাজপত্নী এবং মিশেশ ল্যাংট্রি প্রভৃতি যাঁহারা সুন্দরী বলিয়া প্রসিদ্ধ, প্রমোদ চিত্র দেখিয়া মনে মনে তাঁহাদের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মুখের প্রত্যেক অবয়বগুলি বিশেষ মনোযোগ দিয়া দেখিলেন তাহাতে কিছুই নিন্দনীয় নাই, দেখিলেন নাসিকা চক্ষু সকলি বাস্তবিক সুগঠন। কিন্তু তবে? তবে একটির মাত্র অভাব। যে একটি সুন্দর ভাব থাকিলে সমস্ত মুখটিতে সৌন্দর্য্য আপ্লুত করে, সেই ভাবটির তবুও যেন অভাব। যে ভাবটি দেখিবামাত্র শরীর রোমাঞ্চিত হয়, হৃদয়ে সহসা একটি স্বপ্নময় আনন্দ জন্মে, কই সে ভাবটি এ সকল চিত্রে কই? একটি মাত্র জীবন্ত প্রতিমাতে তিনি যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন সে সৌন্দর্য্য তিনি য়ুরোপের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সুন্দরীতেও দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু প্রমোদের মনের কথা প্রমোদ মনে মনেই চাপিয়া রাইলেন। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সভ্যতম দেশের প্রসিদ্ধ সুন্দরী বলিয়া যাঁহারা বিখ্যাত, প্রমোদ কেমন করিয়া আজ স্পষ্ট করিয়া বলেন, তিনি

তাঁহাদের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে অক্ষম ; সে কথা শুনিলে কে না হাসিবে, তাঁহাকে রুচি-হীন বলিয়া কে না তাঁহাকে রুচির উৎকর্ষ সাধনে পরামর্শ দিবে ? অন্যের কথা দূরে থাকুক, সেই সকল চিত্রের সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায় নিজেই লজ্জিত হইয়া সে অ্যালবমখানি বন্ধ করিয়া অন্যখানি খুলিলেন। খুলিয়া প্রথমেই সুপ্রসিদ্ধ সুন্দরী স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরীর ছবি পাইলেন। যে রূপে কত রাজ্যবিপ্লব ঘটিয়াছিল, যে রূপের প্রশংসায় আজও পর্য্যন্ত দিক আমোদিত, সেই রূপের মোহিনী শক্তি তাঁহার মুখের কোন স্থলে বিদ্যমান তাহা প্রমোদ মনোযোগপূর্ব্বক দেখিতে লাগিলেন। সহসা আর দেখা হইল না, বীণাধ্বনিবৎ সহসা তাঁহার কর্ণে এই কথাটি বাজিয়া উঠিল "যামিনী বাবু!" সে স্বর প্রমোদ চিনিতে পারিলেন, সে স্বরে প্রমোদ রোমাঞ্চিত কায়ে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন তাঁহার পশ্চাতে নীরজা। সাধকের আকাঙ্ক্ষিত বর পাইলেও যত আনন্দ না হয়, নীরজাকে দেখিয়া প্রমোদের তাহা হইল। প্রমোদের মুখ দেখিতে না পাইয়া যামিনী বোধে নীরজা ডাকিয়াছিল। সহসা প্রমোদকে দেখিয়া তাহার মুখেও আনন্দ বিভাসিত হইল। সেই বৃহৎ কক্ষে, দুই প্রান্তে দুইজনে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, উভয়ের নয়নে নয়নে স্থির দৃষ্টি সংলগ্ন হইল, উভয়ে মনেমনে মন হারাইয়া চাহিয়া রহিলেন। কিছু পরে নীরজা বলিয়া উঠিল "একি, আপনি এখানে ?" প্রমোদ এক সময়েই প্রায় বলিয়া উঠিলেন "আপনি এখানে ?" হঠাৎ বিস্ময় ও আনন্দজনিত মনের বিশৃঙ্খল ভাব শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইয়া কিছু পরে নীরজা তাহার দুঃখের কাহিনী আনুপূর্ব্বিক বলিল ; শুনিয়া প্রমোদ সন্ন্যাসীর কথা বুঝিতে পারিলেন। প্রমোদ মনে মনে বলিলেন "আমি কেন যামিনীর মত সৌভাগ্যবান হলেম না, আমি কেন ইহাকে উদ্ধার করতে পাল্লেম না।" এই ভাবের আধিক্য বশতঃ প্রমোদের

কথা বন্ধ হইয়া গেল, ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল, নিজের নিশ্বাস শব্দে নিজেই চমকিয়া উঠিয়া প্রমোদ বলিলেন "কিছু আগে যদি এসব জানতেম! কিছু আগে যদি যামিনীর সঙ্গে দেখা হত, তা হলেই আজ—"

এই সময় যামিনীনাথ তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, প্রমোদের আর কিছু বলা হইল না। প্রমোদ ও নীরজাকে একত্রে দেখিয়া যামিনীনাথ বিস্মিত হইয়া ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে তাহাকে বলিলেন "একি, তুমি এখানে?" নীরজা বলিল "বাবার শেষ চিঠির উত্তর এল কি না জানবার জন্য বড়ই উৎসুক হয়েছি।" সমস্ত দিন আপনার জন্যে অপেক্ষা ক'রে ক'রে শেষে আপনাকে এইখানে খুঁজতে এলুম।" যামিনী একটু বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন "বাইরে কখন কে আসে, এখানে আসবার কি আবশ্যক? আমি চিঠি পেলেই তো তোমাকে বলতে যেতুম।"

এই কথায় নীরজাও একটু বিরক্ত হইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দেশানুরাগ

নীরজা চলিয়া গেল, সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার কথা আর তাহাকে প্রমোদের বলা হইল না। যামিনীনাথকে বলিলেন, "ভাই, অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা করিতে পারি নি। আজ অসময়ে দেখে আশ্চর্য্য হয়ো না, বড় বিপদে পড়ে পরামর্শ নিতে এসেছি।"

যামিনী ব্যগ্রতা দেখাইয়া বলিলেন, "কি কি, বিপদটা কি?"

প্র। আজ হঠাৎ নীরজার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ।

যামিনী। নীরজার পিতা! তিনি এখানে এসেছেন?

প্র। হ্যাঁ, কিন্তু নীরজা এখানে তাত আমি জানতেম না, তাতে বড়ই ক্ষতি হয়েছে।

নীরজাকে প্রমোদ দেখিতে পাইয়াছেন দেখিয়া যামিনীনাথ হাসিয়া এই কথার মধ্যে বলিলেন, "দেখ ভাই প্রমোদ, নীরজাকে নিয়ে মহা ব্যাপার হয়েছিল, সে অনেক কথা। সে সব তোমাকে বলবার জন্যে আমি খুবই ব্যগ্র হ'য়ে আছি। কবে এলাহাবাদ থেকে এসেছ সে খবরটাও কি দিতে নেই?"

প্র। কেমন ঘটে ওঠে নি, অন্যায় হয়েছে স্বীকার করি। আমি নীরজার মুখে সে সব ব্যাপার এই মাত্র সবিশেষ শুনলেম, কি ভয়ানক! যামিনি, তুমি না বাঁচালে নীরজার কি দুর্দ্দশা হোত মনে করতেও—"

যা। এখন ভালয় ভালয় তার বাপের হাতে তাকে দিতে পারলে হয়। এখানে যে সন্ন্যাসী এসেছেন ভালই হয়েছে। আমি যে কত চিঠিই তাঁকে লিখেছি ঠিক নেই, কাজে ব্যস্ত না থাকলে, নিজে গিয়ে এতদিন নীরজাকে কানপুরে রেখে পর্য্যন্ত আসতেম। যাক, তার পর সন্ন্যাসী তোমাকে কি বল্লেন?"

প্রমোদের সহিত সন্ন্যাসীর যে কথা হইয়াছিল প্রমোদ সংক্ষেপে সে সকল বলিয়া কহিলেন "সন্ন্যাসী আমাকে কোন মতে বিশ্বাস করিলেন না, আমার মনে হচ্ছে দস্যুদের বৃত্তান্ত শুনলেও আমাকেই দোষী ভাববেন।"—

যামিনীনাথ হাসিয়া বলিলেন "তুমি নির্দ্দোষী, তোমার ভয় কি, আমি আছি, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

প্রমোদ বলিলেন "সন্ন্যাসী যদি নালিস করেন বিচারে যে আমি নির্দ্দোষ হব সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই, সেজন্য ভাবি না। কিন্তু

বিচারে নির্দোষ হলেও পাছে সন্ন্যাসীর চক্ষে অপরাধী থাকি, আমার ভাবনা কেবল তাই। যা হ'ক সেত পরের কথা—নীরজা যে এখানে—এ খবর এখন তাঁকে কি করে দেওয়া যায়, তিনি কোথায় থাকেন তাত কিছুই জানি না।"

যা। "তোমার কিছুমাত্র ভাবনা নেই, সন্ন্যাসী যখন এখানে এসেছেন আমি সন্ধান করে তাঁকে বার করব এখন।"

প্র। "কিন্তু—"

প্রমোদকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই যামিনী আবার বলিলেন "না না এর ভিতর "কিন্তু" কিছুই নেই। কি আশ্চর্য্য, কি ছেলেমানুষ! আজ কতদিন পরে দেখা, কোথায় আমরা একটু আমোদ প্রমোদ, গল্প স্বল্প করব, না তোমার ভাই এইসব মিথ্যা ভাবনা!

প্র। কে জানে, ভাই আমার মন থেকে এ ভাবনাটা কোন মতেই যাচ্চে না।"

যা। "না, ভাই, তা হবে না আমোদ প্রমোদে তোমার আজ ও মিথ্যা ভাবনা তাড়াতেই হবে, চল আজ থিয়েটারে যাওয়া যাক। আজ থিয়েটারে পদ্মাবতী অভিনয় হবে জান?"

প্রমোদ প্রথমে অনেক ওজর-আপত্তি করিয়া শেষে বলিলেন "এত রাত্রে থিয়েটারে যাব? সে যে অনেক দূর?"

যা। "না, না, এই ভবানীপুরেই আজ একটা থিয়েটার করছে, চল যাওয়া যাক, সেতো কাছেই। তুমি অবশ্য খেয়ে আসনি, এইখানেই এস এক সঙ্গে খাই।"

প্রমোদ অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন "আমি খেয়ে এসেছি।" যামিনী তখন বলিলেন "তবে আমি খেয়ে আসি, তুমি বস, এসে একত্রে থিয়েটারে যাব।"

প্রমোদের থিয়েটারে যাইতে বড় একটা ইচ্ছা ছিল না, প্রথমতঃ

তাঁহার এখন থিয়েটারে যাইবার মতন মনের অবস্থাই নহে, তাহার পর আবার কয়েক মাস পূর্ব্বে যামিনীর সহিত থিয়েটার সার্কাস ইত্যাদি দেখিতে গিয়া তিনি একরূপ রিক্তহস্ত,—সেই জন্য তিনি প্রথমে দুই একবার ওজর করিলেন, কিন্তু যামিনী যখন তবুও তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া জোর করিয়া বলিলেন "তা কি হয়, চল যাওয়া যাক্, আমি শীঘ্রই খেয়ে আসছি"—

তখন আর প্রমোদ তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। যামিনী খাইয়া আসিবার পর তাঁহারা দু'জনে থিয়েটার দেখিতে চলিলেন।

যামিনীর মাথার তখন বড় একটা ঠিক ছিল না, বাড়ী হইতে দুই এক পাত্র তরল উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া আসিয়াছিলেন। থিয়েটার গৃহে প্রবেশ করিবার সময় একজন কনেষ্টবলের গাত্রে গাত্র ঠেকায় তিনি অপমান বোধ করিয়া নিরপরাধ কনেষ্টবলকে এক ঘুসি বসাইয়া দিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যামিনীনাথ বড় দেশানুরাগী। ভালই হৌক মন্দই হৌক বিদেশীয় অনুকরণের নামমাত্রেই জ্বলিয়া উঠেন, অথচ সুবিধার অনুরোধে ইংরাজী প্রথায় গৃহ সাজাইতে, বিলাসের অনুরোধে ইংরাজী বুট ট্রাউজারস্ ও কোট পরিতে এবং সভ্যতার অনুরোধে হাতের পরিবর্ত্তে কাঁটা চামচ ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন না। বন্ধুদের অনুরোধে বিলাতী মদ্যের প্রতিও তাঁহার ঘৃণা ছাড়িতে হইয়াছিল।

বিদেশীয় অনুকরণের প্রতি তাঁহার যেমন ঘৃণা, ভারতগৌরব-লোপকারী বিদেশীয়গণের প্রতিও তাঁহার তেমনি জাতক্রোধ; ভারতের অস্তমিত গৌরবদিন ফিরাইবার জন্য তিনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন, এমন কি অনেক সময় স্কুলের ছাত্রদিগকে সমবেত করিয়া আর্য্যগরিমার পুনরুদ্দীপন

বিষয়ে বক্তৃতাও দিতেন, গভর্ণমেণ্টকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া তিনি তাহাদের গালি দিয়া সংবাদপত্রে কয়েকবার লিখিয়াও ছিলেন, কিন্তু সেই গালি পড়িলে সহসা অনেকেরই তাহা প্রশংসা বলিয়া ভ্রম হইত। যাহা হউক, স্কুলের ছাত্রগণের প্রায় সকলেরই তাঁহার প্রতি অটল ভক্তি, দেশানুরাগী বলিয়া অনেকেরই নিকট তাহার বিলক্ষণ মান। প্রমোদও যামিনীকে বড় ভাল লোক বলিয়া মনে করিতেন। প্রমোদের মদে ঘৃণা ছিল, সুতরাং তাঁহার সাক্ষাতে পারতপক্ষে তিনি মদ খাইতেন না। যখন বা খাইতেন, তখন এমনি ভাণ করিতেন যেন নিতান্ত দায়ে পড়িয়া বন্ধুদের অনুরোধে কিম্বা শরীরের অনুরোধে তাহা খাইতে হইতেছে। যাহা হৌক, আজ দেশানুরাগের আতিশয্য বশতঃ যবনগাত্রে গাত্র স্পর্শ হইবামাত্র তাঁহার দেশানুরাগ দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল, সেই দুরাচার যবনদিগের কথা স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে তাঁহার আর্য্যরক্ত ফেনিত হইয়া উঠিল, তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। তাহাকে মারিয়া আজ মরিতে হয় সেও স্বীকার, আজ তাহাকে মারিয়া, ভারতবর্ষের শত সহস্র লোককে দৃষ্টান্ত দেখাইবেন, ভারতের পূর্ব্বদিন আজ তিনিই ফিরাইয়া আনিবেন মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তাহাকে এক ঘুসী বসাইয়া দিলেন। কনেষ্টবলটিও ছাড়িয়া কথা কহিল না, যামিনীনাথের ঘুসী শুদসুদ্ধ ফিরাইয়া দিল। ক্রমে সেই কোলাহলে সেখানে লোক জমিতে লাগিল, প্রমোদ একটু অগ্রসর হইয়া থিয়েটার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন গোল শুনিয়া তিনিও বাহিরে আসিয়া বন্ধুর দুর্দ্দশা দেখিয়া, সক্রোধে কনষ্টেবলের উপর পড়িলেন। মার খাইয়া যামিনীরও নেশা ছুটিয়াছিল, এখন সাহায্য পাইয়া তিনিও ছাড়িলেন না, বিস্তর ইংরাজী কথা বলিতে বলিতে কনষ্টেবলকে বিশিষ্ট রূপে আহত করিয়া দুই বন্ধুতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। কনষ্টেবল তাঁহাদের চিহ্নিত, পর দিন সে তাঁহাদের নামে নালিস করিল। নালিস শুনিয়া প্রমোদ বড় একটা দমিয়া গেলেন না, কেবল কনষ্টেবলের উপর

আরও একটু বেশী মাত্রায় চটিলেন। ভাবিলেন, সে নালিস না করিয়া যদি পুরস্কার প্রার্থনা করিত তো তাহার পক্ষেই ভাল হইত, কিছু পাইয়া যাইত, নালিস করিয়া আর একবার মার খাইবার সূত্রপাত করিল মাত্র। প্রমোদের কেবল একটি বিষয়ে একটু মুস্কিল লাগিল। মোকদ্দমাতে তো উকিল ব্যারিষ্টার দিতে হইবে, এবং তা ছাড়া অন্যান্য খরচও তো আছে, কিম্বা যদি কি জানি মন্দটাই হয়, যদি দশ বিশ টাকা দণ্ডই লাগে, আগে হইতে ত এ সকল ব্যয়ের যোগাড় করা চাই। অর্থাভাবই তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। অন্ততঃ দুই শত টাকা এজন্য হাতে রাখা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। কিন্তু অত টাকা প্রমোদ কোথায় পান? কনকের কাছে অগত্যা তাহা চাহিয়া পাঠাইলেন। যামিনীর নিকট ধার চাহিতে তিনি লজ্জায় কোন মতে পারিয়া উঠিলেন না। আর ধার করিলেও তো তাহা শীঘ্র শোধ করিতে হইবে। এ বিপদে কনক ছাড়া আর কে তাঁহাকে রক্ষা করে!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

স্নেহের পুরস্কার

কলিকাতা আসিয়া অবধি প্রমোদ মাঝে মাঝে কনকের নিকট দশ বিশ টাকা চাহিয়া পাঠাইতেন। যামিনীনাথ তাঁহাকে যেরূপ পাইয়া বসিয়াছিলেন তাহাতে সুশীলার নিকট হইতে প্রমোদ কলিকাতায় থাকিবার যে খরচ পাইতেন সে অর্থে তাঁহার ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া উঠিত না। ধনশালী বলিয়া প্রমোদের খ্যাতি আছে, সুতরাং তাঁহার ঘাড় ভাঙ্গিবার ইচ্ছায় যামিনীনাথ—আজ থিয়েটারে চল, আজ

হোটেলে খানা দেও, আজ সারকস দেখিয়া আসি—এইরূপ ধরিয়া পড়িতেন, প্রমোদেরও ধনশালী বলিয়া মনে মনে একটু অহঙ্কার আছে, তিনিও সহজে সে নামটি খোয়াইতে চাহিতেন না। পরে আবশ্যকীয় খরচের জন্য কনকের কাছে টাকা না চাহিলে চলিত না; সুশীলার নিকট চাহিবার যো নাই; সুশীলার বিশ্বাস বেশী টাকা হাতে পাইলেই ছেলেদের স্বভাব বিগড়িয়া যায়, তাঁহার নিকট চাহিলে টাকা পাওয়া দূরে থাকুক বরঞ্চ তাঁহার ক্রোধ ও বিরক্তিভাজন হইবেন, প্রমোদের স্বভাবের প্রতি তাঁহার সন্দেহ হইবে। কি করেন, প্রমোদ দরকার হইলেই চুপে চুপে অগত্যা কনককে পত্র লিখিতেন, কনক কষ্টে স্বষ্টে যে কোন প্রকারেই হউক প্রমোদকে টাকা পাঠাইত। টাকার যোগাড় করিতে কনকের যে কিরূপ মাথা কুটাকুটি করিতে হইত, জানিলে হয় তো প্রমোদেরও মায়া হইত, অথবা খরচ বিষয়ে হয় তো তিনিও সাবধান হইতেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত কনক কখনও সে কষ্টের কথা প্রমোদকে বলে নাই। কনক মাসে মাসে যে ১৫ টাকা করিয়া সুশীলার নিকট হইতে জলপানী পাইত, তাহা সে ভ্রাতাকে দিত তাহা ছাড়া রাত্রি জাগিয়া সেলাই করিত এবং গোপনে তাহা বিক্রয় করিয়া টাকাগুলি ভ্রাতাকে পাঠাইত।

বিশ, পঁচিশ টাকা বলিয়া যেন কনক কষ্টে স্বষ্টে ভাইকে মাঝে মাঝে তাহা যোগাইত, কিন্তু এবার যে প্রমোদ হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া একেবারে ২০০ শত টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন, ইহা এখন কনক কোথা হইতে কেমন করিয়া দিবে? অথচ না দিলেই নয়, প্রমোদ লিখিয়াছেন টাকা না পাইলে তাঁহাকে জেলেও যাইতে হইতে পারে। কি ভয়ানক! বালিকা তো ভাবিয়া আকুল। সুশীলার নিকটেও টাকা চাহিবার যো নাই, তাহা আবার প্রমোদের নিষেধ। প্রমোদ জানিতেন কনকের কাছে টাকা চাহিলেই পাইবেন, এমন স্থলে

আপনার মার-পিঠ এবং সেই হেতু মকদ্দমা হাঙ্গামার কথা যদি সুশীলাকে না জানাইয়াই চলিয়া যায় তবে আর জানাইবেন কেন? কনক যে কত কষ্ট করিয়া টাকা পাঠায় তাহা প্রমোদ জানিতেন না। টাকা চাহিলেই তিনি পান, তিনি কেবল এই মাত্র জানেন। তাহা যে কনক কোথা হইতে কেমন করিয়া কত কষ্টে জোগায় প্রমোদের তাহা ভাবিবার দরকার বোধ হইত না। তবে এক একবার কখনও দৈবাৎ যদি এ কথাটি মনে আসিত, যখন মনে হইত বিনা কষ্টে কনকের টাকা পাঠাইবার সম্ভাবনা নাই, তখন প্রমোদ মনে করিতেন ভবিষ্যতে তিনি আর টাকা চাহিবেন না, এবার হইতে মিতব্যয়ী হইবেন। কিন্তু পরেই আবার সে কথা ভুলিয়া যাইতেন। অন্যবারের ন্যায় এবারেও প্রমোদ চাহিবার সময় ভাবিলেন এবার ছাড়া আর কখনও তিনি কনকের নিকট টাকা চাহিবেন না।

এ দিকে বালিকা কনকের আর দুঃখের সীমা নাই। কি উপায়ে সে এবার ভ্রাতাকে রক্ষা করিবে?

রাত্রি দ্বিপ্রহর, নিস্তব্ধ অন্ধকারময় পৃথিবী খদ্যোতিকামালায় রঞ্জিত, আর উপরে নীল অনন্ত আকাশ তারকামালায় খচিত। সেই তারাখচিত আকাশের দিকে চাহিয়া বালিকা কনক কাঁদিতেছিল। তাহার দুঃখ সেই জানে, সে দুঃখ কাহারও কাছে বলিবার নহে! কাহারও কাছে মনের দুঃখ প্রকাশ করিতে না পারিয়া বালিকা নির্ব্বাক্ তারাদলের নিকট হৃদয় খুলিয়া কাঁদিতেছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বালিকা উঠিল, আবার গৃহে প্রবেশ করিল, একটী দীপের নিকট আসিয়া হস্তস্থিত একখানি পত্র লইয়া আবার পড়িতে লাগিল—

"ভাই কনক,"

"অতিশয় বিপদে পড়িয়াছি, তুমি বই আমার আর উপায় নাই।

২০০ শত টাকা চিঠি পাইবামাত্র নিশ্চই পাঠাইবে, তা না হইলে হয় তো জেলে যাইতে হইবে। কনক, এইবার ভাই, আর একবার স্নেহময়ী ভগিনীর কাজ কর।

এইবার শেষবার, আর তোমাকে এরূপ অনুরোধ করিব না। আর সকল কথা পরে লিখিব।

তোমার স্নেহময় দাদা

প্রমোদ।

পুঃ

দেখ ভাই, মাকে এ সকল কথা কিছু বলিও না।

প্রমোদ।”

কনক কতবার চিঠিখানি পড়িল, কতবার অশ্রুজল মুছিল। কি উপায়ে ২০০ শত টাকা সে প্রমোদকে পাঠাইতে পারে, কি করিয়া প্রমোদকে বাঁচাইবে, তাহার কতই উপায় খুঁজিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল, নিরুপায় বালিকা অতি প্রত্যূষে উঠিয়াই গোপনে স্বহস্তনির্ম্মিত সেলাইগুলি, এবং আপনার রেশমী ও জরীর দামি সাড়ি কয়েকখানি ও আংটি একটি লইয়া, বামা দাসীকে উঠাইয়া গোপনে সেই গুলি বিক্রয়ের জন্য দিল। বামা তাহাদের দুই ভাই বোনকে মানুষ করিয়াছে;—তাহাদের খুব অনুরক্ত ও বিশ্বাসী।

কিন্তু বিক্রয় কবে হইবে? মনে করিলেই কিছু বিক্রয় হয় না, এদিকে আজই টাকা না পাইলে নয়। বালিকা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িল। দাসীর উপর একান্ত ভরসা রাখিয়া তাহার প্রত্যাগমন প্রত্যাশায় পথ চাহিয়া রহিল।—দাসী ভোরে বাহির হইয়াছিল দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিয়া ৫০টি টাকা তাহাকে আনিয়া দিল, এবং সেই সঙ্গে দুইখানি বারাণসী সাড়ী ও আংটিটী ফেরত দিয়া বলিল—“এগুলোর ত কিছু করতে নারনু; সেই বোম্বাই সাড়ী

আর সেলাইগুলোই উঠলো। অত দামের আংটিটী—বলে কি না পঞ্চাশে দাও ত বাঁধা রাখি। তাও আজ টাকা দেবে না,—বলে রেখে যা, যাচাই করে নেব। কাপড় দুখানা তুমি বল্লে ১৫০ টাকা দাম—তারা কেউ ৫০এর বেশী দিতে চায় না। তাই রাগ কোরে ফেরত আনুনু। এত তাড়াতাড়ি কি কিছু দর পাওয়া যায় গা।”

কনক একেবারে যেন বসিয়া পড়িল। এখনো দেড় শত টাকার অনাটন! কিরূপে আজই ইহার জোগাড় করে। হাতের বালা ছাড়া তাহার অন্যান্য যথা সর্ব্বস্ব দামী সম্পত্তি সে টাকা সংগ্রহের জন্য দিয়াছিল! —এখন এই দুগাছি বাঁধা দেওয়া ছাড়া উপায়ান্তর দেখিল না। অথচ তাহাতে কিরূপ বিপদ তাহাও বুঝিল। সুশীলা জানিলে রক্ষা রাখিবেন না। তাহার পুরাতন বালা ছোট হওয়াতে সবে মাত্র দুই দিন হইল এই নূতন বালা সুশীলা তাহাকে পরিতে দিয়াছেন, এখনো ইহার দাম পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। কিন্তু কি করিবে,—আজই দুই শত টাকা না পাঠাইলে প্রমোদের জেলে যাইতে হইবে! এখন অন্য বিপদ ভাবিবার সময় কোথা? সে হাতের বালা খুলিয়া দাসীকে দিয়া বলিল—“তুই এই দুগাছি নিয়ে যা, বাঁধা রেখে ১৫০ টাকা নিয়ে আয়, জানিসত দাদা বাবু চেয়েছেন—আজ না পাঠালেই নয়।—”

দাসী। কিন্তু মাঠাকরুণ হাত খালি দেখলে যে রাগ করবেন্ গা, তখন কি হবে? দাদা বাবু কি আর মায়ের কাছে চাইতে নারলে!

কনক। মা কি দিতেন—কেবল বকতেন। যাহ’ক তুই যেন মাকে বলিস্‌নে, দাদার কাছ থেকে আমি তোকে বক্‌সিস চেয়ে দেব, যা তুই এখন বালা জোড়া নিয়ে যা—শীঘ্র টাকাটা এনে দে।” প্রমোদ ত দাসীকে বলিতে বারণ করেন নাই,—আর দাসীকে না বলিয়াই বা তাহার উপায় কি? কি করিয়া নহিলে আজই টাকার জোগাড় করে।—

দাসী বলিল "আমার কিন্তু খুব ভয় নাগছে—মাঠাকরুণ জানলে রক্ষে রাখবেন্ না।"

কনক। মা টের পাবেন না,—আমাকে জরির চুড়ি এক জোড়া এনে দিস, পরব এখন,—আর লম্বা জামায় হাত ঢাকা থাকলে অত তাঁর নজরে পড়বে না। তার পর তুই বেনারসী শাড়ি দুখানা বিক্রি করে আর আংটিটা বাঁধা দিয়ে কি আর ১৫০ টাকা আন্‌তে পারবিনে? দু এক দিনের মধ্যেই বালা জোড়া তাহলে খালাস করে আনা যাবে।"

বলিয়া—দেরাজ হইতে তাহার অবশিষ্ট সম্বল দুইটি টাকা মাত্র বাহির করিয়া দাসীর হাতে দিয়া বলিল "চার আনা দিয়ে এক জোড়া জরির চুড়ি আনিস্—বাকিটা তুই নিস্—আবার মাসকাবারি পেলে তোকে কিছু দেব।"

দাসী তখন বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গেল।

কিন্তু দৈব কনকের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিল। পরদিন বালা বিক্রিওয়ালী নূতন বালার দাম লইতে আসিল। বালা জোড়া ঠিক নূতন নহে—একজন মহিলা অল্পদিন পরিয়া অর্থের আবশ্যকতাবশতঃ দাসী দ্বারা বিক্রয় করিতে পাঠাইয়াছেন। সুশীলা পুরাতন বলিয়া বানি দিতে অস্বীকৃত, তাই দর দাম চলিতেছিল। সে দিন এই লইয়া দুই এক কথায় দাসীর সহিত একটু বচসা হইল, সে বলিল "তবে বালা ফেরত দাও।" সুশীলাও রাগ করিয়া বলিলেন—"যদি বানিই দেব—তাহলে পুরাণ বালা নেব কেন—গড়াতে কি আর পারি নে"।

কনককে ডাক পড়িল,—কনক আসিলে সুশীলা বলিলেন—"দরে বনছে না—বালা দুগাছা ফেরত দিতে হবে, খুলে দাও—আমি সেকরা ডেকে নতুন বালা গড়াতে দেব এখন"।

কনকের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল, সে নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুশীলা বলিলেন—"চুপ করে রইলে যে অমন করে? কেন

কি হয়েছে।” বলিয়া সন্দিগ্ধ চিত্তে নিকটে আসিয়া হাত ধরিয়া দেখিলেন—হাত শূন্য। সক্রোধে বলিলেন “বালা কি হোল! বুঝি খুলে রেখেছিলে, হারিয়ে গেছে?” বালিকাকে স্তম্ভিত নিরুত্তর দেখিয়া বুঝিলেন—যাহা ভাবিয়াছেন তাহাই ঠিক। তখন কনকের উপর রাগ করিয়া তাহাকে বকা বৃথা বাক্যব্যয়, তিনি তৎক্ষণাৎ নীচে আসিয়া সরকার দ্বারবানদিগকে ডাকাইয়া চুরি বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া বলিলেন—“সন্ধান কর কে নিয়েছে,—যদি পাওয়া যায় ভাল, নইলে সকলকেই পুলিসে দিতে হ’বে।”

বাড়ীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সরকারবাবু প্রত্যেক দাসদাসীকে স্বতন্ত্র ডাকাইয়া নানারূপ প্রলোভন দ্বারা গুপ্ত কথা আদায়ে যত্নবান হইলেন—আর তাঁহার কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবা মাত্র জমাদার শোভারাম পাঁড়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া লাঠির আস্ফালনে ও ক্রুদ্ধ ভাষায় শাস্তির ভয় প্রদর্শনে বেচারাদিগকে বাগ মানাইবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। অবশেষে উভয়ের সম্মিলিত ছলে বলে কৌশলে,—তন্ত্রমন্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তি অনুসারে একজন গোবেচারা ভৃত্য দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তাহার কথা বাধিয়া গিয়াছে, সে নানা রূপ বেফাঁস কথা কহিয়াছে—অধিকন্তু সে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভয় পাইয়াছে, মুখটি শুকাইয়া তাহার আত্মচূর্ণ হইয়া গিয়াছে,—আর অধিক প্রমাণের আবশ্যক কি! তাহাকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করা সঙ্গত বিবেচনায় পুলিসে চুরির খবর পাঠান হইল।

এদিকে ভীত, সশঙ্কিত, আত্মহারা কনক—আর নীরবে থাকিতে পারিল না। তাহার জন্য একজন নির্দ্দোষীর শাস্তি হইতে চলিয়াছে,—সে সুশীলার নিকট আসিয়া সাশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিল—“রাম চুরি করে নি, বালা আছে।”

সুশীলা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—“বালা আছে? কোথায়?”

"বাঁধা দিয়েছি"।

"বাঁধা দিয়েছ? আর এই সব নিরীহ চাকরদের উপর জুলুম দেখেও তুমি এতক্ষণ চুপ করে ছিলে? কি ভয়ানক! তোমার অত টাকার দরকার কিসের? বাঁধা দিয়েছ কেন?"

"আমি মনে করেছিলুম দু-একদিনের মধ্যেই বালাটা খালাস করব।"

কিন্তু তোমার অত টাকার দরকার কি? তুমি যে মাসকাবারি পাও তাইত তোমার খরচের জন্য যথেষ্ট।"

কনক ইহার কি উত্তর দিবে? মিথ্যা কথা বলা তাহার অভ্যাস নাই,—নহিলে একবার চেষ্টাও করিতে পারিত।—সে কেবল নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। সুশীলা ক্রুদ্ধ হইয়া আবার বার বার প্রশ্ন করিলেন,—"অত টাকা কি করলে—উত্তর দাও।"

এই সময় কনকের দাসী আসিয়া উপস্থিত হইল, সে সাড়ী বিক্রয়ের চেষ্টায় বাহিরে গিয়াছিল। আসিয়া এই ব্যাপার দেখিয়া প্রথমে ভীত তাহার পর কনকের দুর্দ্দশায় কাতর হইয়া পড়িল। কনকের প্রতি এইরূপ পীড়ন দেখিয়া বলিয়া ফেলিল, "তা ওকি আর টাকা খেয়ে ফেলেছে! দাদাবাবু চেয়ে পাঠিয়েছে—তাই দিয়েছে—তুমি ত আর চাইলে দেবে না,—ও না দিলে কে দেয়?"

সুশীলা রাগিয়া বলিলেন—"প্রমোদ চেয়ে পাঠিয়েছে! অত টাকা সে কখনো চাইবে না,—সেত আর বওয়াটে ছেলে নয়। দাঁড়াও আমি জিজ্ঞাসা করছি।"

দাদার নাম করায় কনক ক্রুদ্ধকটাক্ষে দাসীর দিকে চাহিল; দাসী বুঝিল—একথা বলিয়া ভাল করে নাই—সে কথাটা সারিয়া লইবার অভিপ্রায়ে বলিল—'তা সব টাকা দাদা বাবুকে দিয়েছে তাত বলছিনে, দিদিমণির কি খরচ নেই! কত দানধ্যান করছে—যে যখন টাকা চাচ্ছে তাকে দিচ্ছে।'

"সেজন্য ত মাসহারা ১৫ টাকা পায়।"

"১৫ টাকায় কি তোমাদের ঘরের দানধ্যান চলে গা! আমি সেদিন গাছ প্রতিষ্ঠা করনু—তাতেইত ১৫ গণ্ডা টাকা খরচ হোল। সেদিন বারোয়ারি পূজার জন্য চাঁদা নিতে এল তাতে তুমি কিছু দিলে না দিদিমণি তখনি যে ১৫ টাকা দিলে। এই বেণী ঘাটের ঠাকুর সে দিন চাইতে এল—"

ব্রাহ্মকন্যা হইয়া দেবপূজায় কনক দান করিয়াছে শুনিয়া সুশীলা মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেলেন। এরূপ অপব্যয় আর কিসে হইতে পারে? তিনি কনকের ব্যবহারে যেমন ব্যথিত তেমনই ক্রুদ্ধ হইলেন। সে লুকাইয়া বালা বাঁধা দিয়া সে টাকা ঐ প্রকার অন্যায় দানে খরচ করিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট অপরাধ—তাহার উপর অপরাধ করিয়া অপরাধ স্বীকারেও সাহস নাই। সে চোর, সে মিথ্যাবাদী,—তাহার গুরুভক্তি নাই, ঈশ্বরে পর্য্যন্ত ভক্তি নাই—নহিলে সে কখনও দেবপূজার জন্য চাঁদা দিতে পারে!

কনকের হীনস্বভাব কিরূপে সংশোধন করিবেন তাহাই ভাবিয়া তিনি আকুল হইয়া পড়িলেন। বালিকার সরল মূর্ত্তি পর্য্যন্ত এখন তাঁহার নয়নে কুটিল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাহার বিষাদময়ী নম্রপ্রতিমা তিনি কপটতায় পরিপূর্ণ দেখিলেন। কনকের মাতা তাহার এইরূপ ঘৃণ্য স্বভাবের দোষেই যে তাহাকে ভাল বাসিতে পারেন নাই এখন তাহা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিলেন। হায় হায়! তাঁহাদের ঘরের মেয়ে এমন "মিটমিটে ডাইন!" সুশীলা নিতান্ত ব্যথিত, দুঃখিত হইয়া পড়িলেন।

কনকের দোষের নিমিত্ত তাহাকে কি শাস্তি দিবেন তাহা স্থির করিতে তাঁহার মুস্কিল লাগিল। অবশেষে এই আজ্ঞা করিলেন, ক্রমাগত বার দিন ধরিয়া, একাকী একটি গৃহে তাহার পাপের মার্জ্জনা চাহিয়া

ঈশ্বরের নিকট সে প্রার্থনা করিবে। বার দিন সে কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিবে না, আহারের সময় দাস দাসীরা সেই গৃহে খাগু দ্রব্য লইয়া আসিবে, রাত্রেও তাহার গৃহে প্রদীপ জ্বলিবে না। এই নিয়মে কনক সেই দিন হইতে বার দিনের জন্য কারারুদ্ধ হইল।

দাসী বালা বাঁধা দিয়া টাকা আনিয়া দিয়াছে বলিয়া তাহারও শাস্তি হইল, তাহাকে জবাব দিয়া দিলেন। কিন্তু বাঙ্গালী কর্ম্মিষ্ঠা দাসীর অভাবে কিছুদিন বিস্তর অভাব ভোগ কবিবার পর—ভবিষ্যতে গুরুদণ্ডের ভয় প্রদর্শনে বর্ত্তমান দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহরণ করিতে বাধ্য হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

এই সে

এ দিকে নালিশে বিচারের দিন উপস্থিত হইল। প্রমোদ যামিনী-নাথের সহিত আলিপুরের বিচারালয়ে যাত্রা করিলেন। আলিপুরে একজন ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচার হইবে। বিচার আরম্ভ হইল, আসামী ফরিয়াদী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। উভয় পক্ষের উকীল ও সাক্ষীরা যাহা বলিবার বলিতে লাগিল।

কিন্তু প্রমোদ এখন স্থিরচক্ষু, চিন্তামগ্ন, প্রমোদের কানে সে সকল কথা কিছুই প্রবেশ করিতেছিল না, প্রমোদ বদ্ধদৃষ্টি হইয়া বিচারকের দিকেই চাহিয়াছিলেন, যেন বিচারককে তিনি আগে কোথায় দেখিয়াছেন, যেন সে মুখ তাঁহার পরিচিত অথচ তাহাকে চিনিতে পারিতেছেন না। তিনি তখন পার্শ্বস্থ যামিনীনাথকে বিচারকের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন তাঁহার নাম হিরণকুমার। সহসা বাল্যকালের সেই অপমান-জনক

ঘটনা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল—তিনি বিচারককে চিনিতে পারিলেন, চিনিলেন—ছেলেবেলায় যে হিরণকুমার তাহাকে কাঁদাইয়াছিল—এ সেই হিরণকুমার। প্রমোদ জীবনে আর কখনও ততদূর অপমানিত বোধ করেন নাই; সেই জন্য ছেলেবেলার সেই ঘটনাটী তাঁহার শিরায় শিরায় বিঁধিয়া ছিল। তবে সেই কথা মনে রাখিয়া যে প্রমোদ হিরণের প্রতি চিরশত্রুতা পণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি বাস্তবিক সেরূপ নীচ প্রকৃতির লোক নহেন, কিন্তু প্রমোদ সেই পর্য্যন্ত হিরণকে আর কেমন দেখিতে পারিতেন না। এক একজনকে দেখিবামাত্রেই কেমন অকারণে বিদ্বেষ জন্মে প্রমোদেরও হিরণের সম্পর্কে সেইরূপ হইয়াছিল। বিচারপতিকে চিনিতে পারিয়াই প্রমোদ যেন কিছু দমিয়া গেলেন, তাঁহার আর তেমন স্ফূর্ত্তির ভাব রহিল না। কে জানে কেন তাঁহার মনে হইল তিনি নিশ্চয় মকদ্দমায় হারিবেন, তাঁহার কোন দোষ প্রমাণ না হইলেও হিরণকুমার তাহাকে শাস্তি দিবেন।

বাস্তবিক, বিচারে যামিনীর সহিত প্রমোদেরও দোষ সপ্রমাণ হইল। হিরণকুমার যামিনীর একশত এবং প্রমোদের ৫০ টাকা জরিমানার আদেশ করিলেন। প্রমোদ অবশ্য মনেই করেন নাই যে তাঁহার দোষ সাব্যস্ত হইবে। আর নিতান্তই যদি হয়, তাহা হইলেও যে এই সামান্য দোষে ১০।২০ টাকার অধিক অর্থদণ্ড হইবে তাহা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, সুতরাং তিনি ২০ টাকার একখানি নোট ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে আনেন নাই। উকীল খরচে তাহার অধিকাংশই ব্যয় হইয়া গিয়াছিল। এখন একেবারে ৫০ টাকা জরিমানা দিতে হইবে শুনিয়া তিনি যেমন বিপদে পড়িলেন তেমনি ক্রুদ্ধও হইলেন। তিনি ভাবিলেন হিরণকুমার তাঁহাকে চিনিয়াই এইরূপ অবিচার করিলেন। কিন্তু বাস্তবিক হিরণ তাঁহাকে চিনিতেও পারেন নাই। যখন হিরণ তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন তখন প্রমোদ দশমবর্ষীয় বালকমাত্র, এখন যৌবনাবস্থায়

তাঁহার চেহারা কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যাহা হউক, তখনই তো দণ্ডের টাকা দিতে হইবে, অগত্যা তাহা যামিনীর নিকট তাঁহার ধার করিতে হইল। কিন্তু তাহাতে প্রমোদ অত্যন্ত অপমান বোধ করিলেন এবং হিরণের প্রতি তাঁহার বদ্ধমূল ঘৃণা জন্মিল। ক্রুদ্ধ ও অপমানিত চিত্তে মনে মনে হিরণকুমারের শ্রাদ্ধ করিতে করিতে তিনি যামিনীর সহিত তাঁহার বাটী গমন করিলেন; সেখানে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে বিচারকের অবিচারের প্রতি বাক্যবাণ বর্ষণ করিয়া যেন কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

নূতন সন্দেহ

সেখান হইতে অপরাহ্ণে প্রমোদ পদব্রজে আপন বাটী অভিমুখে গমন করিতেছিলেন। সচরাচর ধনাঢ্যসন্তানেরা পদব্রজে চলিতে যেরূপ অপমান মনে করেন, প্রমোদ তাহা করিতেন না। রৌদ্র কিম্বা বৃষ্টিবশতঃ বিশেষ প্রয়োজন না হইলে, সকালে বিকালে কোথাও যাইবার সময় প্রমোদ প্রায়ই পদব্রজে গমন করিতেন, হাঁটিতে তাঁহার বেশ স্ফূর্ত্তি বোধ হইত। এবিষয়ে তিনি কলিকাতার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করেন নাই।

বিচারের ফলাফল জানিতে সমস্ত দিন ঔৎসুক্যে থাকা প্রযুক্ত এবং শেষে পরাজিত হইয়া এখন প্রমোদ বেশ একটু অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি চিন্তাযুক্ত ম্লানভাবে আচ্ছন্ন। প্রমোদ একাকী একমনে কত কি ভাবিতে ভাবিতে চলিতেছিলেন। মাঝে মাঝে এক একবার সেই বনবালামূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে চমকিয়া

যাইতেছিল, প্রত্যেক চিন্তার সঙ্গেই যেন সে মূর্ত্তি কোন না কোন প্রকারে জড়িত। সন্ন্যাসীর দারুণ সন্দেহের কথাও মাঝে মাঝে মনে পড়িয়া তাঁহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেছিল; এরূপ জঘন্য দোষে তাঁহাকে দোষী করা সন্ন্যাসীর কি ভয়ানক অন্যায়! কি করিয়া তিনি তাঁহার সে সন্দেহ হইতে মুক্ত হইবেন? নীরজার পিতার চক্ষে দোষী থাকা কি ভয়ঙ্কর কষ্টকর! এইরূপ এদিক ওদিক কত কি ভাবিতে ভাবিতে প্রমোদ চৌরঙ্গির রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। দেখিলেন অপরাহ্নের কনক-কিরণোজ্জ্বল শ্যামদূর্ব্বাদল-পূর্ণ মাঠে কোথাও যুবকেরা ক্রিকেট খেলিতেছে, কোথাও ফুটবল চলিতেছে, কোথাও সুন্দর সুন্দর বালকবালিকাগণ দাসদাসীর নজরবন্দী হইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। প্রমোদ একবার সেই ক্রীড়াকৌতুকপ্রফুল্ল মাঠের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একবার সেই দিগন্তবর্ত্তী সূর্য্যের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন; তাহার পর আবার নিজের ভূতভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। কিছু পরে আবার যখন তাঁহার মাঠের দিকে দৃষ্টি পড়িল তখন দেখিলেন, অস্তগামী সূর্য্যের হেমাভ রশ্মি সেই শ্যামলক্ষেত্র-প্রান্তরে জ্বলিতেছে, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা-চূড়ায় জ্বলিতেছে; এবং সেই মাঠের দূরপ্রান্তে একজন শ্মশ্রুজটাধারী ব্যক্তির মুখে পড়িয়াছে। প্রমোদ নীরজার পিতাকে চিনিতে পারিলেন; চিনিয়া তাহার মুখ যেন হর্ষোৎফুল্ল হইল; তিনি দ্রুতপদে সন্ন্যাসীর নিকট আসিলেন। হঠাৎ প্রমোদকে দেখিয়া সন্ন্যাসীও কিছু আশ্চর্য্য হইলেন। প্রমোদ বলিলেন—

"মহাশয়, আপনার সহিত একটু বিশেষ কথা আছে।" নীরজার সম্বন্ধে কিছু হইতে পারে ভাবিয়া সন্ন্যাসী তাঁহার সহিত মাঠের একটি নির্জ্জন প্রান্তে আসিয়া পঁহুছিবামাত্র প্রমোদ বলিলেন "মহাশয়, আপনাকে আমি খুঁজছিলেম। দেখা পেয়ে যে কত সুখী হলেম কি বলব।"

সন্ন্যাসী অধীর গম্ভীর ভাবে বলিলেন "নীরজাকে আমায় ফিরে দিতে কি তবে মানস করেছ ?"

প্র। আপনি জানেন না যে আমাকে দোষী ভেবে আমার মনে কি কষ্ট দিচ্ছেন। কিন্তু আজ আপনার অবিশ্বাস দূর হবে। সে দিন হঠাৎ জেনেছি নীরজা কোথায়।

সন্ন্যাসী প্রতিধ্বনির মত জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কোথায় ?"

প্রমোদ তখন নীরজার উদ্ধারবিবরণ সংক্ষেপে বলিয়া কহিলেন, "যামিনীনাথ আপনাকে অনেক বার চিঠি লিখেছেন ; আপনি তা না পাওয়াতেই যত গোল ঘটেছে।"

সন্ন্যাসী বিস্ময়সহকারে বলিলেন "যামিনীনাথ! যাকে নীরজা তোমার সঙ্গে একরাত্রি আশ্রয় দিয়েছিল, তার নামই না যামিনীনাথ? সে নীরজাকে উদ্ধার করেছে ? কিন্তু উদ্ধার ক'রে আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া দূরে থাক্ সে খবরটা পর্য্যন্ত আমাকে এত দিন দেয় নি।"

প্রমোদ বলিলেন "মহাশয় তাঁকে সন্দেহ করবেন না, আগেইত বল্লেম তিনি আপনাকে খবর দিতে ত্রুটি করেন নি, আপনার কাছে যে সে সব চিঠি কেন পৌঁছয় নি সেইটেই আশ্চর্য্য !"

সন্ন্যাসী কিয়ৎকাল চিন্তামগ্ন ভাবে নিরুত্তর থাকিয়া পরে বলিলেন "চিঠি লিখলে আমি পেতেম না এ অসম্ভব !"

প্র। না মহাশয়, আপনি আবার আর একজনকে অন্যায় রূপে দোষী করছেন।

সন্ন্যাসী সে কথা না শুনিয়া প্রমোদকে বলিলেন "নীরজা কোথা, এত দিন তুমি তা জানতে না ?"

প্র। না।

স। অথচ যামিনী তোমার পরম বন্ধু ?

প্রমোদ একটু বিপদে পড়িয়া বলিলেন "মহাশয়, বন্ধু বটে, কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর"—

সন্ন্যাসী প্রমোদকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন "তোমার আর কিছুই বলবার প্রয়োজন নেই। আমি এখনই তোমার বন্ধুর বাড়ী যাচ্ছি।"

তিনি ভবানীপুরে একজন আত্মীয় ব্যক্তির সহিত নীরজার সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্ধান পাইয়া আর সেখানে না গিয়া, যামিনীনাথের বাড়ীই যাত্রা করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

হাসিমুখে বিষাদ

সেই অপরাহ্নে যামিনীনাথের বাটীর অন্তঃপুরস্থ উদ্যানের বৃক্ষলতা-সমাকুল একটি নিভৃত প্রান্ত হইতে নীরজা বাহির হইল। নীরজার বাম হস্তে একটি কাকাতুয়া, তাহার সহিত কথা কহিতে কহিতে সে উদ্যানস্থিত সরোবরতীরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন স্বচ্ছসলিলা সরসী মৃদু সমীরস্পর্শে তলতল ঢলঢল করিয়া কাঁপিতেছিল; কাঁপিয়া কুমুদদল কাঁপাইয়া মৃদু মৃদু কল্লোলে তট চুম্বন করিতেছিল। তীরস্থিত একটি কামিনী বৃক্ষের অসংখ্য ফুলরাশি হইতে মধ্যে মধ্যে দুই একটি বায়ুস্খলিত কুসুম চৌদিকে বাস বিকীর্ণ করিতে করিতে সরোবরে আত্ম সমর্পণ করিতেছিল; নীরজা গান গাহিতে গাহিতে এক একবার সেই স্রোতসঞ্চালিত সুখ-ক্রীড়মান কুসুম রাশির প্রতি দৃষ্টিপাত

করিতেছিল, এক একবার গান বন্ধ করিয়া কাকাতুয়ার মুখ চুম্বন করিতেছিল। গাহিতেছিল,—

চললো, কাননে যাইব দুজনে
জুড়াতে জীবন জ্বালা ;
সজনিলো, আজি ফুলে ফুলে সাজি
কাটাব সারাটা বেলা ;
তরু মূলে মূলে, ফুল তুলে তুলে,
কহিব মরম কথা ;
গাহিব, লো, গান খুলিয়ে পরাণ,
ভুলিব সকল ব্যথা ;
তুলিয়ে বকুলে পরাইব চুলে,
বেলায় করিব দুল,
উড়ায়ে ভ্রমরে, বোঁটা ধরে ধরে
তুলিব গোলাপ ফুল ;
কিসের বেদনা, কিসের যাতনা,
কিসের হৃদয় জ্বালা ?
দেখিব আজিকে হৃদয় আঁধার
ঘোচাতে পারি কি বালা।

নীরজা অধিকক্ষণ তীরদেশে দাঁড়াইয়া রহিল না, গানটী গাহিতে গাহিতে সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কামিনী ফুলে অঞ্চল পূর্ণ করিল ; চাঁপাবৃক্ষের নিকট গিয়া নিম্নমুখী শাখা হইতে কতকগুলি সপত্র চাঁপা পাড়িল, বকুলতলা হইতে কতকগুলি বকুল কুড়াইল, লতাবৃক্ষের নিকট আসিয়া কতকগুলি লতা ছিঁড়িল, শেষে কতকগুলি বেল, মল্লিকা, গোলাপ তুলিয়া গোলাপের কাঁটা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে, গানে কাকাতুয়ার সহিত কথা কহিতে কহিতে, আবার সেই বৃক্ষসমাকুল নিভৃত প্রান্তে গমন করিল।

সেখানে আসিয়া কাকাতুয়াকে বলিল "তুই দুঃখ বুঝিস্? তোকে নিয়ে আজ আমার মনের জ্বালা জুড়াব।" বলিয়া আবার গাহিতে গাহিতে সেই নিভৃত কুঞ্জমধ্যে ফুলপত্রে একটি শয্যা রচনা করিয়া সেই শয্যার চতুষ্পার্শে ফুল সাজাইয়া কাকাতুয়াটিকে তথায় শোয়াইতে গেল। নীরজার হস্ত ছাড়িয়া কাকাতুয়া তখন কুসুম শয্যায় যাইতে চাহিবে কেন? সে অনিচ্ছার স্বরে চীৎকার করিয়া পুনরায় তাহার হস্তে উঠিয়া বসিল। নীরজা আর একবার তাহাকে ফুলশয্যায় শোয়াইতে চেষ্টা করিয়া বলিল—

"বেশ বিছানা হয়েছে তুই শুয়ে থাক, আমি ততক্ষণ আমার মুরীটিকে এইখানে নিয়ে আসি।" কাকাতুয়া তাহার কথা বুঝিল না, অবাধ্য সন্তানের মত রাগিয়া নীরজার হস্তে চঞ্চুর আঘাত করিল। নীরজাও তাহাতে ঈষৎ ক্রোধ দেখাইয়া কুসুম অঙ্গুলিতে ধীরে ধীরে তাহাকে মারিয়া বলিল—

"তুই বড় বোকা এইখানে শুয়ে থাক্।" বলিয়া ছেলে ঘুম পাড়াইবার মত দু একটি চাঁপা পত্র দ্বারা বিছানার উপর তাহাকে চাপিয়া ধরিল। কাকাতুয়া বিষম চীৎকার করিতে করিতে আবার তাহার হস্তে উঠিয়া আসিল। তখন নীরজা আর তাহাকে শোয়াইতে চেষ্টা না করিয়া বলিল—

"আহা এ বিছানা বুঝি তোর ভাল লাগলো না? কবে কাকাতুয়া আমি সেই বনে যাব বল দেখি? তাহলে তোকে কত ভাল ভাল পাতার বিছানা ক'রে দেব, সে সব তো এখানে নেই।" কাকাতুয়া তাহার আদর বুঝিয়া তাহার দিকে চাহিয়া 'কাকাতুয়া' 'কাকাতুয়া' করিল, নীরজা বুঝিল কাকাতুয়া তাহার ব্যথার ব্যথী। এই সময় যামিনীনাথ সমস্ত উদ্যানটি খুঁজিতে খুঁজিতে এই খানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া কাকাতুয়ার সহিত নীরজার গল্প শুনিতে লাগিলেন। নীরজা মুখ তুলিয়া একবার যামিনীনাথকে দেখিল, একটু ছেলেমানুষের মত হাসিল; কিন্তু

তাঁহার সহিত কথা না কহিয়া আবার মুখ নত করিয়া কাকাতুয়ার সহিত কথা কহিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ যামিনী মৌনভাবে থাকিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিলেন "নীরজা এত গল্প কার সঙ্গে ?"

নীরজা মুখ নত করিয়াই বলিল "কেন ?" আমার সখীর সঙ্গে ?"

"কাকাতুয়া নুরী এরাই কি নীরজা চিরকাল তোমার সখী থাকবে ? আমাকে কি মনের কথা বল্‌বে না ?" বলিয়া যামিনীনাথ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া মৌন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন নীরজা তাঁহার নীরবতা বা দীর্ঘনিশ্বাস কিছুই লক্ষ্য করিল না—তখন আবার মৌন ভঙ্গ করিয়া বলিলেন "নীরজা আমাকে আর কতদিন এরূপ যাতনা সইতে হবে ?"

নী। "কাকাতুয়াটা বুঝি ঘুমোলো ?—আপনার যন্ত্রণা ? কেন ? কি যন্ত্রণা ?"

যা। "কতকাল আমার মনোরথ আর অপূর্ণ থাকবে ?"

নী। "এই যন্ত্রণা ? দেখুন্ আমাদের বনে তো এমন বড় মল্লিকা ছিল না, কিন্তু আমার বোধ হয় এর চেয়ে সেগুলি তবু ভাল।"

যা।' "নীরজা আমার কষ্টে তোমার কি কিছুমাত্র কষ্ট হয় না ?" আমার এমন জিজ্ঞাসার উত্তর পর্য্যন্ত নেই !"

নী। "অ্যাঁ অ্যাঁ ? আমি এই মল্লিকাটি দেখতে বড় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেম। আমাদের কুটীরের চার ধারে এত মল্লিকা ফুট্‌তো কি আর বলব ? বাবা কি আমাদের শেষ চিঠিখানি পেয়েছেন ? সে চিঠি পেয়ে উত্তর দিলে কিম্বা তিনি এলে কতদিনে এখানে পৌঁছবেন বলুন দেখি ? আহা, কতদিনে সেই কুটীরে গিয়ে বেড়াব !

যা। তোমার ইচ্ছার মত কাজ করতে আমার তো বিন্দুমাত্র ত্রুটি নেই। সন্ন্যাসী মহাশয়কে যে কত চিঠি লিখেছি তাতো জান ?"

নী। "আমার কি সব কথাই আপনি রেখেছেন ? তা'হ'লে এতদিন

কেন সেখানে আমাকে রেখে এলেন না? কাকাতুয়া, আমার সঙ্গে তুই যাবি? বল্‌না? যাবিতো?"

কাকাতুয়া আবার তাহার দিকে চাহিয়া 'কাকাতুয়া' 'কাকাতুয়া' করিল। নীরজা বুঝিল কাকাতুয়া যাইবে। যামিনী বলিলেন "ছি! তুমি ঐ কথা নিয়ে আমার মনে মিছামিছি কষ্ট দিচ্ছ? তুমি কি জাননা তোমার কথাটি রাখতে পারলেম না বলে কত কষ্ট হয়েছে? কিন্তু কি করবো এখানে কাজে এমনি ব্যস্ত আছি যে কল্‌কাতা ছেড়ে আমার একদিনের জন্যও কোথাও যাবার যো নেই। কিন্তু আমি তোমাকে দস্যুদের হাত হতে রক্ষা করলেম, শুধু তা নয়, তোমার জন্য কত কষ্ট স্বীকার করেছি, তুমি তার পরিবর্ত্তে আমার কথার উত্তর পর্য্যন্ত আজকাল দাও না?"

নী। "কথার উত্তর আবার কখন দিইনে? আহা, আমার সেই হরিণটা যে কেমন ছিল, বাবা নৈমিষারণ্য হতে এনে দিয়েছিলেন। সেটি থাকলে কেমন কাকাতুয়াব সঙ্গে খেলা করত! কিন্তু না, না, ভুলে গেছি, কি বলছিলেন?"

যা। "আমার এমনি অদৃষ্ট, তোমার মনের কথা এখনো বুঝতে পারলেম না, আমি হতভাগা, আমি দুর্ভাগা, আমার মরণই ভাল।"

নী। "ও কি! ও কথা কেন? কি বলছিলেন?

যা। "কতদিন আর বিবাহ করতে দেরি করবে?"

নী। আচ্ছা আপনি এ কাকাতুয়াটি কোথায় পেলেন?" যামিনী বিষাদার্দ্র স্বরে বলিলেন,—

"নীরজা এই কি আমার কথার উত্তর?"

নীরজা কিছু অপ্রতিভ ভাবে বলিল "না, না, আর আমি কাকাতুয়ার পানে চাইব না, তা হ'লে কেমন অন্যমনা হয়ে পড়ি।"

যামিনী আবার বলিলেন "বিবাহে আর কত দেরি?"

নী। "কেন এক বৎসর?"

যা। "এক বৎসরই যে এক যুগ"।

নীরজা হাসিয়া বলিল "তা কি করে হবে? আমি শাস্ত্রে পড়েছি ১২ বৎসরে এক যুগ।"

যা। "নীরজা তুমি বড় নিষ্ঠুর, যদি বিবাহই করবে তো এক বৎসর আবার বিলম্ব কেন।"

নী। "এক বৎসরের মধ্যে নিশ্চয়ই বাবা আসবেন তখন আমাকে নিয়ে তাঁর যা ইচ্ছা করবেন, তা না আসেন তখন"—

যা। "আমি তোমাকে দস্যুহস্ত হ'তে মুক্ত করলেম প্রত্যুপকারে তুমি আমার এই কথাটি রাখবে না? সুন্দরি তুমি বড় কৃতঘ্ন।" নীরজার ভ্রূধনু ঈষৎ কুঞ্চিত হইল, মুক্তাদন্তে অধর ঈষৎ চাপিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল "আমি কৃতঘ্ন! অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহে সম্মত; আমি কৃতঘ্ন!"

যা। "তোমার বিবাহে ইচ্ছা নেই, এই ত কৃতঘ্নতা, এত ভালবাসার প্রতিদান নেই এই ত কৃতঘ্নতা।"

নী। "আমি যে ভালবাসিনা তাও ত নয়। কিন্তু ভালবাসলেই কি বিয়ে করতে হয় নাকি?"

যা। তুমি যদি সত্য সত্যই আমাকে ভালবাসতে তা হ'লে আর ও রকম কথা বলতে না। আমি তোমার ঐ বিশাল চক্ষুর মোহন দৃষ্টি যতই দেখি ততই মনে হয় এক বৎসর আমার পক্ষে এক যুগ।"

নী। "কই আমার তো তা মনে হয় না।"

যা। "আমার বেলা হয় না, কিন্তু প্রমোদ হোলে হ'ত।"

নীরজা যদিও প্রমোদের কথা যামিনীকে কিছুই বলে নাই, তথাপি যামিনী মনে সন্দেহ করিতেন নীরজা প্রমোদকে ভালবাসে। কিন্তু সে কথা কখনও তাহাকে ফুটিয়া বলেন নাই। আজ মনের আবেগে

এই কথাটি আপনা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। নীরজা একটু অপ্রকৃতিস্থ ভাবে বলিল—

"প্রমোদ—প্রমোদ আবার কবে এখানে আসবেন?"

যা। "প্রমোদ এখানে আসুন না আসুন তোমার তাতে কি?

নী। "কেন? তাঁকে এক-একবার দেখতে ইচ্ছা—"

যা। "আমার সম্মুখে ও কথা বলতে তোমার লজ্জা বোধ হ'ল না?"

নী। লজ্জা! এতে লজ্জা! কেন, একি কোন দোষের কথা?"

যা। "লজ্জাহীনা! কৃতঘ্ন! আমি বুঝতে পেরেছি—"

নী। "আবার বলবেন আমি কৃতঘ্ন! কেবলমাত্র কৃতজ্ঞতার উপরোধেই আমি আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছি—আমি কৃতঘ্ন?" বলিতে বলিতে নীরজার চক্ষুদ্বয় স্থির বিদ্যুতের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। যামিনী ঈষৎহাস্য করিয়া বলিলেন "আমি দেখছিলেম তোমার অঙ্গীকার হৃদয়ের না অধরের—"

যামিনীর কথা শেষ না হইতে হইতে একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল, "একজন সন্ন্যাসী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।" সন্ন্যাসীর নাম শুনিয়া যামিনী চমকিয়া উঠিলেন। বুঝিলেন—এ সন্ন্যাসী কে। তিনি আর নীরজাকে কিছু না বলিয়াই সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সংশয়

যামিনীনাথ দেখিলেন সন্ন্যাসী নীরজার সন্ধান জানিয়াছেন, এরূপ স্থলে তাঁহার নিকট মিথ্যা কথা কহিয়া নীরজাকে গোপন করিতে কিম্বা বলপূর্ব্বক আটকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করা আর যুক্তিসঙ্গত নহে। বুঝিলেন সে উপায়ে অভিপ্রায় সিদ্ধ হওয়া বড় দুরূহ। তিনি তখন অন্য উপায় অবলম্বন করিতে স্থির করিয়া দ্বারদেশ হইতে সন্ন্যাসীকে উপরে আনিতে আদেশ করিলেন। সন্ন্যাসী উপরে আসিলে তাঁহাকে সম্মানপূর্ব্বক বসিতে বলিয়া অতি বিনীত ভাবে বলিলেন "মহাশয়ের কি অভিপ্রায়ে আগমন? সন্ন্যাসী বলিলেন "বৃথা বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন কি—আমি নীরজাকে নিতে এসেছি।"

যা। "হাঁ, নীরজা নামে একটি কন্যাকে আমি দস্যুহস্ত হতে মুক্ত করে এখানে আশ্রয় দিয়েছি। কিন্তু আপনি অপরিচিত, আপনার নিকট কি করে তাঁকে সমর্পণ করি।"

স। "আমি তোমার নিকট অপরিচিত, কিন্তু আমিই নীরজার পিতা।"

যামিনী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন "আপনিই নীরজার পিতা?"

স। "হাঁ, আমিই নীরজার পিতা; নীরজা আমারই ন্যায্যধন! আমা হতে তাকে ছিন্ন করে, পাষণ্ড; আমাকে কি কষ্টই না দিয়েছিস? দিন নাই, রাত্রি নাই, রৌদ্র নাই, বৃষ্টি নাই, নীরজার অনুসন্ধানে কোথায় না ফিরেছি? মনের ব্যাকুলতায় নির্দ্দোষীকে পর্য্যন্ত অপরাধী করেছি। পাষণ্ড, তোকে এর সমুচিত ফল পেতে হবে।" যামিনী

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বলিলেন "মহাশয় কি বলছেন? আমি নীরজাকে আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছি!"

স। "নইলে এখনো নীরজা এখানে কেন? যদি যথার্থই দস্যুহস্ত হতে রক্ষা করতে, তা'হলে তাকে তার পিতার নিকট পৌঁছিয়ে না দিয়ে এখানে রাখবে কেন? পাষণ্ড, পামর, নীরজা এখনো ত দস্যুহস্তগত।"

যা। "কি আশ্চর্য্য! আমার এ উত্তম পুরস্কারই বটে! কোথায় নীরজার জীবনদান করলেম বলে আপনার প্রিয়পাত্র হব, না আপনি আমাকেই অবিশ্বাস করছেন! নীরজাকে এখানে এনে অবধি আপনাকে কত চিঠিই লিখেছি তার ঠিক নেই—এখন বুঝতে পারছি, সেখানে না থাকায় আপনি কোন চিঠিই পান নাই, কিন্তু সেটাত আর আমার দোষ নয়।

স। "আমি বন্দবস্ত করে এসেছিলেম আমার নামে যে কোন পত্র আসুক আমি যেখানে থাকি পাব। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তো কানপুর থেকে একখানি পত্রও ফেরত আসেনি।"

যা। "তবে কি গোল হয়েছে কি করে বলব—কিন্তু সে জন্যে কি আপনি আমাকে দোষী করবেন? যদি বিশেষ কাজে কলকাতায় না আটকা পড়তেম তো আমি নীরজাকে নিশ্চয়ই এতদিন নিজে সঙ্গে করে কানপুরে রেখে আসতেম। যা হ'ক আমার এ উত্তম পুরস্কারই বটে!" যামিনীর কথা শুনিয়া তাহার দোষের প্রতি সন্ন্যাসী বিচলিতমনা হইলেন! যামিনী তাহা বুঝিয়া আবার ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—

"মহাশয় আপনার কিসে সন্দেহ হ'ল আমি নীরজাকে হরণ করেছি, বড় জানতে ইচ্ছা হচ্ছে। কেন না ভবিষ্যতে কারো উপকার করতে গেলেও ভেবে চিন্তে অতি সাবধানে করতে হবে; উপকার

করলেও দেখছি তার শাস্তি আছে, যথার্থই ভাল করলে মন্দ হয়।” সন্ন্যাসী পূর্ব্ব হইতে একটু নরম হইয়া বলিলেন—

“যুবা পুরুষেরা অনেক সময় সৌন্দর্য্যমুগ্ধ হয়ে অতি গর্হিত কার্য্যেও অগ্রসর হয়।”

যা। “যদি তাই হ’ত তবে এত দিন কি আমি তাকে বিবাহ করতেম না? একবার বিবাহ হয়ে গেলে আপনি আর কি করতেন? যদি ভাবেন নীরজা অসম্মত বলেই তা হয় নি কিন্তু ভেবে দেখুন নীরজা এখন আমার সম্পূর্ণ অধীনে, তাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করলে সে কি করতে পারত? নীরজা অসহায়, আমি তার উপর যত ইচ্ছা অত্যাচার করতে পারি। কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন আমি তাকে কিরূপ যত্নে রেখেছি।” যামিনীর কথায় সন্ন্যাসী অনেকটা নরম হইয়া আসিলেন। যামিনী তাহা বুঝিতে পারিয়া আবার বলিলেন,

“মহাশয়, এমনতর অন্যায় অবিচার করবেন না। বরং নীরজাকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন তা হলে যথার্থ অবস্থা সব বুঝতে পারবেন।” সন্ন্যাসী বলিলেন—

“যদি সত্যই তুমি নীরজাকে রক্ষা করে থাক তা হলে তোমাকে দোষী করা আমার অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। তুমিও তো ব্রাহ্মণ, তোমার হস্তে নীরজাকে সমর্পণ করে আমার এ দোষের প্রায়শ্চিত্ত করব! তুমি নীরজার উদ্ধারকর্ত্তা, নীরজা তোমারি প্রাপ্য।” শুনিয়া যামিনীর মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল, সবিনয়ে কহিলেন—

“মহাশয়, আমি বহু কষ্টে নীরজাকে উদ্ধার করেছি বটে, কিন্তু আমি নীরজার যোগ্য পাত্র নই। নীরজা যেরূপ রূপবতী ও গুণবতী তার উপযুক্ত পাত্র তো আমার চক্ষে পড়ে না। আমার উপর আপনি অত কৃপা করলে আমাকে—’

স। তোমার বিনয় অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু একটি কথা। তুমি

ও প্রমোদ ছাড়া অরণ্যে নীরজাকে কেহই দেখে নাই—তুমি যদি দোষী না হও তবে প্রমোদ দোষী, অন্য কারো তাকে হরণ করা ত সম্ভব নয়।”

যামিনীনাথ এই কথায় থামিয়া থামিয়া হাত রগড়াইতে রগড়াইতে বলিলেন “প্রমোদ! না না মহাশয় সে কি? সে কখনই না—কিন্তু প্রমোদ—প্রমোদ—না; আমার যে বিশ্বাস—উঃ তাও কি হতে পারে? কিন্তু—জগদীশ্বর! তুমিই জান—মানুষের মন।”

যামিনীনাথের কথার ভাবে বোধ হইল তিনি যেন ইহার কিছু জানেন, কিন্তু বলিতে অনিচ্ছুক। সন্ন্যাসী ইহাতে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া কন্যাকে দেখিতে চাহিলেন। যামিনী নীরজাকে অন্তঃপুর হইতে এইখানে আনিয়া দিয়া অন্য গৃহে গিয়া বসিলেন। এতদিন পরে পিতা কন্যার সাক্ষাতে তাঁহাদের মনের ভাব কি হইল, তাঁহাদের কি কথা বার্ত্তা হইল তাহা অনুভবের বিষয়, বর্ণনীয় নহে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সাধু না চোর?

নীরজার সহিত কথা কহিবার পর যামিনীকে সন্ন্যাসীর নির্দ্দোষী মনে হইল; তিনি শুনিলেন যে রাত্রে নীরজা অপহৃত হয়, সে রাত্রে যামিনীনাথ কানপুরেই ছিলেন না।

“কিন্তু যদি যামিনীনাথ নির্দ্দোষী তবে দোষী কে? প্রমোদ? যামিনীনাথের কথার ভাবে মনে হয় যেন প্রমোদ ইহার মধ্যে আছেন অথচ নীরজার কথা মতে প্রমোদও সম্পূর্ণ নিরপরাধ। কিন্তু তাহা তো হইতেই পারে না; এই দুই জনের মধ্যে এক জন তো নিশ্চয়ই দোষী

হইবে। নীরজা বলে সে দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল, কিন্তু দস্যুরা কি লোভে নীরজাকে হরণ করিবে? তাহার অঙ্গে তো অলঙ্কার ছিল না। ধনলোভ নহিলে কেবল সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া কি দস্যুরা নীরজাকে হরণ করিবে? ইহা কি সম্ভব? তাহা হইলে যামিনী ও প্রমোদের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বেই বা কেহ তাহাকে হরণ করিল না কেন? ইহারা মন্দিরে অতিথি হইবার পর যখন এ ঘটনা ঘটিয়াছে তখন এই দুইজনের মধ্যেই কোন এক জন যে ধনদ্বারা দস্যুক্রয় করিয়া এ কার্য্য সিদ্ধি করিয়াছে, ইহা একরূপ নিঃসন্দেহ। অথচ কথায় বার্ত্তায় দুইজনকেই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী বলিয়া মনে হয়!"

সন্ন্যাসী ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মহা সমস্যায় পড়িলেন। আপনাকে ইহার মীমাংসায় অপারগ দেখিয়া তিনি সে দিনের জন্য নীরজাকে যামিনীর বাড়ীতেই রাখিয়া অবিলম্বে ভবানীপুরে তাঁহার সেই আত্মীয়টির বাটী গমন করিলেন; আত্মীয়টি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত হিরণকুমার ব্যতীত আর কেহই নহেন। সন্ন্যাসী এখানে আসিয়া হিরণকুমারকে আদ্যোপান্ত সবিশেষ বলিলেন। হিরণকুমার সকল শুনিয়া বলিলেন "আপনার কথায় আমার যামিনীকেই দোষী মনে হচ্ছে।"

"কিন্তু তা কি করে হবে? প্রথমতঃ যে রাত্রে নীরজা অপহৃত হয়, সে রাত্রে যামিনী কানপুরে ছিলই না; দ্বিতীয়তঃ, নৌকার মাঝির মুখে নীরজার খবর পেয়ে তবে যামিনী তার উদ্ধারে আসে।"

হিরণকুমার। আমার মনে হয় এ সকল যামিনীর চাতুরী মাত্র। যামিনী যে কি ভয়ানক লোক আপনি জানেন না! মনে হয় এমন কোন কাজই নেই সে করতে না পারে।

স। সত্য নাকি? যামিনীর স্বভাব কি অত্যন্ত জঘন্য? কিন্তু তাকে দেখে তো তা মনে হয় না এবং নীরজার মুখেও তো তার প্রশংসা শুনলেম।

হি। যামিনী অনেক লোকের মাথা খেয়েছে। বাইরে থেকে তাকে চেনা বড় সহজ নয়।

স। কিন্তু তার স্বভাব মন্দ হলেও এ কার্য্যে আমার তাকে দোষী মনে হয় না। বরঞ্চ প্রমাণ সমস্ত বিপরীত। যামিনীর কথার ভাবে মনে হয় প্রমোদই এর মধ্যে আছে।

হি। যামিনী ঐ যে অস্পষ্ট ভাবে প্রমোদের ঘাড়ে দোষ ফেলতে চাচ্ছে, তাতে তাকেই আমার বেশী সন্দেহ হয়। যা হক, যামিনীর সঙ্গে একবার কথা না কয়ে আমি নিশ্চয় ক'রে কিছু বলতে পারিনে। হয় তো বাস্তবিকই যামিনী এ কাজ করে নি, আমিই অযথা সন্দেহ করছি।

স। তবে সাক্ষাৎ-ই হ'ক না কেন? যদি বাস্তবিকই যামিনী ঐরূপ ষড়যন্ত্রকারী হয় তো আমি রক্ষা রাখব না।

যামিনীকে সঙ্গে লইয়া পরদিন সন্ন্যাসী হিরণের বাড়ীতে আসিলেন; যামিনীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া হিরণের সন্দেহ আরও বৃদ্ধি হইল। হিরণকুমার যামিনীকে বলিলেন—

"আপনি বলছেন কানপুরে সন্ন্যাসীমহাশয়কে আপনি পত্র লিখেছেন। সমস্ত চিঠি মারা গেল, একখানিও সেখানে পৌঁছল না এ কি সম্ভব?

যামিনী বলিলেন "আমার কথায় অবিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু আমি মিথ্যা বলছি না। আপনাকে বলতে কি, যে দিন মিথ্যা কথা বলব সেদিন এ জিব কেটে ফেলব। স্বীকার করি আমি মানুষ নানা দোষে দোষী—কিন্তু আমার কোন শত্রুও আমাকে মিথ্যা কহার দোষে দোষী করতে পারবে না।"

হি। কেবল আপনার কথায় বিশ্বাস করতে বলা ছাড়া এবিষয়ে আপনার বলবার তবে আর কিছুই নেই? আপনি সেই রাত্রেই

হঠাৎ প্রমোদকে ছেড়ে কানপুর থেকে চলে গেলেন কেন? দুজনে গিয়েছিলেন হঠাৎ একা চলে আসবার কি কারণ হতে পারে?

যা। বিকালে টেলিগ্রাম পেলুম, সে রাত্রে তখনি না ছাড়লে একটা মকদ্দামায় আমার সর্ব্বনাশ হতে পারে। আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?

হি। কলকাতায় যাবার যদি এতই প্রয়োজন ছিল, তবে এলাহাবাদে কি করছিলেন? এলাহাবাদেই না আপনি নীরজাকে ডাকাতের হাত থেকে উদ্ধার করেন?

যা। আপনি দেখছি আমাকে নিতান্তই আদালতের সাক্ষী পেয়েছেন। কিন্তু যখন আমি এই উপকারে ব্রতী হয়েছি, যখন সন্ন্যাসীমহাশয়ের কথায় আপনার বাড়ী পর্য্যন্ত এসেছি, তখন এতেও আমি কিছু মনে করব না। শুনুন, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। কানপুর থেকে গাড়ী এলাহাবাদ ষ্টেশনে যখন থামল, তখন প্লাটফরমে নেমে দেখি আমার নায়েব সেখানে হাজির। ব্যাপারখানা কি, না মকদ্দামার একজন প্রধান সাক্ষীর বাড়ী এলাহাবাদে, সে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য না দিলে হারবার সম্ভাবনা, তাই নায়েব স্বয়ং আমাকে এলাহাবাদে আটক করে বলতে এসেছে যে, আমি যেন সেই লোককে নিজে ব'লে ক'য়ে সঙ্গে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাই। কি করি কলকাতায় আর তখনি ফেরা হোল না। বিপদ আবার এমনি, তখনি সে সাক্ষীর বাড়ী গিয়ে শুনি সে বাড়ী নেই, কোথায় কোন্ গাঁয়ে গেছে, দুচার দিন পরে ফিরবে,—কাজেই আমাকে তার অপেক্ষায় এলাহাবাদে বসে থাকতে হোল।

হিরণ। যদি এলাহাবাদের সাক্ষীকে মকদ্দমার জন্য ধরা এতই আবশ্যক ছিল তবে নায়েব আগে থাকতে সে কথাও কেন আপনাকে টেলিগ্রামে জানালে না?

যা। এটা বোঝা কি এতই দুষ্কর! নায়েব আমাকে টেলিগ্রাম করবার সময় তা জানত না, তারপর জানবা মাত্র আমাকে নিজে খবর দিতে এল।

হি। আর আপনি সে কার্য্য সিদ্ধ করে যথাসময়ে কলকাতায় পৌঁছে মকদ্দামা বজায় রাখলেন?

যা। চিরকালই তাই করে আসছি; আমরা ত আর কোম্পানীর চাকর নই। কিন্তু দেখুন আপনি নিতান্ত অসভ্যের মত আমাকে মিথ্যাবাদী দাঁড় করাতে চেষ্টা করছেন—কিন্তু আর নয়!

হি। আর একটি কথা। ঠিক যে মুহূর্ত্তে নীরজার নৌক এলাহাবাদের ঘাটে এসে পৌঁছল—আপনিও ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কি করতে সেখানে এসেছিলেন তার কারণটা কি জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে?

যামিনী সজোরে বলিলেন—"কারণটা আপনার শ্রাদ্ধ করতে। মহাশয় আপনার সঙ্গে আর আমি বাক্যালাপ করতে চাইনে, আপনি অতি অসভ্য।"

হিরণকুমার সে কথায় ভ্রুক্ষেপ না করিয়া সন্ন্যাসীকে বলিলেন—"এঁর কথায় আপনার কি মনে হয়? সমস্ত ত শুনলেন। ভেবে দেখুন নীরজা ঘাটে আসছে না জানলে সেই বৃষ্টি বাদলে এঁর কি সেখানে তখন যাওয়া সম্ভব? আমার ত বিশ্বাস ইনিই দস্যু দিয়ে নীরজাকে হরণ ক'রে আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্যই সে রাত্রে কানপুর ছেড়েছিলেন।"

সন্ন্যাসীরও যামিনীকে দোষী বলিয়া মনে হইল, তিনি সক্রোধে বলিলেন—"আমার এখন মনে হচ্ছে এ কার্য্য তোমারি। এমন শঠ প্রবঞ্চক পাষণ্ডকে আমি কন্যাদানে মানস করছিলেম!"

হিরণকুমার বলিলেন "কি সর্ব্বনাশ! এঁকে কন্যাদান! তার চেয়ে

নীরজাকে জলে ফেলে দেওয়াও ত ভাল। কেন, মহাশয় আপনার কন্যার কি আর বর জোটে না? প্রমোদের সহস্র দোষ থাকলেও যামিনীর চেয়ে প্রমোদ সুপাত্র।"

হিরণের কথা শুনিয়া যামিনী মনে মনে গর্জ্জিতে লাগিলেন! তাঁহার চিত্ত দমন করিয়া রাখা কঠিন হইয়া উঠিল। সরোষে বলিয়া উঠিলেন,—

"কন্যাদান সম্বন্ধে তার পিতা যা ইচ্ছা স্থির করুন, কিন্তু মহাশয় কথা কবার কে?"

হিরণকুমার ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন "আচ্ছা, পিতাই কন্যার যথার্থ হিতাহিত বুঝুন।"

কথাবার্ত্তার পর সন্ন্যাসী রোষগম্ভীর-মৌন ভাবে সেইখান হইতে বিদায় লইয়া নীরজাকে আনিতে যামিনীনাথের সহিত তাহার বাটী যাত্রা করিলেন। সন্ন্যাসীকে একাকী পাইয়া যামিনীর যেন প্রাণে প্রাণ আসিল, রাস্তায় যাইতে যাইতে তিনি বলিলেন "মহাশয়, আপনি অন্যের কথায় আমাকে কি যথার্থই দোষী মনে করছেন?—আমার ব্যবহারে কি সত্যই একজন নীচমনা দস্যু বলেই আমাকে মনে হয়?"

সন্ন্যাসী কোন উত্তর করিলেন না, নীরবে গম্ভীর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন মাত্র।

যামিনী আশ্বস্ত হইয়া আবার বলিলেন, "কিন্তু আমার এই মিনতি, আপনি আমাকে দোষী স্থির করবার আগে আর একবার নীরজার সহিত কথা কয়ে দেখবেন।"

কথা কহিতে কহিতে তাঁহারা যামিনীর বাটীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। বাড়ী আসিয়া যামিনী সন্ন্যাসীর আদেশ অনুসারে নীরজাকে তাঁহার নিকট আনিয়া দিলেন। তিনি আজই কন্যাকে কানপুর

লইয়া যাইবেন এইরূপ সংকল্প প্রকাশ করিলেন। সন্ন্যাসী যামিনীনাথের প্রতি সন্দেহ করিতেছেন শুনিয়া নীরজা বলিল,—

"কেন বাবা, আপনি এমনতর মিথ্যা সন্দেহ করচেন, আমি শপথ করে বলতে পারি যামিনী বাবুর এতে কোন হাত নেই। হিরণকুমার নিশ্চয়ই যামিনীনাথের প্রতি অন্যায় দোষারোপ করছেন। সে কথায় বিশ্বাস ক'রে উপকারক ব্যক্তিকে দোষী করলে ঘোর পাপে পড়তে হবে; তা হ'লে আমিও আজীবন কষ্ট পাব। দস্যুরাই যে আমাকে হরণ করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতেই পারে না।"

কন্যার এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া সবলচেতা সন্ন্যাসীও আবার বিচলিত হইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা অতিবাহিত হইয়া গেল, কিন্তু পিতা কন্যা কথোপকথনে সব ভুলিয়া রহিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

দেবমন্দিরে রাক্ষস

নীরজাকে সন্ন্যাসীর নিকট আনিয়া দিয়া যামিনী অন্য গৃহে গিয়া বসিলেন। হিরণের কথাবার্ত্তা শুনিয়া অবধি রাগে তাঁহার শরীর কাঁপিতেছিল। প্রমোদের সহিত নীরজার বিবাহ! আপনি নীরজাকে না পাইলেও বরঞ্চ সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু নীরজা প্রমোদের হইবে ইহা তাঁহার অসহনীয়। যামিনী ইহার প্রতিকারের উপায় ভাবিতে ভাবিতে অন্য গৃহে আসিয়া বসিলেন। সকলরূপ বাধা অবহেলা করিয়া তিনি নীরজাকে এতদিন বিবাহ করেন নাই বলিয়া এখন অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

এইস্থলে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, নীরজাকে বিবাহ করিতে যামিনী যদি এতই উৎসুক তবে এতদিন তাহাদের বিবাহ না হইবার কারণ কি? কালবিলম্বে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে বিবেচনায়, নীরজাকে আপন অধীনে পাইয়াও যামিনী কেন বিবাহ করিলেন না? যামিনীর মতন লোকের বল-পূর্ব্বক বিবাহে কি আপত্তি হইতে পারে?

ইহার উত্তর, যামিনীর এ বিবাহে বিলক্ষণ বাধা পড়িয়াছিল। যামিনী যখন প্রথমে বিবাহের অভিপ্রায়ে নীরজাকে বাড়ী আনেন, তখন তিনি ভাবেন নাই যে তাঁহার ইচ্ছার উপর জ্যেঠাইমা কোন কথা কহিবেন। আর প্রথমে যদিই বা ইহাতে আপত্তি প্রকাশ করেন, যামিনী বুঝাইয়া বলিলেও যে তাঁহার সে আপত্তি দূর হইবে না, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। কিন্তু বাড়ী আনিয়া বিবাহের অভিপ্রায় প্রকাশ করিবামাত্র জ্যেঠাইমা খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। নীরজা অজ্ঞাতকুলশীলা, তাহার সহিত কখনও ভদ্র ঘরের ছেলের বিবাহ হইতে পারে! যামিনী বিশেষরূপ জেদ করাতে অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া বসিলেন, তাঁহার যে পাঁচ লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ আছে এ বিবাহ হইলে যামিনীকে কিছুই না দিয়া, যামিনীর ভগিনীকে তাহা দিয়া যাইবেন। এই কথায় যামিনী মুস্কিলে পড়িলেন। একদিকে ধন লোভ, অন্য দিকে নীরজার লোভ,—অবশেষে ধনলোভই জয়ী হইল। অতটা টাকার মায়া তিনি সহজে ছাড়িতে পারিলেন না। কিন্তু নীরজার আশা যে ইহাতে তিনি একেবারেই ছাড়িলেন, তাহাও নহে—আপাততঃ বৃদ্ধা যত দিন বাঁচিয়া থাকেন ততদিন মাত্র বিবাহ বন্ধ রাখিতে স্থির করিলেন। বৃদ্ধা পীড়িতা বড় জোর আর এক বৎসর বাঁচিতে পারেন—এই অল্প দিনের জন্য অগত্যা নীরজাকে পাইবার লোভ সম্বরণ করিয়া থাকিতে বাধ্য হইলেন।

আর এক কথা, নীরজাও এখন বিবাহে সম্মত নহে। জোর

করিয়া বিবাহ করিতে গেলে যে কেবলমাত্র তাঁহার ধনক্ষতি হয় তাহা নহে, নীরজার ভালবাসা, নীরজার ভক্তিশ্রদ্ধাও তাহা হইলে হারাইতে হয়। যামিনী ভিতরে যাহাই হউন না কেন, বাহিরে লোকের নিকট সাধু সচ্চরিত্র বলিয়া পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখিতেন; তিনি অত্যন্ত প্রশংসা-প্রিয় ছিলেন, নিন্দা সহ্য করিতে পারিতেন না। এমন কি, প্রশংসার জন্য তিনি লাভের অংশও কিছু পরিমাণে ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। নীরজা তাঁহাকে ভাললোক জানিয়া অতিশয় ভক্তি করিত, এখন বলপূর্ব্বক বিবাহ করিলে ধনক্ষতিও হইবে সঙ্গে সঙ্গে নীরজার ভক্তিও হারাইবেন। একেবারে এতটা ক্ষতি স্বীকার করিতে যামিনীনাথ প্রস্তুত ছিলেন না। ভাবিলেন আর কিছু দিনে যদি সকল দিকে সুবিধা হয়,—যদি ধনলাভও হয় এবং বালিকা আপনা হইতেই বিবাহ করে—তো অল্প দিন ধৈর্য্য ধরাই ভাল।

কিন্তু বিবাহ স্থগিত রাখিয়াছেন বলিয়া এখন তাঁহার অনুতাপ হইতে লাগিল। কেন না ভাগ্য সহসা তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন। অনেক দিন ধরিয়া আর তাঁহাকে জ্যেঠাইমার মৃত্যুকামনাজনিত পাপ সঞ্চয় করিতে হইল না। সম্প্রতি তিনি কালাশৌচ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সমস্ত বাধার অবসানে যখন নীরজাকে বিবাহ করিবেন এই আশায় সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছেন তখনই সে আশায় তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইল। আশাহত ঈর্ষাদগ্ধ 'মরিয়া'র মত তিনি এই গৃহে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে একজন দ্বারবানকে ডাকিতে লাগিলেন। দ্বারবান আসিয়া যামিনীর আজ্ঞা শুনিয়া চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে অন্য একজন লোক গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল। যামিনীনাথ অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন, কথা সমাপ্তে সে ব্যক্তি বলিল—

"কসুর মাপ করবেন, এ কাজ এ অধীন হতে হবে না।" যামিনীনাথের বঙ্কিম নাসাগ্রভাগ রক্তিম বর্ণ হইল, কুটিল ভ্রূযুগল কুঞ্চিত

করিয়া তিনি বলিলেন—"তোমার যেমন অভিরুচি। কিন্তু লাভ লোক্‌সানটা ভাব্‌ছ কি?"

সে বলিল "এতদিন ধরে, লাভ লোকসান ভেবে কাজ কর্‌লাম, কিন্তু হিসাব কিতেব ত তার কিছুই বুঝলাম না, এখন ভগবানের হাতে সে ভার, তিনি যা করেন।" তাহাকে অটল দেখিয়া যামিনী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"আচ্ছা ভগবানই তবে তোমাকে রক্ষা করুন।" ইহার পর আর কোন উত্তর না দিয়া সে ব্যক্তি চলিয়া গেল, তখন যামিনী তাঁহার অন্য একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কি কথা কহিতে লাগিলেন। সেও যখন চলিয়া গেল তখন তিনি আপনমনে একাকী বসিয়া চিন্তা-নিমগ্ন হইলেন। পূর্ব্বদিকে দুই একটি তারা ফুটিল, গৃহ হইতে পূর্ব্বাকাশের এক প্রান্ত দেখা যাইতেছিল, যামিনী সেই দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন। এই সময় সন্ন্যাসী যামিনীর সহিত বিদায় লইতে আসিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন "যামিনীনাথ আমি ত নীরজাকে নিয়ে চল্লেম, নীরজার কথা বিশ্বাস করতে হ'লে তুমিই তার মুক্তিদাতা। ভগবান জানেন তুমি দোষী কি নির্দ্দোষ কিন্তু—"

যা। মহাশয়, আমার একটি মিনতি শুনুন, আমি যে নীরজাকে উদ্ধার করেছি তা আপনি ভুলে যান, নীরজাকেও সে কথা ভুলতে শেখান, কিন্তু—

বলিতে বলিতে সন্ন্যাসীর চরণ ধরিয়া বলিলেন, "কিন্তু বিনা অপরাধে আমাকে অপরাধী মনে করবেন না।"

স। কি কর, যামিনীনাথ ওঠ ওঠ।

যা। মহাশয়, কূট তর্কে যদি সকল সপ্রমাণ হ'ত, তা হ'লে দেখুন দেখি যার পর নাই ঈশ্বরের স্বরূপ পর্য্যন্ত নিয়ে এত গোল হবে কেন? পাষণ্ড চার্ব্বাকেরা কি না বলছে? আপনিও তো শাস্ত্রজ্ঞ বিজ্ঞ পুরুষ, আপনাকে আর অধিক কি বলব!

স। না, আমি তোমাকে অপরাধী বলে মনে করতে পারছিনে। নীরজাকে তোমার একতারের মধ্যে পেয়েও তাকে নিজের ভগিনীর মত যেরূপ সম্মানসহকারে রক্ষা করেছ সেজন্য আমি বরঞ্চ তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা অনুভব করছি—কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তোমাকেই কন্যা দান করব।

এই সময় নীরজাকে অন্তঃপুর হইতে গৃহাগত হইতে দেখিয়া তাঁহারা নিস্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। নীরজা তাহার হাতের কাকাতুয়াটী দেখাইয়া বলিল "বাবা আমি আমার কাকাতুয়াটিকেও নিয়ে এসেছি।" সন্ন্যাসী বলিলেন "চল তাহ'লে এইবার যাওয়া যাক; ষ্টেশনে যেতেও ত অনেকটা সময় লাগবে।" যামিনীর ঘরের গাড়ী প্রস্তুত ছিল, তাঁহারা তিন জনে গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। যাইবার সময় যামিনী গোপনে দ্বারবানকে বলিয়া গেলেন "পাঠানকে শীঘ্র ফিরিয়ে আন, যে কাজে তাকে পাঠিয়েছি তার আর দরকার নেই, শীঘ্র যাও।" আদেশ দিয়া যামিনী তাঁহাদিগকে রেল গাড়ীতে তুলিয়া দিতে গেলেন। বাড়ী ফিরিয়া আসিবা মাত্র দ্বারবান খবর দিল "পাঠানকে খুঁজে পাওয়া গেল না।"

বিংশ পরিচ্ছেদ

গুপ্ত শত্রু

সেই দিন সন্ধ্যাকালে প্রমোদ পদব্রজে যামিনীনাথের বাটী-অভিমুখে আসিতেছিলেন। ক্রমে চৌরঙ্গির দীপমালাশোভিত পথ ছাড়িয়া

ভবানীপুরে পদার্পণ করিলেন ;* গির্জ্জার ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া আটটারও ঘণ্টা পড়িল।

রজনী দীপমালায় উজ্জ্বলিত নহে, রাজপথ অধিকাংশই গলি ঘুঁজি, গলির সুদূর মোড়ে মোড়ে এক একটি অনুজ্জ্বল তৈলদীপ গলিপথে বৃহৎ ছায়া বিস্তার করিয়া মিটি মিটি জ্বলিতেছে। পথিপার্শ্বের বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাবলী, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরশ্রেণী সমভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন ; কেবল আকাশে কৃষ্ণবর্ণ মেঘে নক্ষত্র হাসিতেছে, নীচে যত্রতত্র দুই একটি খদ্যোৎ জ্বলিতেছে, এবং অট্টালিকা-শ্রেণীর মুক্ত বাতায়ন-পথে এবং কুটীর দ্বার দিয়া গৃহমধ্যস্থ আলোকরেখা দৃষ্ট হইতেছে। সেই অন্ধকার পথে কখনও দুই একটি গ্রাম্য কুক্কুর চীৎকার করিয়া প্রমোদের পথপার্শ্ব দিয়া দৌড়িয়া যাইতেছিল, কখনও বা মাথার উপর দিয়া কোন নিশাচর পক্ষী কর্কশ রবে ক্ষণকালের জন্য চিন্তামগ্ন প্রমোদের চিন্তা ভঙ্গ করিয়া উড়িয়া চলিয়াছিল। পথে মাঝে মাঝে দুই একটি লোক চলিতেছিল, অন্ধকারে তাহা-দিগকে স্পষ্ট চেনা যায় না, প্রমোদও চিনিতে বড় একটা উৎসুক ছিলেন না। তিনি সেই অন্ধকারময়ী স্নিগ্ধ রজনীতে কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন মনেই চলিতেছিলেন। সহসা তাঁহার চিন্তা ভঙ্গ হইল, পিস্তলের শব্দে চমকিত হইয়া তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, অমনি দুইজন মনুষ্য তাঁহার পশ্চাৎ হইতে দৌড়িয়া চলিয়া গেল। তাহাতে তাঁহার স্পষ্ট মনে হইল, যে পলাতকেরা তাঁহারই প্রতি যেন পিস্তল লক্ষ্য করিয়াছিল। তাহারা কোথায় গেল অন্ধকারে ঠিক বুঝা গেল না, কিন্তু বোধ হইল, একটা অট্টালিকাপ্রাচীরে তাহারা

* ছিন্নমুকুল ৩০ বৎসরও পূর্ব্বেকার লেখা। তখন ভবানীপুর এখনকার মত সুবিস্তৃত রাজপথসমূহে বা এমন দীপস্তম্ভাবলীতে সুশোভিত ছিল না।

যেন মিশিয়া গেল। তিনি "চৌকিদার, চৌকিদার" করিয়া হাঁকিয়া উঠিলেন।

চৌকিদার তখন মোড়ের মাথায় একটা রেল ঠেসান দিয়া সার্জ্জন সাহেবের উগ্রমূর্ত্তি স্বপ্নে দেখিতেছিলেন; প্রমোদ আসিয়া তাহাকে ধাক্কা মারাতে সে ত্রস্তে উঠিয়াই দীর্ঘ সেলাম ঠুকিয়া চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে বীর-বিক্রমে লাঠি বাগাইয়া ধরিল। প্রমোদ বলিলেন "দেখতা নেই কোন্ হাম্‌কো মার্‌নেকো ওয়াস্তে পিস্তল চালায়া, অওর তোম হিঁয়া নিঁদ্ যাতা!"

চৌকিদার তখন সদর্পে বলিল "নেই বাবু সাব, ও কোই লেড়কা পট্‌কা চালাতা, কুচ ডর নেই।"

প্র। নেই, নেই, ও পিস্তলকা আওয়াজ হাম শুনা,—আবি জলদি হামারা সাথ আও, পিস্তলওয়ালা ভাগকে ও বড়া কোঠিকা অন্দর ঘুস গিয়া হোগা, জলদি হামারা সাথ আও।

চৌ। চলিয়ে সাব, লেকেন ও কোঠিকা ভিতর এক,—আল্লা! আল্লা!—আপতো চলিয়ে।

"জলদি হামারা সাথ আও"—বলিয়া প্রমোদ ঊর্দ্ধ-মুখে ছুটিলেন, চৌকিদারও চলিল, কিন্তু "কোন হ্যায় রে, কোন হ্যায় রে," করিতে করিতে দিঙ্মণ্ডল ফাটাইয়া দিয়া মৃদুপদে প্রমোদের পশ্চাৎবর্ত্তী হইল।

যে প্রাচীরের কাছে পলাতকেরা মিশাইয়া গিয়াছিল, প্রমোদ সেই স্থানে দৌড়িয়া আসিয়া দেখিলেন সে স্থানটি অট্টালিকার পশ্চাদ্‌ভাগ। সেখানে আসিয়া প্রমোদ কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু তখনই আবার পিস্তলের শব্দ হইল, তখনই কিছু দূরে আবার দুই ব্যক্তিকে ছুটিয়া পলাইতে দেখিলেন। পিস্তলের গুলি ভাগ্যবশতঃ তাঁহার অর্দ্ধহস্ত পশ্চাৎ দিয়া গিয়া সজোরে সেই প্রাচীরগাত্রে লাগিল। পিস্তল যে তাঁহার উদ্দেশ্যেই ছোড়া হইতেছে, এখন আর তাহাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ

রহিল না। প্রমোদ আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত ভাবে মুহূর্ত্তকাল দাঁড়াইয়া আবার তাহাদের অনুসরণে চলিলেন। ইতস্ততঃ চাহিয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না, আবার সেই অট্টালিকার পশ্চাদ্‌ভাগে আসিয়া অন্বেষণ করিলেন, এবারেও সেখানে কাহাকেও না পাইয়া তিনি ঘুরিয়া অট্টালিকার সদর-দ্বারে আসিলেন। সেখানে আসিয়া দেখিলেন, ভিতরে আলোক জ্বলিতেছে, কিন্তু দ্বার বন্ধ। তাঁহার ঠেলাঠেলিতে একজন উড়িষ্যাবাসী দ্বার খুলিয়া বলিল, "বাবু কেরেয়া লইব, ৫০ মুদ্রা।" প্রমোদ উক্ত ছুতায় বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, ভৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাড়ীময় ঘুরিয়া বেড়াইয়া অবশেষে কাহাকেও না দেখিয়া "কোঠি কুচ কামকা নেহি," এই বাক্যে তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। চলিতে চলিতে পথে কিছু দূরে আসিয়া দেখিলেন একব্যক্তি পিস্তল হস্তে ত্রস্তে একটা গলির মধ্যে ঢুকিল। যাইবার সময় দীপালোক মুখে পড়ায় প্রমোদ হিরণকুমারকে চিনিতে পারিলেন। চিনিয়া চমকিয়া উঠিলেন! একি! হিরণ পিস্তল হস্তে এমন অপ্রকৃতিস্থ ব্যস্তভাবে দ্রুতপদে গলির মধ্যে লুকাইল! হিরণ কি প্রমোদকে মারিতে চেষ্টা করিয়াছিল? অবস্থার ইন্দ্রজালে চকিতের মত প্রমোদের মনে এই সন্দেহ প্রবেশ করিল, কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তার অবসর পাইয়া তিনি ভাবিলেন—"কিন্তু তাহা কি করিয়া হইবে? হিরণ আমাকে মারিতে যাইবে কেন? আমি তাহার কি শত্রুতা করিয়াছি? আমাকে মারিয়া তাহার কি লাভ? আমি জানি হিরণ আমাকে দেখিতে পারে না,—আমি জানি সেই জন্যই আমাকে মকদ্দামায় অন্যায় দণ্ড দিয়াছে কিন্তু তাই বলিয়া সে যে আমার প্রাণবধ করিতে যাইবে ইহা অসম্ভব। আমিও ত তাহাকে দেখিতে পারি না, দেখিলেই সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়, কিন্তু সে জন্য প্রাণবধ ইচ্ছা ত দূরের কথা—তাহার কোন অনিষ্ট চিন্তাও কি আমার মনে

আসে? না না—ইহা হইতেই পারে না, এরূপ অন্যায় সন্দেহকে মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয়ে পোষণ করা উচিত নহে। তাহার পিস্তল হস্তে থাকিবার সহস্র কারণ থাকিতে পারে। এমনও হইতে পারে যে, যে ব্যক্তি পিস্তল ছুড়িয়াছিল তাহারই হাত হইতে হিরণ পিস্তল কাড়িয়া লইয়াছে। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? এত শীঘ্র কাড়িবার সময় কোথা? যখনই আমার প্রতি পিস্তল ছুঁড়িতে দেখিলাম তখনি প্রায় হিরণ খুনীর মত ব্যস্তত্রস্তভাবে গলিতে লুকাইল। অবস্থাটা খুবই সন্দেহ জনক!"

এইখানে প্রমোদ ভুল করিলেন; মধ্যের অপেক্ষাকৃত মন্দ গতি সময়কে তাঁহার মনের দ্রুতগতির সহিত মিশাইয়া ফেলিলেন।

ভাবিতে ভাবিতে প্রমোদ যামিনীনাথের বাড়ীর দিকে চলিলেন। "তিনি কখন কাহার কি এমন অনিষ্ট করিয়াছেন যে সে তাঁহার বধ সংকল্প করিবে, তাঁহার এমন কে গুপ্ত শত্রু আছে যে এই উদ্দেশ্যে এই রাত্রে তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল! একজন ছোটলোক হইলে বুঝিতেন, ঘড়িচেন লইবার জন্য তাঁহাকে মারিতে গিয়াছিল কিন্তু হিরণের সে উদ্দেশ্য হইতে পারে না, অন্য উদ্দেশ্য কল্পনা করাও অসম্ভব। তবে কেন সে তাঁহাকে মারিতে যাইবে।" এইরূপ বিস্ময়আলোড়িত সন্দিগ্ধ চিত্তে তিনি যামিনীর বাটীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ব্যগ্র ভাবে যামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—

"একি, তুমি এখন! এত রাত্রে!" তখন প্রমোদ পথের সমস্ত বিবরণ বলিলেন। যামিনী শুনিয়া কহিলেন "কি ভয়ানক!"

হঠাৎ যামিনীর মনে আর একটি অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার ভাব উদয় হইল, তিনি এই সময় এক বাণে দুইটি পাখী মারিতে সংকল্প করিলেন। পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদের ঘটনা হইতে যামিনী হিরণের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, হিরণই সন্ন্যাসীর নিকট তাঁহাকে দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন

করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, হিরণই যামিনীর সহিত নীরজার বিবাহে বাধা দিয়া প্রমোদের পক্ষ লইয়াছিলেন। যামিনী প্রতিশোধ লইবার উত্তম সুযোগ বুঝিয়া প্রমোদের কথায় লাফাইয়া উঠিয়া বিস্ফারিত নেত্রে বলিয়া উঠিলেন—

"হিরণকে তুমি পিস্তল হাতে গলিতে ঢুকতে দেখলে—বটে! এখন আসল ব্যাপারটা আমার চক্ষের সামনে খুলে গেল, আমি সব বুঝতে পারছি।"

প্রমোদ সবিস্ময়ে বলিলেন—

"কি? তোমার কথাতো আমি কিছুই বুঝতে পারচিনে, তোমারও কি আমার মত হঠাৎ সন্দেহ হচ্ছে নাকি?"

যা। সন্দেহ নয় ঠিকই, আর কোন ভুল নেই; সেই পাষণ্ডেরই এই কাজ।

প্রমোদ আবার বলিলেন "কি কাজ? আমাকে মারতে যাওয়া? কিন্তু—যার কারণ নেই —"

যা। কারণ নেই? এই জঘন্য ঘাতকের কাজ তারি।

প্রমোদ তখন শিহরিয়া বলিলেন "হিরণকে আমি যতই ঘৃণা করি না কেন, তাকে এরূপ কার্য্যে পারগ মনে করতে পারি নে, বিশেষতঃ তাতে তার লাভ কি? হঠাৎ তাকে দোষী মনে হয় বটে, কিন্তু সে সুধু ক্ষণিকের সন্দেহ মাত্র। অসম্ভব, এক জন ভদ্র লোকের পক্ষে এ কাজ অসম্ভব, বিশেষতঃ অকারণে।"

যা। তুমি জাননা তাই এ কথা বলছ। তুমি জান, হিরণ সন্ন্যাসীর সম্পর্কীয় ব্যক্তি?

প্র। না।

যা। নীরজাকে নিয়ে যাবার সময় সন্ন্যাসী হিরণকে সঙ্গে আনেন, সেই সময় কথায় কথায় দেখলেম হিরণ তোমাকেদূর কত ঘৃণা করে।"

প্রমোদ একটি ছোট খাট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "সন্ন্যাসী তবে নীরজাকে নিয়ে গেছেন ?"

যা। হ্যাঁ! আমি এইমাত্র তাঁদের গাড়ীতে চড়িয়ে আসছি।

প্র। তার পর ?

যা। হিরণের সাক্ষাতে সন্ন্যাসী তোমার প্রশংসা করছিলেন—তোমাকে জামাতা করবেন এইরূপ অভিপ্রায় জানাচ্ছিলেন—তাতে অবশ্য আমি বল্লেম—'হ্যাঁ, প্রমোদ সর্ব্বপ্রকারেই নীরজার উপযুক্ত।' এই কথায় হিরণ ভয়ানক চটে উঠে তোমার চরিত্রের উপর কত কি যে অপবাদ দিতে লাগল সে আর কি বলব। আমিও তাতে রেগে গেলুম—আমাদের দুজনের হাতাহাতি হবার উপক্রম, শেষে গোলযোগ দেখে হিরণ চলে গেল। তখন এর মানে বোঝা বুঝতে পারিনি, তার পর সন্ন্যাসীর মুখে শুনলেম হিরণ নীরজাকে বিবাহ করতে চায়। তুমি কি বুঝছ না, কণ্টক বিবেচনায় তোমাকে সে পথ থেকে সরাতে যাচ্ছিল ?

প্রমোদ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। এখন কারণ পাইয়া তাঁহারও হিরণকে দোষী বলিয়া মনে হইল। অকারণে অন্য কেহ তাঁহার প্রাণবধের চেষ্টা করিবে তাহা আর মনে করিতে পারিলেন না। তিনি হিরণকে সম্পূর্ণ দোষী ভাবিয়া বলিলেন "Scoundrel! তার তো আমি কোন অনিষ্টই করি নি; কিন্তু সে ছোট বেলা থেকে আমার শত্রুতায় ব্রতী হয়েছে।"

যামিনী বলিলেন—

"আমার তো রাগে শরীর কাঁপছে, কি করে পাষণ্ডকে শাস্তি দেওয়া যায় ? খুনের দাবিতে তার নামে নালিশ কর।"

এই কথায় প্রমোদ ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিলেন "এ কথা নিয়ে নালিশ করতে গেলে আমার নিজেকেই ছোট করা হবে, তা আমি করব না।"

যামিনী অনেক বলিয়া কহিয়াও ইহাতে তাহাকে রাজি করাইতে পারিলেন না, যামিনীনাথের বিশেষ পীড়াপীড়িতে শেষে প্রমোদ বলিলেন—

"হিরণের বিরুদ্ধে তো তেমন প্রমাণ কিছুই নেই, কি বলেই বা নালিশ করব? তার হাতে পিস্তল দেখেছি এই যা বলবার কথা, তা তো সে অস্বীকার করতে পাবে।"

যা। প্রমাণ বিশেষ না থাকলে শাস্তি না হতে পারে, কিন্তু খুনের দাবীতে তাকে কোর্টে যেতে হলেই ত বিলক্ষণ অপমান।"

প্রমোদ বলিলেন "না তাতে আর কাজ নেই। তাতে তারও অপমান আমারো। বিশেষ আমি যদি হেরে যাই তাহলে মহা লজ্জার কথা। হিরণকে চিনে রইলুম এই যথেষ্ট।"

কোনমতে না পারিয়া অগত্যা যামিনী সে চেষ্টা হইতে ক্ষান্ত হইলেন। তখন ক্রমে অন্যান্য কথা আসিয়া পড়িল। প্রমোদের মনের ইচ্ছা নীরজার কথা পাড়েন, কিন্তু সে কথা কহিতে গেলেই আপনা হইতে যেন মুখ বন্ধ হইয়া যায়, লজ্জা সঙ্কোচ আদি কত কি ভাব আসিয়া তাঁহার ইচ্ছার উপর আধিপত্য করে। নীরজার সহিত দেখা করিবার অভিপ্রায়ে ইতিমধ্যে তিনি আর একদিন সন্ধ্যাকালে এখানে আসিয়াছিলেন কিন্তু যামিনী গৃহে না থাকায় তাঁহাকে হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হয়। সে কথাও প্রমোদ যামিনীর নিকট তুলিতে পারিলেন না। আসল কথা তাহার অন্তরাত্মা তাঁহার মনের নিভৃত বিজনে গোপনে বলিতেছিল— "যামিনী নীরজাকে উদ্ধার করিয়াছে—নীরজা যামিনীরই প্রাপ্য—তাহাতে তোমার কোন অধিকারই নাই, তাহাকে যদি ভালবাস ত মনে মনে নীরবে ভালবাস—সে কথা প্রকাশ করিও না।" কিছুক্ষণ পরে প্রমোদ কহিলেন—

"সন্ন্যাসীর যে আমাদের উপরে আর সন্দেহ নেই তাতে আমার মনের একটা মস্ত বোঝা নেমে গেছে।"

যামিনী তাঁহাকে যে সংবাদ দিবার অবসর খুঁজিতেছিলেন এই কথায় তাহার সুযোগ বুঝিয়া বলিলেন—

"হাঁ, ভাই তোমাকে এতক্ষণ একটা কথা বলা হয় নি। সন্ন্যাসী আমার প্রত্যুপকার স্বরূপ নীরজাকে সমর্পণ করছেন। আমি তাঁকে যদিও বল্লেম, নীরজার আমি যোগ্যপাত্র নই, প্রমোদই তার যোগ্যপাত্র তবু তিনি আমাকেই জামাতা করবেন স্থির করেছেন।"

শুনিয়া প্রমোদের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, কথাটি তীক্ষ্ণ শেলস্বরূপ তাঁহাকে বিদ্ধ করিল। কিন্তু তিনি আপনাকে সামলাইয়া লইতে চেষ্টা করিলেন, ভাবিলেন যামিনী নীরজার স্বামী হইবে ইহাতো সৌভাগ্যের কথা, প্রমোদ যদি নীরজাকে যথার্থ ভাল বাসেন, ইহাতে তাঁহার আনন্দ হওয়াই উচিত। এইরূপে মনকে যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, যতই কষ্ট হউক, ভবিষ্যতে তিনি আপনার স্বার্থময় ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া নীরজার সুখেই সুখী হইতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু বুদ্ধি এবং আকাঙ্ক্ষা দুইটি স্বতন্ত্র বস্তু, প্রায় স্থলেই ইহাদের বিরোধ ঘটে,—এবং উভয়ের তাড়নায় হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠে। ঐ কথা শুনিবার পর হইতে প্রমোদ কেমন নিস্তব্ধ হইয়া পড়িলেন, কেমন অন্যমনস্ক, কেমন নির্জীবভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন; সহস্র চেষ্টা করিয়াও আর আগের মত কথা কহিতে সক্ষম হইলেন না। এক দিকে মনকে বুঝাইবার ইচ্ছা, অপর দিকে হৃদয়ের সহস্র উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ বহিতে লাগিল। প্রমোদের চক্ষে গভীর চিন্তার ভাব, অথচ অধরে কষ্টনিঃসৃত শুষ্ক হাসির নিরুজ্জ্বল আভাস। যদিও তিনি হৃদয়ের ভাব ঢাকিতে বলপূর্ব্বক হাসিতেছেন, কিন্তু অনিচ্ছার সেই মৌখিক হাসিতে তাঁহার বিষাদভাব দ্বিগুণ প্রকাশিত হইতেছিল।

অনেক চেষ্টাতেও কোন মতেই তাঁহার সে মৌন ভাব ঘুচিল না, তখন তিনি আর বেশী ক্ষণ সেখানে না থাকিয়া বাটী যাইবার জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বাহিরে আসিয়া প্রমোদ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার চক্ষে পৃথিবী আকাশ সকলই শূন্য বোধ হইতে লাগিল। পৃথিবীতে যেন লোক নাই, বৃক্ষ নাই, আলো নাই, আকাশে যেন চাঁদ নাই, তারা নাই, মেঘ নাই—স্বর্গমর্ত্ত্য সকলই যেন শূন্যময় অন্ধকার। প্রমোদ এবার বহির্জ্জগৎ হইতে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ খুঁজিয়া দেখিলেন, দেখিলেন হৃদয়ের মধ্যেও সেই শূন্যময় অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নাই।

ইহারই তিন চারি দিন পরে কনকের এক পত্রে প্রমোদ অবগত হইলেন সুশীলা সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত। শুনিয়া প্রমোদ সেই রাত্রেই রেলগাড়ীতে এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন। গাড়ীতে যামিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার কাছে শুনিলেন সন্ন্যাসী যামিনীকে কানপুরে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি যামিনীকে দুই এক দিনের জন্য এলাহাবাদে থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। নীরজাকে নিশ্চয় লাভ করিবেন জানিয়া এখন যামিনীরও আর সে বিষয়ে তত ব্যগ্রতা ছিল না। তিনি প্রমোদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বিভীষিকা

সুশীলার পীড়ার অগ্রে যে একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা এই পরিচ্ছেদে বলিতেছি। কনকের শাস্তির ১২ দিন এখনও ফুরায়

নাই। রাত্রি অন্ধকার, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে এবং মাঝে মাঝে মেঘের গর্জ্জন পৃথিবীকে কাঁপাইয়া তুলিতেছে। এই সময় দীপশূন্য একটি অন্ধকার কক্ষে, বালিকা কনক একাকী শুইয়াছিল। সহসা বজ্রের কড়মড় শব্দে কনক চমকিয়া উঠিল। অন্ধকারে ভীত হইয়া উঠিয়া বসিল, আলোক পাইবার নিমিত্ত বিছানা হইতে হাত বাড়াইয়া কক্ষের একটি বাতায়ন খুলিয়া দিল। অমনি সহসা সুমধুর সঙ্গীত ধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, শুনিল—

"রিমঝিম ঘন বরিষে—সখিলো,
বিরহী নয়ন পারা, ঢালিছে শ্রাবণ ধারা,
কি জ্বলে মরমে জ্বালা, নিভাই কেমনে সে,
গুরু গুরু গর্জ্জনে গর্জ্জে নবীন ঘন,
দলকে দামিনী বিকাশে।"

এই সময় আর একবার বজ্রের কড়মড় শব্দ হইল, গান থামিয়া গেল, অমনই সুশীলা এই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঝড় বৃষ্টির প্রারম্ভে কনক একাকী আছে বলিয়া তাঁহার কষ্ট হইতেছিল। কিন্তু তিনি মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিয়াছিলেন যে কনকের দোষেই তো তাহাকে এইরূপ একাকী থাকিতে হইতেছে—তিনি কি করিবেন? পরে, যখন একবার বজ্রধ্বনিতে বাড়ী কাঁপিয়া উঠিল, সুশীলার চক্ষু ঝলসিত করিয়া কনকের কক্ষের সম্মুখস্থ একটী বৃক্ষ বজ্রাগ্নিতে জ্বলিয়া উঠিল, তখন সুশীলার মনের পাষাণ বাঁধ অকস্মাৎ আমূল টুটিয়া পড়িল। সুশীলার ভয় হইল, কনকের কক্ষে তাহা হয়তো পড়িয়াছে। তিনি ব্যাকুল ভাবে সেই গৃহের দিকে ছুটিলেন, মনে হইল তিনি কনকের হত্যাকারী, তাঁহার নিমিত্তই বজ্রাঘাতে কনকের মৃত্যু হইল। বারাণ্ডা দিয়া আসিতে আসিতে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন, যেন সেই বজ্র বৃষ্টি বিদ্যুতের মধ্যে কনকের মাতা দাঁড়াইয়া বলিতেছেন "তুমিই আজ

কনককে মারিয়া ফেলিলে, তোমার কঠোরতাতেই তাহার জীবন বিনষ্ট হইল।" সুশীলা তখন সে দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া "কনক, কনক" করিয়া ছুটিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কনক শয্যায় উপবিষ্ট। তাহাকে জীবিত দেখিয়া তিনি যেন পুনরায় জীবন প্রাপ্ত হইলেন, সকল দোষ ভুলিয়া গিয়া সহর্ষে বালিকার মুখচুম্বন করিলেন। এই সময় আবার গীতধ্বনি উথলিয়া তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল—

"বুঝি গো সে এলনা"—

গানটী শুনিবার জন্য সুশীলা কাণ পাতিলেন, কিন্তু গান এইখানেই থামিয়া গেল। কে গান গাহিতেছে দেখিবার জন্য তিনি বাতায়নে দাঁড়াইলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল সম্মুখস্থ জাহ্নবী-নদীর তরঙ্গ উচ্ছ্বাস সে অন্ধকারের মধ্যেও তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত হইল। তীরে মনুষ্যের চিহ্নও দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু মনে হইল প্রাচীরের নিকট হইতে গীত-ধ্বনি উঠিতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া আবার কে গাহিয়া উঠিল—

"চির দিন চির নিশি, জাগরণে গেছে মিশি
তাহারি বিরহ মাঝে ধরিয়া আশার কণা"!

গান শুনিয়া সুশীলার মাথা ঘুরিয়া আসিল, তাঁহার কত কথাই মনে পড়িতে লাগিল, সেই বালিকাজীবন, বাল্যের সুখ দুঃখ সমস্তই মনে উদয় হইল। সুশীলা আশ্চর্য্য হইয়া নিস্পন্দে আবার সেই গানটির শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। কেহই আর গাহিল না,—কিন্তু সেই প্রাচীরের অভিমুখে একজন লোককে তিনি আসিতে দেখিলেন। ক্রমে সে নিকটে আগমন করিল। এই সময় বিদ্যুতালোকে সেই ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে পাইল, সুশীলাও তাহাকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদের পরস্পর নয়নে নয়নে সংলগ্ন হইল, অমনি সুশীলা মূর্চ্ছিত হইয়া বাত্যাহত বৃক্ষের ন্যায় ভূমিশায়িত হইলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

দোষী নির্দোষ

সেই মূর্চ্ছার পর হইতে সুশীলার জ্বর আরম্ভ হইল। বাল্যকাল হইতে শোক পাইয়া পাইয়া সুশীলার শরীরে আর কিছুই ছিল না, তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তিনি এক প্রকার চিররুগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। অথচ তিনি মরিলে প্রমোদ ও কনককে দেখিবার কেহই নাই ভাবিয়া এতদিন অতি যত্নে জীবন-রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন মাত্র। কিন্তু শরীরের উপর আর তাঁহার আধিপত্য চলিল না।

কনকের কষ্টের সীমা নাই। তাহার আহার নিদ্রা প্রায় রহিত হইয়াছে। সারাদিন কনক তাঁহার সেবা করে; তাহার যত্ন দেখিয়া সুশীলা আশ্চর্য্য হইয়া ভাবেন "কনক চোর, কনক মিথ্যাবাদী, কনকের ঈশ্বরে মন নাই, তবে কনক দেবীর ন্যায় যত্ন শিখিল কোথায়? এরূপ ভালবাসা, এরূপ সেবা ত অমানুষিক গুণ। যখনই কনকের বিষাদময়ী দেবী-প্রতিমার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়ে, তিনি মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকেই চাহিয়া থাকেন—তাহার সেই আলুলায়িত কুন্তলজালে বেষ্টিত সরলসুন্দর মুখকান্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া থাকেন।

"কি ভয়ানক! এই দেবী মূর্ত্তির প্রশান্ত অমায়িকতা দেখিলে ইহার ভিতরে যে দোষ থাকিতে পারে, তাহা কে বিশ্বাস করিবে? ইহাতে যদি দোষ থাকে, তবে বুঝি পৃথিবীতে কিছুই নির্দোষ নাই তবে বুঝি পৃথিবীতে কাহাকেও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।" এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে সুশীলার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা পড়িয়া বালিস ভিজিয়া যায়। বালিকা কনক যথার্থ কারণ বুঝিতে না পারিয়া

পীড়ার কষ্টে অশ্রুজল পড়িতেছে ভাবিয়া ব্যাকুল-চিত্তে কিসে সুশীলার কষ্ট নিবারণ করিবে খুঁজিয়া পায় না।

এইরূপে দিন যাইতে লাগিল। প্রমোদকে কনক পীড়ার কথা টেলিগ্রামে সংবাদ দিল। প্রমোদ যামিনীনাথের সহিত একত্রে বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া সুশীলা আহ্লাদিত হইয়া একথা সে কথা কহিয়া কিছু পরে বলিলেন—

"তুমি এলে ভাল হোল, মরবার আগে তোমাকে কতকগুলি কথা বলব।"

কনক এ সময় সে গৃহে ছিল না, কোন কার্য্য বশতঃ সে কিছু পূর্ব্বেই অন্য গৃহে গিয়াছিল।

সুশীলার কথায় প্রমোদ সজল নেত্রে বলিলেন "ও কি কথা, ও কথা বলবেন না।"

সু। "না, আমি এবার বাঁচব না, আমার দিন ফুরিয়েছে। আমাকে সকলে ডাকছেন, সে দিন রাত্রে দিদিকে যেন দেখলেম, তারপর, তারপর,—"

বলিতে বলিতে তাঁহার কথা বাধিয়া গেল, সেই রাত্রির ঘটনা মনে করিয়া সুশীলা শিহরিয়া উঠিলেন, যেন সেইরূপ ঘনঘোর মেঘবৃষ্টির মধ্যে সহসা বিদ্যুতালোক হইল, তিনি আবার যেন তাহার মধ্যে সেই মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। সুশীলা বলিয়া উঠিলেন, "ঐ দেখ আমি প্রত্যক্ষ দেখছি"—বলিতে বলিতে ক্রমে তাঁহার ভয় দূর হইয়া গেল, আনন্দচিহ্ন তাঁহার মুখে বিভাসিত হইল, তিনি আপন মনে অপরিস্ফুট কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "এতদিন পরে আমাকে কি মনে পড়ল?" আজ—আজ তুমি আমায় দেখা দিলে? আজ অন্তিম কালে—"

সুশীলার কথায় প্রমোদ ভীত হইয়া বলিলেন "মা কি বলছেন ?"

সুশীলার চমক ভাঙ্গিল, দেখিলেন, কোথায় সে মূর্ত্তি, বিকারের অসম্বন্ধ প্রলাপে শূন্যে চাহিয়া বকিতেছেন মাত্র। সুশীলা বলিলেন—

"একি, আমি কি স্বপ্ন দেখছি ?" কে জানে এ কেমনতর স্বপ্ন! প্রমোদ একটি কথা তোকে বলবার জন্য ছট্ ফট্ করছি।

প্র। কি বলুন।

সু। আমি তো মরতে বসেছি, কনককে দেখিস্, ওর স্বভাব আজ কাল বড় বিগড়ে গেছে।

কনক কিরূপ গুরুতর দোষ করিয়াছে, তাহা খুলিয়া বলিয়া সুশীলা দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে মনের কষ্টে বলিয়া উঠিলেন, "প্রমোদ, কনকের স্বভাব ভাল করতে চেষ্টার যেন ত্রুটি না হয়।"

সমস্ত শুনিয়া প্রমোদের হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল, অনুতাপ ও কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। প্রমোদ দেখিলেন কনক তাঁহার জন্য অনেক কষ্ট অবিচলিতভাবে সহ্য করিতেছে, প্রমোদ তখন সজল নেত্রে মুক্তকণ্ঠে আপনার দোষ সুশীলার নিকট ব্যক্ত করিলেন। প্রমোদই সুশীলার যত্নের বই গুলি ছড়াইয়াছিলেন, প্রমোদের জন্যই কনকের টাকার দরকার হইয়াছিল, প্রমোদই সে কথা বিশেষ রূপে গোপন রাখিতে অনুরোধ করায় বালিকা সে কথা কাহাকেও বলে নাই, প্রমোদ এই সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

তখন কনককে নির্দ্দোষী জানিয়া সুশীলার আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না, তাঁহার বক্ষঃ হইতে যেন একটা গুরুভার নামিয়া গেল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

দেব কি মানব

এদিকে যামিনীনাথ দুই এক দিনের জন্য এলাহাবাদে আসিয়াই কনকের রূপলাবণ্যে মোহিত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে আর নীরজা স্থান পাইল না। সচরাচর এরূপ লঘু হৃদয় লোকের যেরূপ হইয়া থাকে এস্থলেও তাহার অন্যথা হইল না। নীরজাকে ছাড়িয়া তাঁহার এখন কনকের দিকে চক্ষু পড়িল। নীরজা বনফুল, যেখানে অন্য ফুল মেলে না, সেইখানে নীরজার আদর। নীরজা অরণ্যে একাকী ফুটিয়া তাহা শোভিত করে, কিন্তু কনক গোলাপ, সকল স্থানে সকল সময় তাহার সমান আদর। রাশি রাশি বিকশিত পুষ্পসমাকুল কাননের মধ্যেও গোলাপ পরম আরাধ্য, গোলাপ কুসুমরাণী। গোলাপটি দেখিয়া তিনি যে বনফুল নীরজাকে ভুলিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বিশেষতঃ যত দিন নীরজাকে পাইবার আশা ছিল না, তত দিন তাঁহার সে লালসা অত্যন্ত প্রবল ছিল, কিন্তু তাহাকে পাইবেন জানিয়া তাঁহার নিকট নীরজার মর্য্যাদা অনেক কমিয়া আসিয়াছিল। এখন তাঁহার নয়নে নীরজা মর্ত্ত্যজাত কুসুম, কনক স্বর্গের পারিজাত; সুতরাং যামিনী কনকের রূপে মুগ্ধ হইলেন।

নীরজাতে আর এখন তাঁহার মন নাই, এখন আর বিবাহের নিমিত্ত কানপুর যাইতে তিনি ব্যস্ত নহেন। দু'দিনের জন্য এখানে আসিয়া পাঁচ ছয় দিন হইয়া গেল, তবু যামিনী কানপুর যাইবার নামও করেন না। যামিনীর এখন একমাত্র চিন্তা কি উপায়ে তিনি কনককে লাভ করিবেন। যামিনী মনে মনে জানিতেন প্রমোদ নীরজার প্রতি অনুরক্ত; ভাবিলেন যদি তিনি নীরজার সহিত প্রমোদের বিবাহ দিতে

পারেন, তো প্রমোদ অনায়াসে তাঁহাকে ভগিনী সমর্পণ করিবেন। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া একদিন কথায় কথায় প্রমোদকে বলিলেন—'প্রমোদ দু'দিনের জন্য এসে চার পাঁচ দিন কেটে গেল, শীঘ্র যেতে হবে,—কিন্তু—" যামিনী এইখানে সহসা থামিলেন। প্রমোদ বলিলেন, "হ্যাঁ চার পাঁচ দিন ত কাটলো আমার ইচ্ছা আরো কিছু দিন কাটে; কিন্তু সে অনুরোধ করি আর কোন সাহসে?"

যা। সাহসের অভাব আমারি। কদিন থেকে মনে করছি তোমাকে একটি কথা বলি, কিন্তু কেজানে কিছুতেই কেমন পেরে উঠছিনে।"

প্রমোদ হাসিয়া বলিলেন—"আজকে তাহলে পারতেই হবে, কি কথাটা বল দেখি?"

যামিনী না হাসিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তুমি অবশ্য জান নীরজার সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্যই সন্ন্যাসী আমাকে কানপুরে ডেকেছেন, কিন্তু তাকে আমার বিবাহ করতে একেবারে ইচ্ছা নেই, তাই সেখানে যেতে ইচ্ছা করছে না। কি ক'রে এই অপ্রিয় সত্য কথাটা তাঁকে বলব—বড়ই মুস্কিলে পড়েছি। ভাই এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আগে একটা কথা কইতে চাই। ভেবেছিলাম সেখানেই প্রথমে সে প্রস্তাবটা করে—তবে তোমাকে বলব—" কিন্তু তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই প্রমোদ বলিয়া উঠিলেন, "নীরজাকে বিয়ে করতে তোমার ইচ্ছা নেই?"

যা। না।

এই উত্তরে বিস্ময়ে প্রমোদের যেন বাক্‌রুদ্ধ হইয়া গেল। নিস্তব্ধভাবে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে যামিনীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। যামিনী কোমলস্বরে আবার বলিলেন, "তাকে বিবাহ করতে আমার ইচ্ছা নেই, সত্যই আশ্চর্য্যের কথা,—কিন্তু এরও কারণ আছে—।"

"এরও কারণ আছে! তাকে না ভালবেসে কি কেউ থাকতে পারে!"

যা। তা ঠিক; তুমি ভেবো না যে তাকে আমি ভালবাসি নে কিন্তু আমি তার অযোগ্য; আমি তাকে বিবাহ করব না।

প্র। তুমি নীরজার অযোগ্য! কি বল তুমি যামিনী! তাহ'লে তার যোগ্য যে কে তা তো জানি নে।

যা। তুমি যাই বল ভাই, আমি বাস্তবিকই তার অযোগ্য, নীরজা আমাকে ভালবাসে না।

এই কথায় প্রমোদ তাহার বিবাহের অনিচ্ছার কারণ বুঝিলেন, তাহার সেই বিষাদার্দ্র স্বরে তাহার হৃদয়ের গভীর যাতনাও অনুভব করিতে পারিলেন। বুঝিয়া মর্ম্মপীড়িত হইয়া তিনি নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। যামিনী কিছু পরে আবার বলিলেন, "প্রমোদ, তোমাকে বলব? নীরজা কার প্রতি অনুরক্ত শুনবে? নীরজা তোমাকেই ভালবাসে।"

বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু এই কথা শুনিয়া বন্ধুর গভীর দুঃখের মধ্যেও প্রমোদের হৃদয় সহসা যেন আহ্লাদে কম্পিত হইয়া উঠিল। কিন্তু আপনাকেই যামিনীর কষ্টের কারণ ভাবিয়া তখনি আবার সে আহ্লাদ থামিয়া আসিল। যামিনী বলিলেন—

"আমি কি কিছু বুঝি না, ভাই? তুমিও যে মনে মনে নীরজাকে ভালবাস তা আমি বুঝেছি। এখানে এসে সেটা বেশ ভাল ক'রেই বুঝেছি। বুঝে কি প্রতিজ্ঞা করেছি শোন—আমি তোমাদের পথের কণ্টক হব না। আমি নিজে উদ্যোগী হয়ে তোমাদের বিবাহ দিয়ে দেব, এই আমার সংকল্প।

যামিনীর নিঃস্বার্থ ভাবে প্রমোদ স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। যামিনী দেব কি মানব, তাহা তিনি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে বলিলেন "যামিনী তুমি মানুষ নও দেবতা; তোমার বন্ধুতা

স্বর্গীয়। বাস্তবিকই আমি যে দিন থেকে নীরজাকে দেখেছি, সেই দিন থেকে তাকে ভালবাসি। সে ছবি এখন পর্য্যন্তও হৃদয় হতে মুছতে পারি নি। কিন্তু যা বলি বিশ্বাস করো; তাকে আমি যতই ভালবাসি নে কেন, নীরজাকে না পেলে যতই কষ্ট হোক্ না কেন, তোমাকে বঞ্চিত করে তাকে পেতে আমি কখনই ইচ্ছা করব না—সে লাভে আমি কখনই সুখী হব না।"

যামিনী বলিলেন, "শোন আমি যা বলি? তুমি বিবাহ না করলেও আমি তাকে বিবাহ করব না! নীরজা আমাকে ভাল বাসে না জেনে আমি কি করে তা করব? বরং তোমার সঙ্গে বিবাহ হলে নীরজা সুখী হবে জেনে আমি সুখী হতে পারব।"

প্রমোদ যামিনীর কথা বুঝিলেন,—বুঝিলেন যামিনীর মত অবস্থায় পড়িলে তিনিও ঠিক ঐরূপ করিতেন। আপন ইচ্ছানুসারে মন সহজেই বোঝে। যামিনীর কথা তাঁহার যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। তথাপি যামিনীকে সে সংকল্প ত্যাগ করাইবার নিমিত্ত তিনি অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু যামিনী অটল ভাবে বলিলেন—"তুমি আমাকে তাহলে এখনও ভাল করে চেনো নি দেখছি। অতটা নীচ আমাকে মনে কোর না ভাই। আমি যেকালে এ বিবাহের প্রস্তাব নিজেই করছি, তুমি নিশ্চয় জেনো যে, এতে আমার একটুও অসুখ হবে না। যদি অসম্মত হও, তা হলেই বরঞ্চ কষ্ট হবে।"

প্রমোদ নিস্তব্ধে আপন মনেই ভাবিতে লাগিলেন, নানা ভাবনায় তাঁহার মন তরঙ্গিত হইতে লাগিল, তিনি যামিনীর কথার কোন উত্তর করিলেন না। যামিনী মৌনই সম্মতির লক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন "আজই আমি তবে কানপুরে যাই, নিজে সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথা কয়ে তোমার বিবাহ ঠিক করে আসি,—কি বল?"

অনেক কথাবার্ত্তার পর যামিনী সেইদিনই কানপুর যাত্রা

করিলেন। প্রমোদ সমস্ত দিন বিষাদময়-আহ্লাদে অভিভূত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। নীরজা তাঁহার হইবে এই তাঁহার আহ্লাদ; যাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই, যাহা আশার অতীত সেই বিষয়ে আশার সঞ্চারেই তাঁহার আহ্লাদ। আবার বিষাদ এই, তাঁহার পরম বন্ধু যামিনীকে তাঁহার জন্য নিরাশ হইতে হইল।

প্রমোদ ভাবিলেন, যামিনীর মত নিঃস্বার্থ লোক দ্বিতীয় আর সংসারে নাই।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

মৃত্যু-শয্যা

ক্রমে দিন যাইতে লাগিল। সুশীলার আরোগ্য লাভের স্থিরতা নাই। তাঁহার পীড়া দু দিন হয় তো বা বাড়িয়া উঠে আবার দু'দিন যেন বেশ সারিয়া যায়। প্রমোদ আর কত দিন কলেজ কামাই করিবেন, সম্মুখেই তাঁহার পরীক্ষা। কিছু দিন দেখিয়া দেখিয়া তিনিও কলিকাতা যাত্রা করিলেন। প্রমোদ কলিকাতায় যাইবার তিন চার দিন পরে সুশীলার জ্বর বাড়িয়া উঠিল। ক্রমে বিকার হইয়া দাঁড়াইল। সুশীলা ক্রমাগত তাঁহার সম্মুখে বিগত বর্ষারজনীর সেই মুর্ত্তিটী দেখিতে লাগিলেন, সেদিনকার সেই গীতটী তাঁহার কাণে বাজিতে লাগিল, ক্রমাগত যেন শুনিতে লাগিলেন,

বুঝি গো সে এল না,
চির দিন চির নিশি জাগরণে গেছে মিশি
যাহার বিরহ মাঝে ধরিয়া আশার কণা।

কাছে কনক বসিয়াছিল, তাহাকে বলিলেন, "কনক, কি সুন্দর

গান! আহা ঐ গানটী তিনি গাইতেন, আমি গানটী জানি।” বলিতে বলিতে সুশীলার অশ্রু বহিতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন “আহা ঐ গানটী এক দিন আমাকে গাওয়াবার জন্য তিনি কতই সাধ্যসাধনা করেছিলেন। আজ কনক ও গানটী কে গাচ্চে, ও গলা কার?”

সুশীলা সেই স্বর চিনিবার জন্য মনোযোগ পূর্ব্বক কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন, পরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—

“না—না চিনতে পারলুম না। তাঁকে চিনেছি, কিন্তু কনক ও গান কে গাচ্ছে? তাকে ত চিনতে পারছি নে?”

কনক সুশীলার কথায় কাঁদিতেছিল, অশ্রুজল মুছিয়া বলিল “আমি কই কিছুই শুনতে পাচ্ছিনে ত?”

সু। শুনতে পাচ্ছিস নে? ভাল করে শোন্। কনক কি সুন্দর গলা!

এই সময় চিকিৎসক আসিলেন। সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন, বুঝিলেন আশা বড়ই কম। সত্বর ঔষধ ব্যবস্থা করিতে তিনি বাহিরে গেলেন। চিকিৎসক চলিয়া গেলে সুশীলা বিস্ময় দৃষ্টিতে কনককে জিজ্ঞাসা করিলেন “ও কে? কেন এসেছে?” কনক উত্তর না দিতে দিতে সুশীলা আবার বলিলেন “কনক, ঐ শোন ঐ শোন।”

আর ত রহে না আঁখি, মুদে আসে পাতা,
আসিছে অনন্ত নিদ্রা এখনো সে কোথা?
এখনো এল না সখি, সেই কোলে মাথা রাখি
এ জীবনে তবে আর ঘুমান হলো না,
কাঁদিতে কাঁদিতে ওরে চলিনু জন্মের তরে
অভাগীর শেষ দিনে শেষ সাধও পূরিল না!

আমারি মনের মত গান, ঐ শোন ঐ শোন !”

এই সময় সহসা এক জন এই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সুশীলার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন অপরাহ্ন কাল। বাতায়ন পথে লোহিত বর্ণের পুঞ্জীভূত আলোক গৃহে প্রবেশ করিয়া শয্যার একপ্রান্ত উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। প্রবেশকারীর মূর্ত্তি সেই আলোকে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সুশীলা চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। আবার যখন চক্ষু খুলিলেন, তখন তাঁহার যেন কিছু জ্ঞান হইয়াছে, আর সে বিকারের ঘোর নাই, তিনি সেই দিকে চাহিয়া বলিলেন “মৃত্যুকালে এখন আমাকে দেখা দিলে ?”

“প্রাণেশ্বরি, সুশীলা কোন্ মুখে আর তোমার কাছে আসি।” বলিয়া সন্ন্যাসী সুশীলার হস্ত আপন হস্তে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। স্বামীর দিকে চাহিয়া স্বামীর হস্তে হস্ত রাখিয়া সুশীলা প্রাণত্যাগ করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বঘটনা

সুশীলা বিধবা বলিয়া পরিচিত, হঠাৎ কি করিয়া মৃত্যুকালে তাঁহার স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন ? এই স্থানে ইহাঁদের পূর্ব্ববৃত্তান্ত কিছু বলা আবশ্যক। তারাকান্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা চারুশীলাকে তাহার স্বামী বিবাহের পরই সেই যে পিত্রালয় হইতে লইয়া গিয়াছিলেন, সেই অবধি তারাকান্তের নিকট পাঠান নাই। তাহাকে আনিবার কথা বলিলেই

বিনোদলাল কোন না কোন ওজর করিতেন, আসল কথা চারুশীলাকে ছাড়িয়া তিনি এক দিনের জন্যও একাকী থাকিতে চাহিতেন না। তাহা দেখিয়া তারাকান্ত সুশীলার বিবাহ দিয়া ছোট জামাতাকে ঘর-জামাই করিয়া রাখেন। পুত্রাদি আর কেহই না থাকায় সুশীলাকে তিনি কাছ-ছাড়া করিতে পারিলেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বিবাহের অল্প দিন পরেই জামাতার স্বভাবে একটি বিলক্ষণ দোষ জন্মিল। দয়ানন্দ কি প্রকারে মদ্যপানে শিক্ষিত হইলেন। সুশীলা তাঁহাকে সংশোধনের অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। একদিন কোথা হইতে দয়ানন্দ মদ খাইয়া গৃহে আসিয়া ভৃত্যকে পুনরায় মদ আনিতে আদেশ করায়, সুশীলা ভৃত্যকে বারণ করিয়াছিলেন। তাহাতে দয়ানন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া, সেই মত্ত অবস্থায় সুশীলাকে প্রহার করেন। এই কথা কি করিয়া তারাকান্তের কর্ণে উঠে। তিনি জামাতার আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে কটূক্তি করেন। দয়ানন্দ ইহাতে অত্যন্ত অপমান বোধ করিলেন। ভাবিলেন তিনি শ্বশুরের অন্নভোজী না হইলে, শ্বশুর তাঁহার প্রতি এরূপ দাসের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিতেন না। অপমানিত হইয়া সেই দিনই তিনি শ্বশুরালয় ত্যাগ করিলেন। তাহাতে সুশীলার অত্যন্ত মনস্তাপ হইল। যাইবার সময় স্বামী সুশীলাকে বলিলেন "সুশীলা, আমি তোমাকে বিবাহ ক'রে অন্যায় করেছি, আমরা সমকক্ষ নই। আমি দরিদ্র, তুমি ধনবানের কন্যা। নামে আমি তোমার ভর্ত্তা কিন্তু আসলে ভরণপোষণ কর তুমি। মুখের কথায় আমি তোমার প্রভু, কিন্তু আসলে আমি তোমার দাস মাত্র। পুরুষের পক্ষে এরূপ জীবন কতদূর হেয় ঘৃণাস্পদ এতদিনে তা আমি খুবই বুঝছি। আমি বিদায় হই, তুমি পিত্রালয়ে সুখে থাক।" এই কথায় স্বামীর সমস্ত অসদ্ব্যবহার ভুলিয়া সুশীলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "তুমি দরিদ্র, তবে আমি কি? আমিও দরিদ্রের পত্নী। পিতার ধন আছে তাঁরি

থাক, তোমার সঙ্গে আমি ভিক্ষা ক'রে জীবন কাটাব, তোমার সঙ্গে বনবাসেও আমার সুখ, তুমি যদি এখানে না থাক তাহলে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল।" পত্নীর প্রেমময় করুণবাক্যে দয়ানন্দ যেন কিছু নরম হইলেন। কিন্তু শ্বশুরবাটী ত্যাগ করিবেন এই যে তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প, তাহা কোন মতেই টলিল না। তিনি সেইদিনই শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

দিন যায় মাস যায়, দয়ানন্দের আর কোন খবর নাই, সুশীলা চাতকিনীর ন্যায় তাঁহার পত্রের জন্য হা-প্রত্যাশ করিয়া থাকেন, প্রত্যহই ভাবেন, আজ নিশ্চয়ই তাঁহার পত্র পাইব, শেষে রাত্রি হইলে হতাশ হইয়া অশ্রুবারিতে মনের জ্বালা নিবারণ করেন। যদি এই দুঃখময় পৃথিবীতে ঈশ্বর আমাদের অশ্রুজল না দিতেন, জানিনা তাহা হইলে কি হইত! ক্রমে একবর্ষ দুইবর্ষ অতীত হইল, তবুও কোন সংবাদ নাই। অবশেষে তৃতীয় বৎসরের শেষে জনরবে শোনা গেল—তিনি কলিকাতা হইতে উড়িষ্যা গমন করিতেছিলেন, ঝড়ে জাহাজ ডুবি হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এই সংবাদে সুশীলা অত্যন্ত মর্ম্ম-পীড়িত হইলেন। তাহার পর হইতে তিনি বিধবাবেশ ধারণ করিয়াছিলেন।

এদিকে দয়ানন্দ শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া কানপুরে আসিয়া সন্ন্যাসী ফকীরের দলে মিশিলেন। যে বিজন মন্দির এখন তাঁহার সম্পত্তি সেই মন্দিরের ভূতপূর্ব্ব সন্ন্যাসী একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত চর্চ্চার অভিপ্রায়ে দয়ানন্দ ইহাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ক্রমশ গুরুর এতদূর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন যে, গুরু মৃত্যুকালে ইহাঁকে আপন উত্তরাধিকারী করিয়া গেলেন।

দয়ানন্দের দ্বিতীয় বার দারগ্রহণের বিবরণ এইরূপ। কানপুর হইতে কোন একসময় গুরুর সহিত শ্রীক্ষেত্র যাত্রাকালে একজন কন্যাদায়গ্রস্ত গরীব ব্রাহ্মণ-সহযাত্রী কর্ত্তৃক বিশেষ অনুরুদ্ধ এবং গুরুরাদেশ লঙ্ঘনে

অপারগ হইয়া ইনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। নীরজা এই বিবাহের-একমাত্র সন্তান, কন্যা জন্মিবার অল্পদিন পরেই প্রসূতির মৃত্যু হয়। পত্নী বিয়োগের পর দয়ানন্দের পূর্ব্বস্মৃতি রুদ্রভাববিরহিত সুকোমল ভাবে মনে উদিত হইল। সুশীলার প্রতি তিনি কিরূপ কঠোর ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন; নিজের অপরাধ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, শ্বশুরকৃত অপমান ভুলিয়া গেলেন। তখন সুশীলাকে দেখিতে আসিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু তখন আর কোন্ মুখে দেখা করিতে আসেন? যাহাকে ত্যাগ করিয়া বিবাহ পর্য্যন্ত করিয়াছেন, এখন তাহার নিকট আর কি করিয়া আসিবেন! এইবার নীরজাকে লইয়া কলিকাতা হইতে কানপুর যাইবার সময় কোন মেলা উপলক্ষে কন্যার সহিত কয়েক দিন এলাহাবাদে তিনি বাস করিয়া গেলেন কিন্তু ইচ্ছা সত্ত্বেও কোন মতে একদিন সুশীলার সহিত দেখা করিতে আসিতে পারিলেন না।

সুশীলার বাড়ী বেণীঘাট হইতে অধিক দূরে নহে, নীরজা সন্ধ্যাকালে তীরভ্রমণ করিতে করিতে প্রায়ই তাঁহাদের বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িত। কখনও উদ্যানের ঘাটে আসিয়া বসিত, কখনও বা তীরে তীরে বেড়াইয়া দূর হইতে বাড়ীর আলোকের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ফিরিয়া যাইত। কেজানে কেন, নিস্তব্ধ নিশীথে সেই শ্বেত নিস্তব্ধ অট্টালিকার দিকে চাহিয়া সে কেমন যেন মুগ্ধ হইয়া পড়িত। মঙ্গলগ্রহের দিকে চাহিয়া কল্পনা সূত্রে বৈজ্ঞানিকের যেমন তাহার জীবদিগের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা হয়, নীরজাও তেমনই ভাবে সেই অট্টালিকার প্রতি আকৃষ্ট নেত্রে চাহিয়া তাহার অন্তরস্থ অজ্ঞাত প্রাণীর পরিচয়ে কুতূহলী হইয়া কত কি কল্পনা করিত।

অন্যদিনের মত সেই বর্ষা রজনীতেও নীরজা নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিল। কিছুক্ষণ হইতে মেঘ করিয়াছিল কিন্তু নীরজা অরণ্যবালিকা, বৃষ্টির ভয় তাহার ছিল না, যখন মেঘ ঘনাইয়া আসিল, বিদ্যুৎ চমকিতে

লাগিল তখন তাহার হৃদয় একটি অপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ হইল। নীরজার প্রকৃতিই এমনি উপাদানে গঠিত যে মেঘের ডাকে তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠিত, বিদ্যুৎ চমকিলে সে যেন তাহা ধরিবার আশায় ছুটোছুটি করিত, বৃষ্টি পড়িলে অনেক সময় সে তাহার সেই সুললিত দেহ খানি, নিবিড় জলদবৎ কুন্তলরাশি ভিজাইয়া দয়ানন্দের তিরস্কারের পাত্র হইত।

সেদিন সে মেঘবৃষ্টির রুদ্রগম্ভীর শোভার মধ্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া ভুলিয়া গেল এ তাহার পরিচিত অরণ্যতল নহে, এ অপরিচিত উদ্যান-ভূমি। বালিকা এইরূপ সময়ে মন্দিরের আলোক লক্ষ্য করিয়া যেমন বাড়ী ফিরিত তেমনি বজ্রধ্বনি হইবামাত্র অট্টালিকার আলোক লক্ষ্য করিয়া অভ্যাস বশতঃ গান গাহিতে গাহিতে প্রাচীর তলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। অতীতের স্মৃতিতেই তাহার হৃদয় ভাসিতেছিল, বর্ত্তমান তাহার মন হইতে অপসৃত। তাহারই গানে সেদিন কনক ও সুশীলা মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

এদিকে সন্ন্যাসী বাড়ী আসিয়া নীরজাকে না দেখিয়া নদীতীরে খুঁজিতে গেলেন, গানের শব্দ লক্ষ্য করিয়া অট্টালিকাপ্রাচীরতলে আগমন করিলেন, সেই সময় বিদ্যুতালোকে মুক্তবাতায়ন পথে সুশীলার সহিত দেখা হইল। একবার দেখিয়া পরদিন তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা তাঁহার আরও প্রবল হইল কিন্তু এতদিন পরে এখন আবার কোন্ ছুতায় কি বলিয়া পত্নীকে মুখ দেখাইতে আসিবেন? সেই দিন হইতে তাঁহার আর একটি ইচ্ছার সঞ্চার হইল। নীরজার সহিত প্রমোদের বিবাহ দিয়া সুশীলার পিতৃবংশ ও তাঁহার বংশ আবার এক করিতে তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল, কিন্তু দেখিলেন সে ইচ্ছাও পূর্ণ হইবে না। যামিনী নীরজাকে রক্ষা করিয়াছে, যামিনীকে তিনি জামাতা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত' এখন অন্য কোন কথা মনে আনাই অন্যায়। পরদিনই দয়ানন্দ কন্যাকে লইয়া কানপুর যাত্রা করিলেন। দেখিলেন এখানে

থাকিয়া সুশীলাকে দেখার ইচ্ছা দমন করা দুঃসাধ্য। কিছু দিন পরে যখন যামিনী কানপুরে গিয়া প্রমোদের সহিত নীরজার বিবাহপ্রস্তাব করিলেন, তখন দয়ানন্দ মহাহ্লাদ সহকারে এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া লজ্জা সঙ্কোচ সমস্ত ত্যাগ করিয়া এই উপলক্ষে সুশীলার সহিত একবার দেখা করিতে আসিলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহা দেখিবেন জানিলে হয়তো আসিতেন না।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

দ্রুমচ্যুত বল্লরী

সুশীলার মৃত্যুতে কনকের অত্যন্ত আঘাত লাগিল, আজ তাহার আপনাকে নিতান্তই অনাথিনী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বাল্যকালে মাতাকে হারাইয়া সে সুশীলাকেই মা বলিয়া জানিত। কনককে সুশীলাও মাতার ন্যায়ই ভালবাসিতেন। কনক ভাবিল তাহার আর কেহ নাই, আজ হইতে আর তাহাকে কেহ সেরূপ স্নেহ দিবে না। অপরাধ করিলে স্বভাব শোধরাইবার জন্য, কনকের ভালর জন্য শাস্তি দিয়া, পরে সে নিমিত্ত তাঁহার কত কষ্টই হইত। তাহার উপর যতই রাগ করুন, যতই বিরক্ত হউন, কাতর বিষণ্ণ দেখিলে অবশেষে তাহাকে আদর করিয়া কোলে টানিয়া লইতেন। ছেলেবেলা হইতে কনক সকলকে ভালবাসে, কিন্তু সুশীলা বই আর কাহারো নিকট কনক এরূপ স্নেহাদর পায় নাই। পিতাকে তাহার বড় স্মরণ হয় না। তথাপি যেটুক মনে আছে, তাহাতে কনকের অপেক্ষা তাহার পিতা প্রমোদকেই অধিক ভালবাসিতেন বলিয়া মনে আছে। প্রমোদের জন্য পিতা মাতার নিকট সে বাল্যকালে কত

না ভর্ৎসিত হইয়াছে, কিন্তু তবুও সেজন্য কনকের তেমন মর্ম্মান্তিক দুঃখ হইত না। কনক প্রমোদকে এত দূর ভালবাসে যে, পিতা মাতা তাহাকে অনাদর করিয়া প্রমোদকে আদর করিলে তাহার সেই কষ্টের মধ্যেও একটি সুখ হইত। প্রমোদের নিকট উপেক্ষিত হইলেই কেবল তাহার দুঃখের সীমা থাকিত না। সুশীলার স্নেহে প্রমোদের ভালবাসার অভাবও সে ভুলিয়া গিয়াছিল, সুশীলার ভালবাসাই তাহাকে যেন বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। আজ কনক সেই স্নেহময়ী মাতাকে হারাইল, আজ সে যেন তাহার সর্ব্বস্ব হারাইল, এখন তাহার কি দশা হইবে? বালিকা কনক সেই মৃত্যুশয্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

* * * * *

তখন সন্ধ্যাকাল অতীত হইয়াছে; সুশীলা গঙ্গাতীরে চিতাশয্যায় শয়ান। মৃত্যুশয্যায় আজ তাঁহার সধবাবেশ,—পরিধানে লাল পট্টবস্ত্র, মস্তকে সিন্দূর, গলায় ফুলের মালা, হাতে লাল রুলি ও চরণ দুইখানি অলক্তকে রঞ্জিত। চতুঃপার্শ্বে, দাসদাসীগণ ক্রন্দন করিতেছে, ব্রাহ্মণ ও প্রতিবেশীগণ হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছে, স্বামী দয়ানন্দ শোকস্তব্ধ গম্ভীর মূর্ত্তিতে সম্মুখে দাঁড়াইয়া পত্নীর মৃত্যুপ্রশান্ত রমণীয় মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে করিতে মনে মনে শতাপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছেন।

একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত একখানি প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড আনিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহার হস্তে প্রদান করিল—তিনি পূর্ব্ববৎ স্তব্ধ গম্ভীর ভাবেই তাহা গ্রহণ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক মৃতপত্নীর মুখাগ্নি করিলেন। অচেতন ওষ্ঠাধরও যেন সহসা চেতনহাস্যে বিকম্পিত হইয়া উঠিল, অন্তিম শয্যা যেন ফুলশয্যার স্মৃতি মণ্ডিত হইয়া উঠিল, দয়ানন্দ পত্নীর শান্তপ্রফুল্ল মুখে পরিপূর্ণ মার্জ্জনা অনুভব করিলেন।

মুখাগ্নির পর ঘৃত সংযোগে চিতাকাষ্ঠ যখন ধূধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল,

জলন্ত বহ্নি যখন সুশীলাকে আপনার মধ্যে লুকাইয়া ফেলিলেন তখন দয়ানন্দের বিদীর্ণহৃদয় হইতে একবার ধ্বনিত হইল—"ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ—" তাহার পর নভোমণ্ডলস্খলিত নক্ষত্রের ন্যায় দ্রুতপদে তিনি পশ্চাৎমুখী হইয়া চলিয়া গেলেন, একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না।

কনক শববাহিদলের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া অশ্রুহীন সুকরুণ প্রস্তর মূর্ত্তিবৎ চিতার নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল। অগ্নি সংযোগের পূর্ব্বে নয়ন প্রাণ ভরিয়া শেষবার সে স্নেহময়ী জননীতুল্যা মাতৃস্বসার প্রশান্ত মূর্ত্তি এক দৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছিল। যখন সর্ব্বগ্রাসী অগ্নি তাহাকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল—কনক আর দেখিতে পারিল না, এতক্ষণ কষ্টে তাহার অশ্রুরাশি স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল সহসা উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া সেখান হইতে সে চলিয়া গেল। একজন দাসী কনককে গৃহাভিমুখে যাইতে দেখিয়া নিকটে আসিয়া বলিল "এখন এ কাপড়ে ঘরে যেতে নেই। গঙ্গা নেয়ে চল পরে ঘরে যাবে।" দাসীর কথায় কনক নিস্তব্ধে তাহার সঙ্গে সঙ্গে নদীতীরে আগমন করিল।

রজনী স্তব্ধ গম্ভীর ও অন্ধকার। সেই তমসাচ্ছন্ন নিশীথে গঙ্গার অতল জলরাশির উপর দুইটি স্ত্রীলোক আসিয়া নামিল। অন্ধকারে আর কিছুই দেখা যায় না, কেবল ঊর্দ্ধে আকাশ নীচে জল। চরণতলে জলরাশি, তল তল, ঢল ঢল করিয়া উদাসগীতি গাহিয়া সকল্লোলে বহিয়া চলিতেছে, আর উপরে তারকাখচিত স্তব্ধ আকাশ দিগন্ত সীমাবদ্ধ করিয়াও অসীমরূপে প্রসারিত হইয়া আছে। নদীগর্ভে জলের উপরও যত্রতত্র আকাশ ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তারকারাশি হাসির ছটা বিকীর্ণ করিয়া দূরের অন্ধকার আরো ঘনীভূত করিতেছে। আকাশালোক ছাড়া গঙ্গা বক্ষঃস্থিত একখানি নৌকার প্রদীপ মিট মিট করিয়া এক একবার আলেয়ার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল। কনক সেই আলোকটির পানে চাহিয়া চাহিয়া জলে নামিল। দেখিতে

দেখিতে সেই আলোকটিকে আর দেখিতে পাইল না, এই অন্ধকার জলরাশির মধ্যে যে একটি আলোক ছিল, তাহাও যেন নিবিয়া গেল। কনকের সংসার সমুদ্রের মধ্যে সুশীলা যে একটি আলো ছিলেন তাহাও এইরূপ নিবিয়া গিয়াছে, কনক এখন আর কাহার স্নেহে বাঁচিবে? কনক যাতনায় মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে করিতে ব্যাকুল ভাবে উৰ্দ্ধদৃষ্টি করিল। দেখিল সেই অনন্ত আকাশ কেমন নীরব, কেমন গম্ভীর, কেমন শোভাময়। মনে হইল যেন তাহার দুঃখে তারাগণ ভ্রূকুটী করিয়া হাসিতেছে। সহসা সেই তারকারাশির মধ্য হইতে একটি তারকা খসিয়া পড়িল। কনকের মনে হইল এই যে তারাটি খসিল, এই অসংখ্য তারকার মধ্যে একটি খসিয়া গেল, উহার জন্য কাহার কি আসিবে যাইবে? একটি কমিয়াছে বলিয়া কেহ কি জানিতেও পারিবে? এখানেই বা আমি কে? এই বিস্তৃত পৃথিবী—তাহার মধ্যে আমি কে? আমি একটি অণুকণা হইতেও অধম। আমি খসিয়া পড়িলে কাহার কি ক্ষতিবৃদ্ধি? আমার জন্য একবিন্দু অশ্রু ফেলিবারও কেহই নাই। ব্যথিত কাতর কনক ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনে একটি একটি করিয়া সোপানশ্রেণী অবতরণ করিতে লাগিল। ক্রমে কখন্ যে সোপান গুলি ফুরাইয়া আসিল কনকের আর তাহাতে হুঁস হইল না, শেষ সোপানে নামিয়া যেমন আর একটি সোপানের প্রত্যাশায় সে পা বাড়াইল, অমনি সোপানচ্যুত হইয়া গভীর জলগহ্বরে নিপতিত হইল, দেখিতে দেখিতে গঙ্গার কৃষ্ণকায়ার মধ্যে কোথায় ভাসিয়া গেল; দুই একটি বিম্ব ব্যতীত গঙ্গার বিপুল বক্ষে কনকের আর কোন চিহ্নই রহিল না, ক্ষণপরে সে চিহ্নও লুপ্ত হইল। দাসী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উপরে উঠিয়া আসিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

অঙ্কুর-বিকাশ

প্রাতঃকালে মন্দ মন্দ সমীরণ ভরে কম্পিত হইতে হইতে একখানি সুদৃশ্য বজরা গঙ্গাবক্ষঃ তরঙ্গিত করিয়া চলিতেছিল। বজরার দুইটি কামরা, একটি কামরায় পার্শ্বস্থ উচ্চ তক্তার উপর একটি পীড়িতা রমণী শয্যাশায়ী, নিকটে দুইজন পুরুষ দুইখানি চৌকিতে আর নীচে পদপার্শ্বে একজন দাসী বসিয়া। ইহাঁদের মধ্যে যিনি যুবা তিনি প্রৌঢ় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ কেমন দেখছ? ভরসা হয়?" উত্তর পাইলেন "এ দুদিনের চেয়ে আজ কিছু ভাল, তবে আরো দুচার দিন না গেলে ঠিক বলা যায় না।"

দিন যাইতে লাগিল; যুবা প্রায় সর্ব্বদাই রমণীর নিকট রহিয়াছেন, আবশ্যক না হইলেও ক্ষণে ক্ষণে নাড়ী টিপিয়া দেখিতেছেন, ক্ষণে ক্ষণে কপালের উষ্ণতা অনুভব করিতেছেন এবং "রমণী এখন কেমন আছেন?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া মাঝে মাঝে চিকিৎসককে বিরক্ত করিয়া তুলিতেছেন, অথচ চিকিৎসকের সাহস বাক্যে তাঁহার কিছুতেই প্রত্যয় জন্মিতেছে না। যখন অন্য কোন কাজ নাই, তখন যুবা রমণীর সেই অজ্ঞান সুষুপ্ত মুখের দিকে চাহিয়াই আছেন, তাহার সেই অর্দ্ধ-নিমীলিত পদ্ম-কোরক-সদৃশ নয়নযুগলের দিকে চাহিয়াই আছেন, পলকহীন স্থির দৃষ্টিতে বিষণ্ণ ভাবেই চাহিয়া আছেন, দেখিয়া তাঁহার কি তৃপ্তি হইতেছে তিনিই জানেন।

যুবক আর কেহ নহেন আমাদের পূর্ব্বপরিচিত হিরণকুমার।

হিরণকুমার কিছু দিন হইতে পশ্চিম অঞ্চলে আবগারী তদারক কার্য্য

করিতেছিলেন। এই উপলক্ষে কখনকখনও পশ্চিমের নানা স্থানে তাঁহাকে চৌর্য্য নিবারণেও যাইতে হইত। সম্প্রতি এই উদ্দেশ্যে তিনি জল পথে ঘুরিতেছিলেন। সুশীলার মৃত্যুর দিন দৈব বশতঃ তিনিও এলাহাবাদে ছিলেন। দিনের বেলা সেখানকার সরকারী কার্য্য শেষ করিয়া রাত্রি কালে তিনি সুশীলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাঁহার মৃত্যু সংবাদে কাতর হইয়া যখন পুনরায় নৌকায় উঠিতে যাইবেন, তখনই তীরদেশে কনককে দেখিতে পান। বোটে তাঁহার এক জন সহকারী ছিলেন, স্বাভাবিক অনুরাগে ঘরে পড়িয়া তিনি চিকিৎসা বিদ্যায় অনেকটা অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন বালিকা মৃত নহে। কিন্তু হাসপাতাল লইয়া যাইবার অপেক্ষা সহিবে না; যথাশীঘ্র বিশেষ যত্নশুশ্রূষা পাইলে রমণী প্রাণলাভ করিতেও পারে। এদিকে বিশেষ কার্য্যসূত্রে তখনি তাঁহাদের বোট না ছাড়িলেই নয়, তাঁহারা বালিকাকে বোটে তুলিয়া লইয়া, পুনর্জ্জীবিত করিতে সচেষ্ট হইলেন। মনে করিলেন আরোগ্য লাভ করিলে তাহার পরিচয় জানিয়া তাহাকে যথা স্থানে পৌঁছিয়া দিবেন।

তিন চারি দিন অতীত হইল, রমণীর পীড়া ক্রমে উপশম হইয়া আসিতে লাগিল। আরো তিন চারি দিনে একটু একটু করিয়া তাহার চৈতন্য লাভ হইল। তিনি যখন মানুষ চিনিতে পারিলেন তখন এই অপরিচিত যুবাদিগের মধ্যে আপনাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে কনকের সমস্ত ঘটনা অল্পে অল্পে স্মরণ হইতে লাগিল। সুশীলার মৃত্যু ও শবদাহের পর তাহার নদীতে পড়িয়া যাইবার কথা ক্রমে মনে পড়িল। তাহা ছাড়া যদিও আর কিছুই মনে করিতে পারিল না তবুও কনক বুঝিল তাহার পর ইহাঁরা তাহাকে বাঁচাইয়াছেন! কনক ভাবিল, ইহাঁরা কে? তাহাকে বাঁচাইলেন কেন? মরিলেই সব দুঃখ ফুরাইয়া যাইত, আবার তাহার যন্ত্রণা

ভোগের জন্য ইহারা কেন বাঁচাইলেন? ভাবিতে ভাবিতে হিরণকুমারের করুণ দৃষ্টিতে কনকের বিষণ্ণ দৃষ্টি সংলগ্ন হইল, অমনি কনকের চক্ষু নত হইয়া পড়িল, সেই পাংশুবর্ণ মুখ-মণ্ডলও ঈষৎ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। হিরণ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ কি আপনি ভাল আছেন?" চিকিৎসক তখন অপর কক্ষে ছিলেন। সহসা এই কক্ষে আসিয়া বলিলেন "বেশী কথা কইও না, এখনো বড় দুর্ব্বল।" কিন্তু হিরণ-কুমারের সেই সকরুণ সোৎসুক জিজ্ঞাসায় কনকের নতচক্ষু আবার উন্নত হইল, যেন বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ চিত্তে সে তাঁহার দিকে আবার চাহিল। কনকের জন্য সুশীলা ছাড়া কেহ কখনো উৎসুক হন নাই, আজ এই অপরিচিত যুবা তাহার জন্য কাতর হইবেন, ইহা যেন কনকের স্বপ্নবৎ বোধ হইল।

ক্রমে এক মাসের মধ্যে বালিকা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। সহকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন, হিরণকুমার বালিকার পরিচয় পাইয়া এলাহাবাদে বোট লইয়া যাইতে অনুমতি করিলেন। এলাহাবাদে পৌঁছিতেও প্রায় মাস খানেক লাগিল। এই একমাসে আস্তে আস্তে বালিকা যুবকের সহিত পরিচিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাহার লজ্জা ভাঙ্গিতে লাগিল। প্রথমে একটি কথা কহিতেও তাহার লজ্জা হইত, ক্রমে অল্পে অল্পে একটি দুইটি করিয়া তাহার কথা ফুটিল। একবার লজ্জা ভাঙ্গিয়া গেলে বালিকা একটী একটী করিয়া তখন কত গল্পই করিল। হিরণকুমারও তাহার সহিত আত্মীয়ের মতই ব্যবহার করিতে লাগিলেন। একদিন কনকের শয্যার নিকট বসিয়া হিরণকুমার একটী কথার পর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বালিকার গল্প শুনিতেছিলেন। কথার মধ্যে তিনি একবার জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আচ্ছা, তোমার বাবা যখন মরেন তখন তোমার বয়স কত? তখনকার কথা তোমার কি মনে আছে?"

কনক বলিল "কিছু কিছু মনে পড়ে বই কি। আমার বয়স আর তখন কত হবে—এই চার পাঁচ বছর।"

যু। উঃ! তোমার তত ছোট বেলার কথা মনে আছে—আশ্চর্য্য তো?

ক। আমার কষ্টের কথা গুলিই যেন বেশী মনে আছে—মা দাদাকে আদর করতেন—আমার এমন ইচ্ছা হোত—"

হিরণকুমারের চক্ষে জল আসিল তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন "এই হৃদয়ে যতদিন শোণিত-ধারা বহিবে ততদিন শত সহস্র জনক জননীর আদর আমি তোমাকে দিতে পারি।" কনক তাঁহার বিষণ্ণতায় কিছু আশ্চর্য্য হইল। কনকের বাল্যদুঃখে যুবা এতদুর দুঃখিত হইলেন যে তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইল! কই কনকের দুঃখে তো কেহ কখনো কাঁদে নাই; কনক বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে যুবাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। যুবা তাহার এই সন্দেহের ভাব যেন কিছু বুঝিতে পারিয়া মনে মনে দুঃখিত হইলেন। কিন্তু যুবার দিকে চাহিয়া কনক যখন তাঁহার সেই স্নেহপুর্ণ মুখকান্তি দেখিল, অবিশ্বাস করিয়াছিল বলিয়া তাঁহার সেই মমতাময় চক্ষের নীরব অথচ করুণ তিরস্কার দেখিতে পাইল, তখন আর কনকের সন্দেহ রহিল না, তাঁহার স্নেহে বালিকার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। এই বিশ্বাসই কনকের কাল হইল, এই স্নেহের পরিবর্ত্তে অজ্ঞাতভাবে সে আপন হৃদয় বিনিময় করিয়া ফেলিল।

হিরণ ব্যাকুলভাবে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—"তোমার দুঃখের কথাই মনে আছে, সুখের কথা কিছুই কি মনে পড়ে না?"

ক। পড়ে না যে তা না। ছেলে বেলা এক দিন একজন

অচেনা লোক আমাকে আদর করেছিলেন, আমার এখনো মনে আছে, মনে করতে এখনো এত ভাল লাগে !

যুবক বলিলেন "সে লোকটি কে ? যার আদরে তোমার মনে এতখানি সুখ দিয়েছে তার কি সৌভাগ্য ।"

কনক তখন ছেলেবেলাকার সেই গল্পটি করিল। হিরণ দেখিলেন তিনিই সেই গল্পের নায়ক। তিনি বহুদিন পূর্ব্বে কনকের প্রতি করুণা-পরায়ণ হইয়া তাহার পক্ষ লইয়া প্রমোদকে যে ভর্ৎসনা করেন সেই স্নেহময় ক্ষুদ্র ঘটনাটি বালিকার হৃদয়ে এখনো গাঁথা রহিয়াছে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন !

তিনি সে কথা আর না উঠাইয়া বলিলেন "কনক, তোমার দাদাকে চিঠি লিখেছি তা জান ? প্রমোদের না জানি কতই আহ্লাদ হবে ?"

কনক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল "তা কি হবে ?"

হি। ছিঃ! কেন কনক, তোমার ওরূপ অকারণ সন্দেহ হয় ?"

এই তিরস্কার বাক্যে কনকের মুখটি যেন আরো ম্লান হইয়া পড়িল; হিরণকুমার বলিলেন—

"কনক, বাড়ী যাবে, আবার তোমার সেই ভালবাসার ভাইটিকে দেখতে পাবে, কতদূর আহ্লাদ হচ্ছে, বল দেখি।"

কনক একটু থামিয়া থামিয়া বলিল "হাঁ আহ্লাদ হচ্ছে বই কি।"

হি। সেই স্নেহের রাজ্যে গিয়ে তোমার কি আর কখনো এখানকার এই অপরিচিত পরের কথা মনে পড়বে !

কনক এ কথার কিছুই উত্তর না করিয়া ভাবগর্ভ শূন্য-দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া হিরণের চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাহা ঢাকিতে তিনি সেই কক্ষ হইতে উঠিয়া বোটের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

মিলন

এইরূপে বোটের দিন গুলি কাটিতে লাগিল। বালিকার ক্রমে আরো লজ্জা ভাঙ্গিয়া গেল। হিরণকুমারের নিকট আস্তে আস্তে সে তাহার জীবনের কত গল্পই করিত, কতই অর্থহীন অমৃতময় আবল তাবল বকিত। কনক জীবনে কখনো আর কাহারো নিকট ওরূপ করিয়া গল্প করিতে পায় নাই, তাহার গল্প ওরূপ আগ্রহ সহকারে কেহই শুনে নাই। ছেলেবেলা যদি কখনো কোন কথা প্রমোদকে শুনাইতে যাইত, প্রমোদ বিরক্তির সহিত "কাজ আছে" বলিয়া উঠিয়া যাইতেন; এখন হিরণের সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা কহিয়া সে যেরূপ আনন্দ পাইত, এরূপ পরমানন্দ জীবনে আর কখনো পায় নাই। হিরণকুমারেরও বালিকার সেই সকল অসংলগ্ন এলোথেলো অথচ মর্ম্ম-গাঁথুনীতে গ্রথিত কথাগুলি যেরূপ প্রীতিপূর্ণ অর্থময় সারবচন বলিয়া মনে হইত এপর্য্যন্ত কোন দর্শনবিজ্ঞানে কোন মুনিবচনে তিনি সেরূপ আনন্দময় জ্ঞানের কথা শুনেন নাই। কত ঔৎসুক্যের সহিত কনকের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি সেই কথাগুলি পান করিতেন বলা যায় না। জীবনের কিছু শুনিতে তাঁহার ওরূপ মিষ্ট লাগে নাই, কিছু দেখিয়া তাঁহার ওরূপ অতৃপ্তিময় তৃপ্তি জন্মায় নাই। গল্প করিতে করিতে যদি কোন কাজে তিনি উঠিয়া যাইতেন, অমনি বালিকার হৃদয়-মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইত, সমস্ত স্ফূর্ত্তি চলিয়া যাইত, কতক্ষণে তিনি ফিরিয়া আসিবেন, কতক্ষণে সে তাহার গল্পটি শেষ করিবে এই ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠিত। তিনি ফিরিয়া আসিলে তবে সে আরামের দীর্ঘনিশ্বাস

ফেলিয়া বাঁচিত। ফিরিয়া আসিলেই সে অমনি কথা কহিতে পারিত না কিন্তু নীরব নয়নে তাঁহাকে কত মৃদু তিরস্কার করিত, মনে মনে বলিত "না, তোমার গল্প শুনিতে তোমাকে দেখিতে আমার যেমন ভাল লাগে কখনই তোমার তেমন ভাল লাগে না। হিরণ তাহা বুঝিয়া একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া একটু আদরের হাসি হাসিয়া বলিতেন "নিতান্ত দরকার ছিল তাই গিয়েছিলুম, দেখ দেখি কাজ অসমাপ্ত রেখেই আবার কত শীঘ্র ফিরে এসেছি।" অমনি বালিকা সকল ভুলিয়া যাইত, আবার গল্প করিতে আরম্ভ করিত, কিন্তু একটি গল্পও তাহার কখনও শেষ হইত না, একটি কথাও যেন তাহার ভাল করিয়া বলা হইত না।

কিন্তু তাঁহাদের সেই সুখ ফুরাইয়া আসিল। ক্রমে তাঁহারা এলাহাবাদে পৌঁছিলেন। তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা পাইয়া প্রমোদ মহা আহ্লাদের সহিত কনককে লইয়া যাইবার জন্য ঘাটে আসিলেন। কতদিন কনকের সহিত দেখা হয় নাই, আর যে কখনও দেখা হইবে তাহারও আশা ছিল না, মনে মনে কনকের রক্ষাকর্ত্তাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হিরণ প্রমোদকে যে ইংরাজি চিঠি লেখেন তাহাতে তাঁহার পূর্ণ নাম সই ছিল না। ইংরাজি দস্তুর মত পদবীর পূর্ব্বে শুধু নামের প্রথম অক্ষর মাত্র লিখিয়াছিলেন! প্রমোদ সেই জন্য কে যে কনকের রক্ষাকর্ত্তা তাহা জানিতে পারেন নাই। এখন হিরণকুমারকে তীরে নামিয়া হাস্যমুখে তাঁহার সম্মুখীন্ হইতে দেখিয়া সহসা প্রমোদ একটু পিছাইয়া দাঁড়াইলেন, সহসা তাঁহার মূর্ত্তি কেমন ভিন্নভাব ধারণ করিল। প্রমোদ দেখিলেন তিনি যাহাকে আন্তরিক ঘৃণা করেন, তিনি যাহাকে শত্রু বলিয়া জানেন সেই হিরণই কনকের উদ্ধারকর্ত্তা। কি দৈব! হিরণের নিকট হইতে প্রমোদের আজ এমন উপকার গ্রহণ করিতে হইল? কনকের মৃত্যুও যে ইহা অপেক্ষা ভাল ছিল!

হিরণকুমার প্রমোদের ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন, তাহাতে কিছু বিস্মিত হইলেন, কিন্তু ইহার কোন কারণই খুঁজিয়া পাইলেন না। প্রথম মনোবেগ কিছু শান্ত হইলে প্রমোদ ভাবিলেন "হিরণকুমার হাজার শত্রু হইলেও কনকের প্রাণ বাঁচাইয়াছে,"—এই ভাবিয়া মনের অসন্তুষ্টি-ভাব দমন করিতে চেষ্টা করিয়া হিরণকুমারকে নিতান্ত কষ্টস্বষ্টে সাধুবাদ দিয়া কনককে গৃহে লইয়া আসিলেন। প্রমোদের ব্যবহারে হিরণ সন্তুষ্ট হইলেন না।

কনক কতদিন পরে আজ প্রমোদকে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইল। প্রায় দুই মাসের পর বাড়ী আসিয়া কনক অনেক পরিবর্ত্তন দেখিল। দেখিল তাহার ভ্রাতার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহার একটি সঙ্গিনী জুটিয়াছে!

সুশীলার মৃত্যুর পর প্রমোদ সমস্ত বিভবের অধিপতি হইয়া নববধূ লইয়া এখন এলাহাবাদেই আছেন! প্রমোদ কলিকাতায় আর পড়েন না, স্ত্রী এবং বিদ্যা দুই রত্নের আদর এক সময়ে হয় না, প্রমোদের এখন পড়া সাঙ্গ হইয়াছিল। সুশীলার মৃত্যুর কিছু দিন পরেই প্রমোদের বিবাহ হইয়াছিল। সুশীলার মৃত্যু এবং কনকের জলমগ্ন সংবাদ তাড়িতভাবে পাইবামাত্র প্রমোদ বাড়ী আসেন। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কনকের দেহ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। এদিকে সুশীলার মৃত্যুর একমাস পরেই দয়ানন্দ কন্যা লইয়া এখানে আসিয়া কন্যার বিবাহ দিয়া গেলেন। কনকের মৃত্যুসংবাদে যামিনীনাথ অত্যন্ত হতাশ হইলেন, যে লোভে নীরজাকে ছাড়িলেন তাঁহার সে লোভও ব্যর্থ হইল।

বাড়ী আসিয়া কনক নববধূ নীরজার সহিত সাক্ষাৎ করিল, অমন সুন্দরী বধূ দেখিয়াও কনকের মনে হইল "দাদার সমযোগ্য বৌ হয় নাই।"

নীরজা এখানে আসিয়া অল্প দিনের মধ্যেই কুলবধূর মত হইয়া পড়িয়াছে, এখন আর সে আগেকার মত অরণ্যবালিকা নাই, এখন নীরজা প্রমোদের কাছে থাকিয়া সহরের অনেক হাবভাব কথাবার্ত্তা শিখিয়া ফেলিয়াছে। সংসারের কাজকর্ম্ম করা, ভদ্রতার অভিধানের চলিত কথাগুলি মুখস্থ করা, সাজসজ্জা করিয়া অন্যের কাছে নিজের সম্মান রক্ষা করা, এ সকলে সে নূতন দীক্ষিত হইতেছিল। দিন কতকের জন্য তাহার মনে যে বিষণ্ণ ভাব আসিয়াছিল তাহা গিয়া নীরজার হৃদয় এখন হর্ষোচ্ছ্বাসে পূর্ণ। মনের মত লোক পাইয়া এখন আর সে কাকাতুয়ার সহিত কথা কহে না, ফুল লইয়া খেলে না, এখন তাহার খেলা, আমোদ, গল্প, সকলি মানুষের সহিত। এখন লীলাময়ী যমুনার উপর, কুলস্থ বটবৃক্ষ পতনের মত নীরজার তরল স্বভাবে গৃহস্থের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে; এখন বনের পক্ষী পিঁজরায় আবদ্ধ হইয়া লোকরঞ্জন কথা কহিতে শিখিয়াছে; এখন বনবালা নীরজা আবার সাংসারিক নীরজা হইয়াছে। ক্রমে দিনে দিনে নীরজার সহিত কনকের বন্ধুতা জন্মিতে লাগিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মনের কথা

অন্তঃপুরে প্রমোদের শয়ন-কক্ষে বসিয়া, কনক নীরজার চুল বাঁধিয়া দিতেছিল। এ বড় সাধের চুল বাঁধা, প্রমোদের মনে ধরান চাই, কিন্তু প্রমোদের মনে ধরিবে কি না সে তো পরের কথা, কনকের এখন মনে ধরিলে হয়। কতবার যে কনক চুল খুলিয়া বাঁধিল তাহার ঠিক নাই,

তথাপি কনকের মনে ধরিল না, বাঁধাও শেষ হইল না, বেচারী নীরজাও আর সে চুল বাঁধা হইতে ত্রাণ পাইল না। এ বন্ধনের অন্ত নাই দেখিয়া নীরজা বলিল—

"নে ভাই, তোর কি আর হবে না? রাত হয়ে গেল যে!" কনক তাহার হেলিত মস্তক সমান করিয়া লইয়া বলিল—

"তুই, ভাই, সেই অবধি যে নড়ছিস্ তা কি করে হবে? নইলে এতক্ষণ হয়ে যেত। কতবার যে বাঁকা হয়ে গেল তাই খুল্‌তে হোলো। তুই, ভাই, বনে থেকে থেকে বনের হরিণের মত চঞ্চল হয়ে পোড়েছিস।"

নী। আহা বনের হরিণ হওয়ায় যে কি সুখ তা ভাই, তুই কি করে জানবি? না, ভাই—বনের এলো হরিণ হওয়ায় চেয়ে পোষা হরিণ হওয়াই ভাল।

ক। তুই সেই জন্যই বুঝি সাধ করে ব্যাধের হাতে ধরা দিলি?

নী। না, ভাই, আমি সাধ করে ধরা দিইনি।

ক। আমার দাদা তো পাখী শীকারে গেছলেন, তা তুই ধরা দিলি কেন?

নী। তা, ভাই সাধ করে কি ধরা দিলেম?

ধরা পড়লেম ফাঁদে,

নইলে কোথা হরিণবালা ব্যাধের লাগি কাঁদে?

তা, যাক, এখন তোর পায়ে পড়ি ভাই, শীঘ্র বেঁধে দে, হাজার বাঁকা হলেও এবার যেন খুলিস নে।

ক। কেন, এর মধ্যেই তোর সাধ ফুরুলো?, এই যে বাঁধবার সময় বল্লি, "সে দিনকার বাঁধাটা উনি প্রশংসা করেছিলেন, সেই রকম করে বেঁধে দেও।"

নী। উঁ, ভাই কি করব? আমার মাথা ব্যথা হয়ে গেছে আর পারিনে, ভাই। তুই এতক্ষণে বাঁধতে পারলি নে আমি কি করব?

কনক সোহাগভরে চুল বাঁধা রাখিয়া একটু অভিমান করিয়া বলিল—

"তবে এই রইল, আমি আর বাঁধব না, আমার মনের মত বাঁধতে দিবিনে তবে তোর যেমন ক'রে ইচ্ছা বাঁধ্‌গে।"

নী। রাগ! আচ্ছা আর বাপু বলব না, তুই যত ইচ্ছা দেরি কর, সেই কাল সকাল বেলা উঠিস্‌, আমার কি!

ক। অমনি আর কি? তোর ঐ এক কথায় বুঝি আমার রাগ যাবে? আজ তোকে পায়ে ধরে সাধাব তবে হবে। তুই যে বড় কথায় কথায় অভিমান করে দাদাকে সাধাস্‌, আমার বুঝি তাতে রাগ হয় না? আমি আজ তার শোধ তুলব?

নী। আচ্ছা তাই সই, কিন্তু ভাই সাধতে গেলেই গান গাইতে হয়, একটা সাধবার গান তুই আমাকে শিখিয়ে দে, আমি ভাই বুনোমানুষ ওসব গানের তো আমার বিদ্যে নেই।

কনক এই কথায় ঠাট্টা ছাড়িয়া বলিল—

"আমার তো অদৃষ্টে কখনো অভিমানের পর আদর ঘটেনি, চিরকাল অভিমান করে মনে মনেই কষ্ট সহ্য করে আসচি। কষ্টের গান ছাড়া তো আর আমি কিছুই শিখিনি যে তোকে শেখাব।"

কনক এই বলিয়া যেন কিছু বিষণ্ন হইল, পূর্ব্বের আমোদের ভাব ছাড়িয়া আপন মনে গুন গুন করিয়া গাহিতে লাগিল—

"কে আছে রে অভাগিনী, আমার মতন?
জানিনে কখনো কি বা সোহাগ যতন।
জনম দুঃখিনী, হায়! আপনারি ভাবি যায়
ছুঁতে যাই, অমনি সে হয় অদর্শন।

পরিমলে মাখামাখি একটী গোলাপ দেখি
আপনা ভুলিয়ে, আহা ! মোহময় হরষে,
তুলিতে গিয়াছি যেই, প্রফুল্ল কুসুম সেই
অমনি শুকায়ে গেছে এ হাতের পরশে।
একটী পুষেছি পাখী যদি ভাল বাসিয়ে,
ছদিনে খাঁচাটি ভেঙ্গে গিয়েছে সে পালিয়ে,
কাঁদিয়ে জনম গেল, কেহ তো বাসেনি ভাল,
অনন্ত এ অশ্রুধারা করেনি কেহ মোচন।"

গানটি খানিকক্ষণ শুনিয়া নীরজা বলিল—

"এই এতক্ষণ ভাই তুই কেমন ছিলি, কেন আমি মরতে গানের কথা পাড়লুম ! তোর এই রকম ভাব দেখলে আমার বড় ভয় হয়, জানি যে তা হ'লে সমস্ত দিনটাই তোর এইভাবে কাটবে।"

ক। তা কাটলোই বা ? তাতে কার কি এল গেল, ভাই ?

নী। তা বইকি ? আমার সঙ্গে যে তা হ'লে সমস্ত দিন কথা কইবিনে ? আমার যে একলাটি চুপ করে থেকে গুমরে মরতে হবে।"

ক। তা আমি নাইবা কথা কইলুম, তুই দাদার গল্প করিস, আমি শুনব এখন, তা' হ'লেই তো তোর হ'ল ?

নী। শুধু ওরূপ করে শুনিয়ে কি তেমন মজা হয় ?

ক। তবে আবার কি চাই ?

নী। হেসে গল্প করে না শুনলে আমি তোকে বলব না ত।

ক। তুই দেখিস দেখি, আমি হেসেই শুনব। তোর সুখের কথায় কি ভাই, আমার আমোদ হয় না ?

নী। আচ্ছা তা যেন তোর হয়, কিন্তু তুই ভাই মাঝে মাঝে অমন বিষণ্ণ হোস্ কেন ?

ক। কি করে তা বলব ?

নী। আপনার মনের কথা আর আপনি বলতে পারবি নে! তবে কি তোর দাদাকে ও কথা জিজ্ঞাসা করব নাকি?

ক। তা বইকি! আচ্ছা তুই বল দেখি সে দিন কাঁদ্‌লি কেন?

নী। সত্যি কথা বলব? তোর দাদার উপর অভিমান হয়েছিল।

ক। কেন গো?

নীরজা একটু হাসিয়া বলিল "ভাই, ও কথা জিজ্ঞাসা করিসনে। অভিমানের কারণ কিছুই নেই, শুধু শুধু।"

ক। আমারো ভাই তবে এরূপ ভাবের কারণ কিছুই নেই, তোকে আর কি বলব।

নী। দূর ভাই, তুই দেখছি ছাড়্‌বিনে। সে পাগলামীর কথা বলতে বড় লজ্জা করে, কিন্তু নিতান্তই শুনবি?

ক। যদি বলিস্।

নী। দেখ্ ভাই আমি নতুন তোর কাছে পান সাজতে শিখে, নিজে একটি পান সেজে বাইরে তাঁকে পাঠিয়ে দিই, রাত্রে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করলুম—খেয়েছিলে? তিনি বল্লেন, সেখানে একজন ভদ্রলোক থাকায় পানটি তাঁকে দিতে হয়েছিল। এতেই ভাই, আমার বড় দুঃখ হল।

তাহার অভিমানের কারণ শুনিয়া কনক একটু হাসিয়া বলিল "তোর, ভাই এত অল্পে অভিমান হয়?"

নীরজা একটুখানি লজ্জার হাসি হাসিয়া বলিল "আমিতো এখন তোকে সব খুলে বল্লুম—এবার তুই বল দেখি তোর বিষণ্ণ ভাবের কারণ কি?

ক। কেন ভাই, তোর যখন এত অল্পে দাদার উপর অভিমান হয়, আমি দাদাকে এত ভালবাসি যখন ভাবি তিনি আমাকে ভালবাসেন না, তখন কি দুঃখ হয় না?

এই কথা শুনিয়া নীরজার অতিশয় আহ্লাদ হইল। প্রমোদকে কেহ ভালবাসে শুনিতেও নীরজার ভাল লাগে। যদি কেহ নীরজার প্রিয়পাত্র

হইতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে প্রমোদের প্রশংসা করাই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির একটি সহজ ও অকাট্য উপায়।

নীরজা কনকের কথায় আহ্লাদে হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা ভাই, সত্যি তুই তোর দাদাকে খুব ভালবাসিস্? তোর দাদাও তোকে খুব ভালবাসেন, আর দুঃখ কর্‌তে হবে না ?"

ক। তোমার আর আমাকে প্রবোধ দিতে হবে না।

নী। আচ্ছা, তা দিচ্ছিনে কিন্তু বল্ দেখি, দাদাকে সত্যিই খুব ভালবাসিস ?

ক। কেন? তাতে তোর রাগ হয় নাকি? সেজন্য যেন আবার দাদার উপর অভিমান করে বসিস্‌নে। হাঁ, খুব ভালবাসি, তোর চেয়েও ভাল বাসি।

এই কথায় আহ্লাদে চলচল ভাবে নীরজা বলিল—"তোর দাদাটি যে মিষ্টি তা আর বাস্‌বিনে। কিন্তু ভাই, দেখিস্ আমাকে ফাঁকি দিস্‌নে ?"

ক। নে ভাই, তোর ঐ এক পচা, পুরাণ, জঘন্য ঠাট্টা রেখে দে, আর বুঝি ঠাট্টা জানিস্‌নে ?

নী। আমি ঐ ঠাট্টাটি নতুন যে ভাই শিখেছি, তা তোর আজ এখন মন ভাল নেই, এখন যে কি রকম ঠাট্টা তোর ভাল লাগ্‌বে, তাতো জানিনে। তোর দাদার মত করে ঠাট্টা করব ?

বলিয়া নীরজা কনকের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহার চিবুক ধরিয়া গাহিল—

আয়লো, সরলে, প্রাণের প্রতিমা,
আয়লো, হৃদয়ে রাখি,
কতদিন হতে রয়েছি আশায়,
কি বলিব বল সখি ?

আয়, আয়, ভাই, তেমনি করিয়ে
গা না লো মধুর গান,
কি মোহিনী গুণ আছে ঐ গানে
পাই যেন নব প্রাণ ;
পেয়েছি তোরে লো হাসিব এখনি
ভুলিব প্রাণের জ্বালা,
ও হাসি হেরিলে আঁধার এ হৃদে
জোছনা ভাতিবে, বালা।
স'রে আয়, সখি ভাল করে দেখি,
আজি এ কেমন বেশ !
নয়ন কমল, জলে ঢল ঢল,
এলানো ছড়ান কেশ !
পারিনে, পারিনে, দেখিতে পারিনে
ও মুখ তোমার ম্লান,
মরমের শিরে কি যে বেঁধে গেল
ফেটে উঠে যেন প্রাণ।
সরলে আমার, সর্ব্বস্ব ধন,
আয়লো, হৃদয়ে আয়,
ভাঙ্গা চোরা এই হৃদয় আমার
চিরদিন তোরি, হায় !
তোমারি কারণে জীবন ধারণ,
আমি যে তোমারি, সখি,—
প্রমোদ-মাখানো প্রাণের প্রতিমা,
আয় তোরে হৃদে রাখি।

ভাই, তোর দাদার কাছে গানটি শিখেছি।

কনক নীরজার দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া চাহিয়া তাহার গানটি শেষ হইলে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—

"দাদার কাছে শিখেছিস্, বেশ করেছিস্, এখন এদিকে মুখ ফিরিয়ে আমার যে কাজ বাড়ালি, তার কি বল্ দেখি? তুই ভাই, আজ দেখ্ছি কোন মতে ভাল করে চুল বাঁধতে দিবিনে।"

নীরজা অপ্রস্তুত হইয়া হাসিয়া বলিল "তোর দাদার কথায় আমার ভাই জ্ঞান থাকে না; না, ভাই, আর কর্‌ব না, এবার বেঁধে দে।"

নীরজার অসাবধানতায় অর্দ্ধবিনায়িত একটি বিনুনী যে কনকের হস্তচ্যুত হইয়া অল্প খুলিয়া গিয়াছিল, সেইটি কনক আবার হস্তে তুলিয়া বিনাইতে বিনাইতে বলিল—"গানটি ভাই কিন্তু বেশ। গানটি গেয়ে বুঝি দাদা তোর অভিমান ভাঙ্গিয়েছিলেন? অত অভিমান করিস্ কেন, ভাই?"

নী। তুই অত দুঃখ করিস্ কেন ভাই।

ক। নে, ভাই, তুই আবার আমার অত দুঃখ পেলি কোথা?

নী। পাব আর কোথা? দেখতে পাই। ছিঃ! ভাই দাদার উপর কি মিছে দুঃখ কর্‌তে আছে? তাঁর হোল কনকগত প্রাণ।

ক। অল্পেতেই কথায় কথায় তোর যে অভিমান, কনকগত প্রাণ হ'লে কি আর রক্ষা থাকৃত!

নী। না, ভাই, তাতে কি অভিমান করি?

ক। এখন বাসেন না তাই, দেখা যেত, বাসলে কর্‌তিস্ কি না।

নীরজা বলিল "আমার সোণার চাঁদ কনক, তোকে পেয়েছি কত ভাগ্যি, তোকে ভালবাসলে কি রাগ করতুম? আমার ভাই ভাগ্যি যে তুই জলে ডুবে মরিসনি, তা হ'লে এমন ক'রে ব'সে কার সঙ্গে গল্প করতুম? আচ্ছা, ভাই কনক, তোকে তীরে দেখে যখন হিরণ-কুমার বোটে তুলে নিয়ে গেল, তখন তোর কি একটুও জ্ঞান ছিল না?"

ক। আবার সেই জলে ডোবার গল্প? কত বার ঐ এক গল্প করব? এই নে ভাই, চুল বাঁধা এবার শেষ হোলো।

তখন নিস্তার পাইয়া কনকের দিকে ফিরিয়া বসিয়া নীরজা বলিল—

"তা করলিই বা, এক গল্প কি আর দু'বার করতে নেই নাকি? আচ্ছা ভাই, বাড়ীর লোকেরা তোকে কেউ পেলে না কেন? ভাল করে খুঁজলে কি আর পেতো না?"

ক। বাড়ীতে আর কে ছিল বল্? শুধু চাকর দাসী? তা তারা মায়ের দাহ কার্য্যেই ব্যস্ত। তারপর তারা বোধ হয় এক দিকে খুঁজতে খুঁজতে হিরণকুমার অন্য দিক থেকে ততক্ষণে আমাকে বোটে তুলে নিয়েছেন।

নীরজা বলিল "ভাগ্যে হিরণকুমার তোকে দেখতে পেয়েছিল!"

কনক আর কিছুই উত্তর করিল না, এই জলমগ্নের কথায় কনক আরো বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। দেখিয়া নীরজা বলিল—

"কথায় কথায় তবু তোর বিষণ্ণতা ঘুচে এসেছিল, আবার ভাই, সেভাব কেন বল দেখি? তুই ভাই, বাস্তবিক কি একটি কথা আমার কাছে ঢাকিস্। তুই আমাকে তোর দুঃখের যে কারণ বলিস্ তা ছাড়া আর একটা কি নিশ্চয়ই তোর মনে আছে।"

কনক এই কথাটি শুনিয়া আর থাকিতে পারিল না, তাহার চক্ষু হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রু ধীরে ধীরে ভূমিতে পতিত হইল। নীরজা বুঝিল, তাহার অনুমান ঠিক না হইয়া যায় না! ব্যথিত হৃদয়ে বলিল "বল্‌না ভাই, তুই আমার কাছে কি কথা ঢাকছিস? কনক আমি তো ভাই, তোর কাছে কিছু ঢাকি নে।"

নীরজার স্নেহবাক্যে কনকের অশ্রু আরও উথলিয়া উঠিল। নীরজার আর সন্দেহ মাত্র রহিল না! কনকের হৃদয়ে যে একটি লুকানো ব্যথা জাগিতেছে এবং ব্যথাটা যে কিছু গুরুতর রকমের,

মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া সে ভাবিল "কিন্তু কেন? কনকের কথা বিশ্বাস করতে গেলে এর কোন কারণই নেই। তাও নাকি হয়? কনক কি কাউকে ভালবেসেছে নাকি? আমি যখন প্রমোদকে ভালবেসেছিলুম তখন প্রমোদের নাম শুনলেই, প্রমোদের কথা মনে এলেই, এমন কি তাঁর সঙ্গে যে ফুলটি পর্য্যন্ত একত্রে দেখেছি সে ফুলটি দেখলেও মনটা কি ভয়ানক ব্যাকুল হয়ে পড়ত, আপনা হতেই কেমন চোক দিয়ে জল আসত। এতো তাই নয়? কিন্তু কনক ভালই বা কাকে বাসবে? প্রণয়ের পাত্র কই?" নীরজার মনে হইল "অনেক দিন কনক হিরণের সহিত একত্রে বাস করেছিল, হিরণই তাকে বাঁচিয়েছে; হিরণকে তো সে ভালবাসে নি? নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই তাই।" নীরজা কনকের হাতটি ধরিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল "কনক তুই কি কাউকে ভালবেসেছিস? বল্‌না ভাই? তুই কি হিরণকে ভালবাসিস্?"

হিরণের নাম শুনিয়া কনকের মুখটা একটু আরক্তিম হইল, ক্রমে আবার সেই আরক্তিম বিষণ্ণ মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া আসিল, কনকের অধর প্রান্তে একটু যেন সলজ্জ হাসির রেখা পড়িল। তাহাকে নিরুত্তর এবং তাহার ভাব দেখিয়া নীরজা বুঝিল কনক যথার্থই হিরণকে ভালবাসে। বুঝিয়া কিন্তু নীরজা মনে মনে দুঃখিত হইল। প্রমোদের নিকট হিরণের কথা নীরজা যেরূপ শুনিয়াছিল, তাহাতে সে তাহাকে স্বামীর শত্রু ও নিতান্ত মন্দ লোক বলিয়াই জানিত। যে তাহাদের শত্রু, মন্দ লোক বলিয়া যাহাকে তাহারা ঘৃণা করে তাহাকে কনক ভালবাসিবে এ কথা মনে করিতেও তাহার কষ্ট হইল। যদি কোন মতে কনকের মন হইতে সে ভালবাসা ঘুচাইতে পারে এই চেষ্টায় বলিল—

"কেন ভাই, তাকে তুই ভালবাস্‌লি? সে ভারী খারাপ লোক,

যে তোর ভাইকে খুন করতে গিয়েছিল, তাকে ভাই তুই ভালবাসলি ? তাকে ভালবেসে তুইত সুখী হবিনে।"

নীরজা বালিকা জানে না যে, প্রণয়ের মূল উৎপাটন করিতে গেলেই আরো দৃঢ় হইয়া বসে। নীরজার কথায় কনকের বিষণ্ণ মুখমণ্ডল যেন সহসা জ্বলিয়া উঠিল, অশ্রুবারি শুকাইয়া গেল, কনক ধীর-গম্ভীর ভাবে বলিল—

"হিরণ খারাপ লোক নন, হিরণ কখনও খুন করতে যান নি, এ কথা যে তোমাদের বলেছে সে মিথ্যাবাদী, তাঁকে না জেনে কেন দোষ দাও ? তাঁর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক না থাকলেও একজন সত্যিকার ভাল লোকের মিথ্যা নিন্দা আমি কেমন ক'রে শুনব ?"

তখন নীরজা কেবল ঈষৎ ঘৃণা-ব্যঞ্জক-স্বরে বলিল—"ওঃ এত দূর ?"

এই স্থানে তাহাদের কথোপকথন বন্ধ হইল, দুজনের মনের ভাব দুজনে বুঝিয়া দুজনেই নিস্তব্ধ হইয়া গেল। কনক ভাবিয়াছিল, একদিন তাহার মনের কথা নীরজাকে বলিয়া সে একজন ব্যথার ব্যথী পাইবে। কিন্তু আজ বুঝিল সে আশা বৃথা।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হৃদয় প্রকাশ

প্রত্যূষে গঙ্গা তীরে সোপানের উপর বসিয়া কনক গুণগুণ করিয়া গান গাহিতেছিল। গান গাওয়া কেমন কনকের অভ্যাস, সে সর্ব্বদাই প্রায় আপন মনে আস্তে আস্তে গান না গাহিয়া থাকিতে পারে না। গাহিতেছিল,

এ জনমের মত সুখ ফুরায়ে গিয়াছে সখি,
এখনো তবুও হৃদে জ্বলিছে দুরাশা একি ?
জানি এ অভাগী ভালে সুখ নাই কোন কালে,
দুরন্ত পিপাসা তবু থামিবার নহে দেখি।
এত যে যতন করি এ জ্বালা নিভাতে নারি,
প্রেমের এ দাবানল জ্বলি উঠে থাকি থাকি ॥

গুণগুণ করিয়া বালিকা কিছু পরে থামিল। তাহার জলমগ্ন ঘটনাটি মনে পড়িয়া গেল; আজ ডুবিলে তাহাকে রক্ষা করিবার কেহই নাই, আজ আর হিরণকুমার তাহাকে বাঁচাইতে আসিবেন না। বালিকা ভাবিতে ভাবিতে সাশ্রুনেত্রে, গঙ্গাবক্ষঃস্থিত প্রাতঃসমীরণতরঙ্গিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা বিক্ষেপ দেখিতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে সেই তরঙ্গ-স্রোত ভঙ্গ করিয়া একখানি নৌকা তীরে আসিয়া লাগিল, কনকের বিস্মিত, মুগ্ধ নেত্রের সম্মুখে সত্যই হিরণকুমার নৌকা হইতে নামিয়া তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ক্ষণকাল কাহারও মুখে কোন কথা ফুটিল না। উভয়েই যেন মন্ত্রমুগ্ধ; উভয়েই যেন চিরপরিচিত অথচ উভয়েই যেন চির অপরিচিত; উভয়েরই হৃদয় পূর্ণ অথচ উভয়েরই মুখে কোন কথা নাই। কিছুক্ষণ পরে হিরণ বলিলেন "আমি এবার বেহারে যাচ্ছি, চারিটি দিন শুধু আমার হাতে তাই;—কনক তোমার দাদার সঙ্গে কি এখন দেখা হবে ?"

কনক বলিল—"দাদা ত এখানে নেই, কলকাতায় গেছেন—"

হি। কবে আসবেন ?

ক। আজই রাত্রে আসতে পারেন—নয়ত কাল।

আবার কিছুক্ষণ উভয়ে চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা আত্মহারাভাবে হিরণকুমার বলিলেন,—

"কনক তুমি এখানে স্নেহের রাজ্যে সুখে আছ কিন্তু আমি নিতান্তই অসুখী। তোমা ছাড়া হ'য়ে অবধি আমি সুখ হারিয়েছি, শান্তি হারিয়েছি, পৃথিবীতে আমার আর যেন কেহ নেই কিছু নেই। শয়নে স্বপনে সকল সময়েই তোমার ঐ কনক প্রতিমা বই আর কিছুই দেখিতে পাইনে,—কনক তুমি আমাকে পাগল করে তুলেছ—"

হিরণকুমার মনের আবেগে রুদ্ধশ্বাসে সমস্ত কথাগুলি বলিয়া গিয়া নিশ্বাস লইবার জন্য থামিলেন। আশ্চর্য্যের কথা কিনা জানি না, কনকের পরদুঃখকাতর কোমল মনে হিরণকুমারের এই দুঃখের কথায় দুঃখ হইল না, বরঞ্চ ইহাতে বালিকার দুঃখসিক্ত হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ সমীরের হিল্লোল বহিল। হিরণকুমার আবার বলিলেন—"কনক এ অশান্ত মনকে কিছুতে বাঁধতে না পেয়ে শেষে তোমার কাছে এসেছি, আমার একটি কথার উত্তর দাও। তোমার একটি কথার উপর আমার জীবন মরণ নির্ভর করছে। কনক আমার এই উন্মত্ত ভালবাসার কি প্রতিদান পাব?"

কনক মনে মনে বলিল—"যদি বুক চিরিয়া দেখাইবার হইত ত দেখিতে কাহার ভালবাসা বেশী উন্মত্তকর?" কিন্তু তাহার মনের কথা মনেই রহিল, মুখে ফুটিল না। হিরণ তাহার মৌনভাবে আশ্বস্ত হইয়া আবার বলিলেন—"কনক বল বল, আর সন্দেহের ব্যাকুলতায় রেখোনা। তুমি নিজে হন্তারক না হলে আমার সুখে বাধা দেবার আর কে আছে? আমি তোমার কর প্রার্থনা করলে প্রমোদের তাতে অসম্মত হবার কোন কারণই নেই। তোমার জীবন রক্ষা যে করেছে আর কিছু না হোক্ সে তাঁর কৃতজ্ঞতার ভাজন। কিন্তু তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞতা চাইনে। ভালবাসার উত্তর ভালবাসা। কনক, আমি কি তোমার ভালবাসা পাব?"

কনক কোন উত্তর করিল না, সে ভাবিতেছিল সত্যই কি প্রমোদ

হিরণকুমারের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন, কেনই বা গ্রাহ্য না করিবেন? দুজনের দেখা শুনা কথাবার্ত্তা হইলে প্রমোদের ভ্রম নিশ্চয়ই ঘুচিয়া যাইবে। হিরণকুমারের মহত্ত্বে, সাধুতায় তিনি অবশ্যই মুগ্ধ হইবেন।

এদিকে দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব গগন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ঘাটে ঘাটে গঙ্গাস্নানে আগমনকারী বয়স্কা রমণীগণের কথোপকথনধ্বনি উত্থিত হইয়া প্রশান্ত গঙ্গাবক্ষ সমধিক চঞ্চল করিয়া তুলিল। কনকের যেন মোহ ভাঙ্গিল। একজন অপরিচিত পুরুষের সহিত এই বিজনতটে তাহাকে একাকী গল্প করিতে দেখিলে অন্যেরা কি মনে করিবে? প্রমোদই কি ইহা জানিলে সন্তুষ্ট হইবেন? হিরণকুমারের প্রতি তাহার বিদ্বেষভাব কি আরও বর্দ্ধিত হইবে না? এই ভাবিয়া সহসা তাহার মুখকান্তি মলিন হইয়া পড়িল। কনক অনেকবারই ভাবিল, প্রমোদের তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাবের কথা হিরণকুমারকে বলিবে, কিন্তু পারিয়া উঠিল না, কোন মতেই যেন তাহার সে অবসর ঘটিল না। হিরণেরও সহসা চমক ভাঙ্গিল, বুঝিলেন, প্রমোদ এখানে নাই, অধিক ক্ষণ তাঁহার আর এখানে থাকা ঠিক হইতেছে না। কনকও তাঁহাকে সেই কথা বলিবে ভাবিতেছে, কিন্তু তিনি আগেই বলিলেন, "কনক এখনি আমার যেতে হবে, আর সময় নেই, তুমি আমার কথার উত্তর দাও, বল তুমি আমাকে ভালবাস?"

কনক আর সমস্ত ভুলিয়া সলজ্জে অবনত মুখে বলিল—"বাসি।" এই কথাটীতে হিরণের মাথার ভিতর দিয়া চকিতের মধ্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন ঘুরিয়া গেল, হৃদয়ের দ্বারে শোণিত উচ্ছ্বাস বেগে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তিনি কি বলিবেন, কি করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া কনকের হাতখানি দুই হাতে ধরিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে আনন্দকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "কত দিন কত সময় অন্তরে নিদারুণ শূন্যতা উপলব্ধি করে, কি সুতীব্র নিরানন্দে অভিভূত হয়ে পড়েছি। জীবনের মঙ্গল

উদ্দেশ্যে পর্য্যন্ত তখন সন্দেহ জন্মেছে, বিধাতাপুরুষকে পর্য্যন্ত কত না অভিশাপ প্রদান করেছি। আজ মনে হচ্ছে,—এ ভালবাসা এ আনন্দ যার জন্যে সঞ্চিত ছিল তার মত সার্থক জীবন আর কার! তার মত বিধাতার প্রিয়পুত্র আর কে?" হিরণ আনন্দে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইলেন। কনকেরও দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল। হিরণ আবার বলিলেন, "কনক সত্যই কি তুমি আমার? কেবল মনে নয়, আমার নয়নেও কি তুমি এখন থেকে চিরবিরাজিত, চিরপ্রকাশিত হয়ে থাকবে? কেবল অন্তরে নয়, বাইরে জগৎসংসারের সাক্ষাতেও কি এখন থেকে তুমি আমার চির আপনার হ'য়ে, গৃহলক্ষ্মী রূপে বিরাজ করবে? কে জানে এত সৌভাগ্য মনে করতেও যেন কেমন আশঙ্কা হয়। কনক আজ তবে এখন বিদায় লই। কাল আবার তোমার দাদার সঙ্গে দেখা করতে আসব।"

বলিয়া তিনি নৌকায় উঠিলেন, দাঁড়িরা ক্ষিপ্রহস্তে দাঁড় বাহিয়া অল্প ক্ষণের মধ্যেই পরস্পরের দৃষ্টিপথ হইতে পরস্পরকে দূরে লইয়া ফেলিল; কিন্তু মুগ্ধ প্রণয়ী দুই জন তাহার পরও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সতৃষ্ণনেত্রে পরস্পরের উদ্দেশে শূন্য পথে চাহিয়া রহিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রস্তাব

কনক জীবিত শুনিয়া যামিনীনাথ তাহার পরিণয়াকাঙ্ক্ষী হইলেন। তাহার মত স্বামী পাওয়া কনকের ত পরম সৌভাগ্য, এই ভাবিয়া প্রমোদ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন, এবং কলিকাতায় গিয়া সমস্ত স্থির করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। এখন কেবল কনকের মত লইয়া

দিন স্থির মাত্র বাকী রহিল। প্রমোদ নব্য তন্ত্রাবলম্বী, তিনি বাল্য-বিবাহের বিরোধী, স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী সুতরাং বিবাহ সম্বন্ধেও স্ত্রাপুরুষের স্বাভিমত বিবাহ ইহাঁর মনোনীত। অবশ্য তাঁহার ইচ্ছা জানিলে কনক যে প্রসন্ন হৃদয়ে ইহাতে সম্মত হইবে, এবিষয়ে প্রমোদের বিন্দুমাত্র সংশয় উপস্থিত হয় নাই।

বাড়ী আসিয়া সেরাত্রিতে কনককে তাঁহার কিছু বলা হইল না, পরদিন প্রাতঃকালে বাহির বাটীতে তাঁহার বসিবার কক্ষে তিনি কনককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কনক যখন সেই কক্ষে প্রবেশ করিল তখন প্রমোদ একটী টেবিলের উপরে হস্তে মস্তক রক্ষা করিয়া চিন্তামগ্ন ছিলেন, কি ভাবিতেছিলেন জানি না, কিন্তু চক্ষু সমধিক চঞ্চল ও সমুজ্জ্বল, প্রফুল্ল মূর্ত্তি সমধিক ঔৎসুক্যপূর্ণ প্রফুল্লতাব্যঞ্জক, তিনি যে কোন সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছিলেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কনক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"দাদা আমাকে ডেকেছ ?" প্রমোদ হাসিয়া বলিলেন—"হাঁ বোন্, তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

কনক টেবিলের নিকট চৌকিতে বসিয়া আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল "কি কথা ?"

প্র। একটা বড় সুখের কথা। আচ্ছা আন্দাজ কর দেখি। কনক অনেক ভাবিয়া বলিল "না পারছি নে, তুমি ভাই বল।"

প্র। বল্লে কি পুরস্কার দিবি ?

ক। যা চাও তাই দেব, তুমিতো আগে বল।

কনকের কৌতূহল দেখিয়া প্রমোদ অনেকক্ষণ এ কথা ও কথা কহিয়া তাহাকে অনেক জ্বালাইয়া অবশেষে বলিলেন—"একটী বেশ ভাল বরের সঙ্গে তোর সম্বন্ধ করেছি, শীঘ্র বিয়ে হবে, কেমন সুখবর কিনা।" শুনিয়া কনক চমকিত হইল, তাহার শোণিত বেগে বহিতে লাগিল, মুখ

ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। কনকের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া প্রমোদ ভাবিলেন "উহা লজ্জার চিহ্ন।" প্রমোদ একটু একটু করিয়া বরের নামধাম রূপগুণ বর্ণনা করিয়া চলিলেন। বরটি কেমন দেখিতে, কেমন লেখাপড়া জানে, কেমন সৎস্বভাব, প্রমোদের কেমন হৃদয় বন্ধু, এই সকল পরিচয় দিয়া বলিলেন "কেমন?—শুনে কেমন মনে হ'ল? বেশ বর নয়? আরো ভাল করে জানতে চাস? যামিনী বাবু।"

কনক যামিনীনাথকে এলাহাবাদে ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছে।

যতক্ষণ সহর্ষে প্রমোদ তাঁহার কল্পিত ভাবী ভগিনীপতি যামিনী বাবুর পরিচয় দিতেছিলেন, কনক ততক্ষণ কাতরচিত্তে ভাবিতেছিল—"বিবাহ! ইহা সুসংবাদ! কি সর্ব্বনাশ কনক অন্যের পত্নী হইতে চলিল! হিরণকে আর কখনও দেখিতে পাইবে না! হিরণের চিন্তা পর্য্যন্ত পাপ, উঃ! কি ভয়ানক!" বালিকার সমস্ত শোণিত চমকিয়া উঠিল। সমস্ত হৃদয় ভাবনায় আলোড়িত হইয়া পড়িল। বালিকা কখনও ভ্রাতার কথায় কথা কহে নাই, প্রমোদ যাহা বলেন তাহাই দেববাক্য-সদৃশ তাহার শিরোধার্য্য, কিন্তু আজ তাঁহার কথায় সে কথা না কহিয়া থাকিতে পারিল না, যন্ত্রণা-কম্পিত স্বরে বলিল, "দাদা, আমি বিয়ে করব না।"

প্রমোদ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন না, ভাবিলেন বিবাহের কথায় প্রথমে তো স্ত্রীলোকেরা 'না' বলিয়াই থাকে, তাহাকে লজ্জা হয় বৈকি?

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কনক, তার আর লজ্জা কি? আজ হ'ক কাল হ'ক বিয়ে তো হবেই, তবে আর লজ্জা করে কি হ'বে?"

কনক আবার বিষাদ-ব্যঞ্জক গম্ভীর-স্বরে বলিল, "দাদা, আমি বিয়ে করব না।"

প্রমোদ দেখিলেন সে লজ্জার স্বর নহে, সে স্বরে কিছুমাত্র বেসুর নাই, তাহা সুস্পষ্ট, গম্ভীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক। প্রমোদ বুঝিলেন, কনক যথার্থই তাহার মনের কথা বলিতেছে। প্রমোদ আশ্চর্য্য হইলেন, অথচ

তাহার বিবাহের অনিচ্ছার বিশেষ কোন কারণ না পাইয়া ভাবিলেন, বিবাহ হইলে প্রমোদকে ছাড়িয়া শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইবে, এই ভয়ে বুঝি কনকের বিবাহে আপত্তি। প্রমোদ বলিলেন "বিয়ে হ'লেই সব ছেড়ে শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে বোলে বুঝি তোর যত ভয় ? সে ভয় নেই, তোর যত দিন ইচ্ছা এখানে থাকিস্, শেষে তোকে থাকবার জন্য সাধাসাধি কর্‌তে না হলেই বাঁচি।"

কনক মৃদু স্বরে বলিল "না, দাদা, আমার এখন বিয়ে কেন ?"

প্রমোদ হাসিয়া বলিলেন, "চিরকাল আইবড় থাকৃবি না কি ? অত লজ্জায় কাজ নেই। এখন বল্‌দেখি বিয়ের আগে তাকে এখানে ডাকব কিনা ?" কনক তবুও আবার "বিয়ে কেন ?" বলায় তাঁহার বিস্ময় ক্রমশঃ ক্রোধে পরিণত হইতে লাগিল। কনক কখনও তাঁহার মতে অমত প্রকাশ করে নাই ; কখনও একটি সামান্য বিষয়েও কনকের নিকট হইতে তাঁহার প্রতিবাদ সহ্য করিতে হয় নাই ; বাল্যকাল হইতে তাঁহার ইচ্ছাতেই কনকের ইচ্ছা গঠিত হইয়াছে, তাঁহার মতেই কনক মত দিয়া আসিতেছে। কনকের এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অধীনতায় তিনি এতদূর অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে ইহাই তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়া বোধ হইত। আজ বিনা কারণে তাঁহার ইচ্ছার বিপরীতে, বিবাহের বিরুদ্ধে কনকের ঐরূপ জেদ দেখিয়া প্রমোদ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তথাপি কষ্টে আত্মসংযম করিয়া খানিক ক্ষণ ধরিয়া অনুনয় বিনয় যুক্তি উপদেশ দ্বারা তাহাকে স্বমতে আনিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কোন প্রকারে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অবশেষে অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়া রোষগম্ভীর-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কেন ? বিয়ে করবি নে কেন ?

'ইচ্ছা নাই' এই উত্তর ছাড়া অন্য উত্তর বালিকা কি দিবে ? সে আর কোন উত্তরই খুঁজিয়া পাইল না।

প্রমোদ আবার বলিলেন, "কেন বিবাহ করবি নে আমাকে বুঝিয়ে দে, তোর আপত্তি কিসে?"

বালিকাকে নিরুত্তর দেখিয়া উত্তরোত্তর অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বারম্বার করিয়া ঐ এক কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রমোদ স্বভাবতঃ উদ্ধত এবং চিত্তদমনে অপটু, মনের বেগ অনুসারেই কার্য্য করিতে অভ্যস্ত, ভগিনীকে এই প্রকার নিরুত্তর দেখিয়া সরোষে টেবিলে আঘাত করিয়া আবার বলিলেন,—

"কেন বিবাহ করবে না বল।"

বালিকা ভীত কম্পিত হইয়া পড়িল, তাহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল, কি উত্তর দেওয়া উচিত, কি অনুচিত, তাহা ভাবিবার ক্ষমতাও রহিল না। হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে সেই একই উত্তর ধ্বনিত হইয়া উঠিল—"আমার বিয়ে করতে ইচ্ছা নেই।"

"তোমার ইচ্ছা! বাঙ্গালীর মেয়েদের আবার বিবাহে ইচ্ছা অনিচ্ছা কি? তোর ইচ্ছার উপর বিবাহের কি নির্ভর করছে? আমার ইচ্ছাই কি যথেষ্ট নয়?"

বালিকা আর উত্তর দিতে পারিল না। যে উত্তর দিয়া ফেলিয়াছে, তাহাতেই যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, শুষ্ক ওষ্ঠাধর ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল—বিশাল চক্ষুর শূন্যদৃষ্টি শূন্যেই সংলগ্ন হইল। তখন প্রমোদ ক্রোধকম্পিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,

"আমার ইচ্ছাই যথেষ্ট, আমি যে তোর ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করেছিলেম সে অনুগ্রহ মাত্র। তোর ইচ্ছা শুনতে চাই না, আমার ইচ্ছাতেই তোর বিবাহ করতে হবে।"

তখন বালিকা যেন কোন দৈব শক্তিতে উত্তেজিত হইয়া, যেন নিরাশার অপ্রতিহত তেজে উত্তেজিত হইয়া বলিল,

"দাদা অনিচ্ছায় বিবাহ করতে নেই, একি তোমার কাছেই শিক্ষা পাই নি! তুমি আজ নিজের কথার ব্যতিক্রম করবে?"

প্রমোদ এই কথায় সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "হাঁ আমার সেই নির্ব্বুদ্ধিতার ফল আজ পেলেম বটে। আচ্ছা তোর বিবাহ করতে ইচ্ছা নেই, আমারও আর তোকে খাওয়াতে পরাতে ইচ্ছা নেই। তোর যা ইচ্ছা তাই কর। আমি তোর মুখ দেখতে চাই নে, দূর হয়ে যা।"

এই খাওয়া পরার কথাগুলি বালিকার হৃদয়ে বড়ই লাগিল, কথাগুলি হৃদয়ের স্তরে স্তরে বিদ্ধ হইল। সামান্য অন্নবস্ত্রের কথা লইয়া প্রমোদ তাহাকে আজ মর্ম্ম-পীড়িত করিতে পারিলেন! বালিকা আর মনোবেগ সামলাইতে পারিল না। কষ্টে দুঃখে তাহার মস্তক আপনিই নত হইয়া পড়িল। যন্ত্রণার অনলাশ্রুতে নয়ন ভাসিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া প্রমোদ নরম হইয়া পড়িলেন—তাঁহার মায়া হইল। প্রথম রাগের মাথায় অন্ন বস্ত্রের কথা বলিয়াই পরক্ষণেই পশ্চাত্তাপ করিতে লাগিলেন। তিনি চৌকী হইতে উঠিয়া কয়েকবার গৃহে পদশ্চারণ পূর্ব্বক কনকের কাছে আসিয়া বলিলেন,

"কনক, আর কাঁদিস নে। আপাততঃ এখনি আর তোর বিবাহের কথা তুলব না—যা ঘরে যা।"

কনক আস্তে আস্তে সেখান হইতে উঠিয়া গেল। প্রমোদ রাগে দুঃখে অনুতাপে মুহ্যমান হইয়া খানিকক্ষণ সেই খানেই বসিয়া রহিলেন। তাহার পর নীরজার কাছে আসিয়া মনের জ্বালা নিবারণ করিলেন।

প্রমোদ বাহিরে গেলে নীরজা আবার অনেকক্ষণ ধরিয়া বিবাহের পক্ষে কনককে বুঝাইতে বসিল, শেষে নিস্ফল হইয়া সেও বিরক্তভাবে বলিল—

"তুই ভাই, বড় একরোকা মেয়ে; সাধে কি উনি বকেছেন? সে তোর আপন দোষের শাস্তি। নে, বাবু, যা ইচ্ছা কর; তিনি যখন

পারেন নি তখন কি আমি তোকে পারব? আমার চেষ্টা করাই বৃথা।”

বালিকা নীরজা আজ প্রৌঢ়ার ন্যায় রোষভরে তাহাকে বকিল। প্রেমান্ধ নীরজা স্বামীর দোষ কিছুই দেখিতে পায় না। নীরজা জানে তাহার স্বামী যাহা করেন বা বলেন তাহা কখনই অন্যায় হইতে পারে না, অতএব কনক প্রমোদের কথায় অসম্মত হওয়াতে নীরজার কাছেও সে দোষী হইল।

একটু পরে নীরজা বলিল, “কনক, আমি আসল কথা জানি, তুই হিরণকে চাস্।—না? কিন্তু এ কথা জানলে তোর দাদা তোর উপর আরো বিরক্ত হবেন তা’ জানিস? আমি এই ভয়ে তাঁর কাছে এ কথা এখনো বলি নি। যে লোক তোর দাদার পরম শত্রু, কনক তাকে তুই কি ক’রে ভাল বাস্‌লি! এই কি তোর অসীম ভ্রাতৃস্নেহ?’ কনক, এখনো বল্ যামিনীনাথকে বিবাহ করবি, আমি এখনি তোর দাদাকে বলে আসি।”

কনক বলিল, “হিরণ কখনই দাদার শত্রু নন, কেমন করে তাঁর এ ভুল বিশ্বাস জন্মাল?” শুনিয়া আবার নীরজা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, “সকল জেনে শুনে তবুও বল্‌বি তোর দাদার ভুল বিশ্বাস! তোর কাছে আজ কাল তোর দাদারি যত দোষ, আর তোকে কিছু বলতে আস্‌বনা, আমি চললেম, তোর যা ইচ্ছা কর।”

যে নীরজা কনককে এত ভাল বাসিত সেও আজ স্বামীর অসন্তুষ্টি-বশত কনকের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেল। কনক একাকিনী অন্ধকার গৃহে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। ভৃত্য গৃহে দীপ জ্বালাইতে আসিয়া খবর দিল প্রমোদ ডাকিতেছেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গৃহবিচ্ছেদ

কনকের সেই "বাসি কথাটি" নিশাকালের বীণাঝঙ্কারবৎ হিরণের কর্ণে লাগিয়া রহিল, অমন মিষ্ট কথা আর কখনও জীবনে তিনি শোনেন নাই, শুনিবেনও না। সমস্তদিন তিনি কি যেন এক আনন্দের মোহে অভিভূত হইয়া রহিলেন। পরদিন সন্ধান লইয়া শুনিলেন প্রমোদ কলিকাতা হইতে এলাহাবাদে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। অপরাহ্নে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলেন। সবে মাত্র প্রমোদ কনককে কাঁদাইয়া বিদায় দিয়া নিতান্ত বেখোস্ মেজাজে বসিয়া আছেন, চাকর আসিয়া হিরণকুমারের নাম লেখা একখানি কার্ড তাঁহার হাতে দিয়া বলিল" বাবু গাড়ীতে বসে আছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।" প্রমোদ কার্ডখানি টেবিলে ফেলিয়া চটিয়া উঠিলেন—"Let him go to—বল্‌গে বাবু বাড়ী নেই, এখন দেখা হবে না।" চাকর হিরণকুমারকে তাহাই গিয়া বলিল; হিরণ বুঝিলেন প্রথম কথাটা মিথ্যা, দেখা করবেন না ইহাই সত্য। ভাবিলেন নিতান্তই তিনি অসময়ে আসিয়াছেন, কলিকাতা হইতে গৃহে ফিরিয়া এখনো বাহিরের লোকের সহিত প্রমোদের দেখা করিবার অবসর হয় নাই। কিন্তু একে স্বভাবতঃ প্রেমিক হৃদয় অসহিষ্ণু, অধীর, ধৈর্য্যাবলম্বনে অপটু, তাহাতে হিরণকুমারের প্রতীক্ষা করিবার সময়ও অধিক নাই, এই সময়ের মধ্যে তিনি প্রমোদের সহিত কথা কহিয়া বিবাহ ঠিক করিয়া যাইতে একান্ত ইচ্ছুক, অতএব তাঁহার সহিত দেখা করার অপেক্ষা আর না করিয়াই বাড়ী ফিরিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার বক্তব্য পত্রাকারে লিখিয়া সেই অপরাহ্নেই প্রমোদকে তাহা পাঠাইয়া দিলেন।

হিরণের পত্র পাইয়া প্রমোদের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, একে কিছু পূর্ব্ব হইতেই কনকের অবাধ্য আচরণে তিনি অপ্রকৃতিস্থ আছেন—তাহার পর হিরণকুমারের বিবাহ প্রস্তাবে তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। হিরণকুমার কোথাকার কে ? তাহার সহিত কনকের বিবাহ ! হিরণের স্পর্দ্ধা তাঁহার অমার্জ্জনীয় বোধ হইল ! এ বিবাহ হইবার নহে, ইহা তিনি তখনই স্পষ্ট করিয়া লিখিতে বসিলেন; কিন্তু কলম হাতে লইয়া মনে হইল, বিবাহ না হইবার কারণ কি দিবেন ? হিরণকে কি লিখিবেন, তুমি আমার শত্রু সেই জন্য কনকের রক্ষাকারী হইলেও তাহার সহিত তোমার বিবাহ হইবার নহে। এ কথা ত আর লেখা যায় না। হাজার হৌক্ সে কনকের প্রাণদান দিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে ভদ্রতাও ত একটা আছে। প্রমোদ কলম রাখিয়া ভৃত্যকে বলিলেন "বাবুকে বলতে বল, উত্তর কাল পাবেন।"

প্রমোদ ইহার পর কনককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভাবিলেন, এ সম্বন্ধে কনকের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেই সে অমত প্রকাশ করিবে, হিরণকে উত্তর দেওয়া তখন তাঁহার পক্ষে খুবই সহজ হইয়া আসিবে। কনকের সহিত কথাবার্ত্তায় প্রমোদের মনে হইয়াছিল এখন বিবাহ করিতেই কনক নারাজ—নহিলে তাঁহার ইচ্ছার বিপরীতে সে কখনই কথা কহিত না। সুতরাং হিরণকুমারের প্রস্তাবও যে সে পূর্ব্ববৎ অগ্রাহ্য করিবে তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র সংশয় ছিল না। ইতিপূর্ব্বে রুষ্ট কথায় কনককে যে কষ্ট দিয়াছেন—এই অবসরে তাহার মনের মত কথা কহিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ও মনে আঁটিলেন।

আবার প্রমোদ কেন ডাকিয়াছেন—বালিকা ভয়ে ভয়ে তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। যখন দেখিল প্রমোদের মুখে ক্রোধের লক্ষণ কিছুই নাই তখন সে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। প্রমোদ বলিলেন—"আয় আমার কাছের এই চৌকিতে বোস্।" কনক বসিল, প্রমোদ টেবিলের

উপরকার কেরোসিনের ল্যাম্পটা আর একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া হিরণের চিঠিখানি কনকের হাতে দিলেন। কনক বলিল "কার চিঠি?" প্রমোদ বলিলেন, "পড়্ না, ভারী মজার চিঠি? কি উত্তর দেব তুই বলে দে।"

কনক চিঠি খুলিল, খুলিয়া প্রথমেই দেখিতে গেল কে লিখিয়াছে; দেখিল হিরণকুমারের পত্র। বুঝিল তিনি কি লিখিয়াছেন,—তাহার আর পড়া হইল না; আপনাআপনি হাতটি নীচু হইয়া পড়িল,—মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল, বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ওষ্ঠে ভালে পদ্মপত্রে নীহারবৎ শোভিত হইল, বালিকা মৌনভাবে আনত দৃষ্টিতে পত্র হস্তে ধরিয়া বসিয়া রহিল।

প্রমোদ তাহার ভাব দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ভয় নেই আমি আর তোকে বিয়ে করতে বলছি নে। চিঠিখানা যে পড়তে দিলুম সে কেবল তোর জাঁকটা বাড়াতে। কত লোকে যেচে বর পায় না আর আপনা হতেই তোর কত বর জুটছে! তা নিজের গুমর নিজে ত তুই বুঝলি নে—এক লাইন না পড়তে পড়্তে ভড়্কে গেলি। দে চিঠিখানা—জবাব লিখে দিই।" বলিয়া চিঠিখানি কনকের হাত হইতে লইয়া উত্তর লিখিতে বসিলেন—

কনক সহসা আগ্রহের স্বরে বলিয়া উঠিল, "কিন্তু"—প্রমোদ ইহাতে মুখ তুলিয়া বলিলেন—"না এবার আর তোর ভাবনা নেই। লিখছি, তোকে বিয়ের প্রস্তাব করা বৃথা, তোর বিয়ে করতে ইচ্ছা নেই। কেমন সন্তুষ্ট কি না?"

এই কথায় কনককে যেরূপ হর্ষোৎফুল্ল দেখিবেন আশা করিয়াছিলেন—সেরূপ দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার কথায় সে যেন অধিকতর বিষণ্ণ গম্ভীর হইয়া পড়িল, চক্ষু দুটি সজল হইয়া উঠিল, কিন্তু নয়নের জল নয়নেই আবার মিলাইয়া পড়িল, ভূমিতে পড়িল না।

প্রমোদ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "একি তুই যে এমন বিষণ্ণ হয়ে পড়লি? এখন ত আর আমি তোকে অমতে বিয়ে করতে বলছি নে।"

বালিকা কোন উত্তর করিল না, কেবল তাহার নীরব মুখকান্তিতে সুদারুণ একটা উদ্বেগ প্রকটিত হইল। প্রমোদ সন্দিগ্ধ হইয়া গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "আমি ত তোরি মনের কথা লিখছি। এই একটু আগে তুই বলেছিস্ বিয়ে করতে তোর ইচ্ছা নেই। তখন আমি তাতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলুম সত্যি, কিন্তু এখন আমি তোর সঙ্গে পূর্ণভাবে একমত হয়েই এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করছি, তাহলে কেন তোর এ বিষণ্ণ ভাব?"

কনক পাষাণ-প্রতিমাবৎ নিরুত্তর; চক্ষে স্থির দৃষ্টি, তাহাতে পলক নাই, জ্যোতি নাই, বদনমণ্ডল পাংশুবর্ণ, হৃদয়ে রক্ত-স্রোত বহিতেছে কি না সন্দেহ।

কনকের ভাব দেখিয়া প্রমোদ এবার বিরক্তির ভাবে বলিলেন, "কনক কথা কও না; চুপ করে রইলে যে?"

কনক কি যেন বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কথা আটকিয়া গেল, বলিতে পারিল না। প্রমোদ উত্তরের আশায় অনেক ক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শেষে বিরক্ত হইয়া বলিলেন,

"কনক তুমি দেখছি আমাকে পাগল ক'রে তুলবে? এই এখনি একটু আগে দৃঢ় ভাবে বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে, এখন আবার কথা কইতে কি হ'ল, বিবাহ করবে না কি? আমাকে উত্তর দেও।"

বালিকা ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে মুখ খুলিল, কিন্তু সুস্পষ্ট স্বরে কহিল, "আমার অমত নেই।" কাল কনক কোন মতেই যামিনীনাথের সহিত বিবাহে সম্মত হইল না, আর আজ তাহার হিরণকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা! প্রমোদের শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি এখন বুঝিলেন এই কারণেই তবে কনক কাল বিবাহে অসম্মত হইয়াছিল। হিরণকে তাঁহার কণ্টক স্বরূপ মনে হইল, মনে মনে তাহার উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন।

তিনি কম্পিত স্বরে বলিলেন,

"কিন্তু আমার আপত্তি আছে। এখনও কি এ বিবাহ করতে চাও?" উত্তর না পাইয়া আবার বলিলেন,

"তুমি বিবাহ করতে পার, আমি কিছুই বলব না, কিন্তু তা হলে তোমাতে আমাতে এই পর্য্যন্ত সম্পর্ক শেষ—এ কথা যেন মনে থাকে।" প্রমোদ হিরণকে মনে মনে শত শত অভিসম্পাত দিতে দিতে ক্রোধ ভবে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

হিরণকে—তাঁহার চিরশত্রু হিরণকে কনক ভালবাসিল! হিরণের জন্যই তাঁহার বন্ধুকে বিবাহ করিতে চাহিল না, হিরণের জন্যই তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিল, তাঁহার মনোরথ ব্যর্থ করিল! বার বার হিরণ হইতেই কি তিনি আঘাত পাইতেছেন না? তাঁহার শত্রুতা করিতেই হিরণের জন্ম!

প্রমোদ কিছু পরে হিরণের চিঠির উত্তরে লিখিয়া দিলেন যে, বিবাহ হইবে না।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দলিত কলি

সন্ধ্যার অন্ধকারে নদীতীরে সিঁড়ির উপর বসিয়া কনকের আবার জলে ডুবিতে ইচ্ছা হইতেছিল। বালিকা সোপান প্রান্তের ক্ষুদ্র গাছ-গাছড়ার ডাল ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্রতর আকারে জলে ফেলিয়া দিতে দিতে পীড়িত হৃদয়ে ভাবিতেছিল—"সেও একদিন এই ক্ষুদ্র তৃণের মত ভাসিয়া গিয়াছিল—কেন তাহার মত অভাগিনীকে হিরণকুমার তখন বাঁচাইলেন! কেন হিরণকুমার তুমি বাঁচাইয়াছিলে? বাঁচাইলেই বা কি করিয়া বলিব? যে প্রাণ দিয়াছিলে তাহা তো আপনিই আবার কাড়িয়া লইয়াছ, কেবল

যন্ত্রণা বই কনকের জন্য ত আর কিছুই রাখ নাই। এরূপ জলন্ত আগুনে পোড়া অপেক্ষা কি জলে ডুবিয়া মরা ভাল ছিল না? না,না, বাঁচাইয়াছিলে বেশ করিয়াছ নহিলে এত যাতনা কে সহিত? নহিলে—নহিলে এত সুখই বা কে ভোগ করিত? নহিলে হিরণকুমার, তোমাকে দেখিবার সুখ, ভালবাসিবার সুখ কোথায় পাইতাম? এর পর এখন আজীবন কষ্ট পাই, সেও ভাল।"

কনকের চিন্তা সহসা ভঙ্গ হইল; দেখিল নিকটে হিরণকুমার দণ্ডায়মান। সেই দুঃখের সময়, সেই যাতনা-পীড়িত মনের অবস্থায় সহসা হিরণকুমারকে দেখিতে পাইয়া বালিকার মনের ভাব কিরূপ হইল, বালিকা কিরূপ শান্তি পাইল, তাহা বলিবার নহে। নিমেষে যেন মন্ত্রবলে তাহার সকল দুঃখ দূর হইল! কিন্তু সেই এক সময়েই তাহার মনে আসিল, "কিন্তু এ দেখা কতক্ষণের? মুহূর্ত্ত মধ্যে হিরণকুমার চলিয়া যাইবেন, আর কখনও সম্ভবতঃ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না! যে জন আপনার হইতেও আপনার তাহাকে চিরকালের মত পর করিতে হইবে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎও দূষণীয় বলিয়া গণ্য হইবে!" গভীর দুঃখে মর্ম্মস্থল হইতে তাহার দীর্ঘনিশ্বাস উঠিল। হিরণকুমারও ঠিক এইরূপই ভাবিতেছিলেন! তাঁহার হৃদয়েও এইরূপ দুঃখের তরঙ্গ বহিতেছিল! তিনিও দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে কনকের মনের কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া কহিলেন, "সত্যই কি আমাদের এ শেষ দেখা? শেষ বিদায়? যে আমার জীবনের চেয়েও আপনার তার সঙ্গে দেখা করতে আসাও কি আমার এখন অন্যায় কাজ?

হিরণকুমার থামিলেন, কনক নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি সবলে নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া আবার বলিলেন "কনক, আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে উচিত অনুচিত জ্ঞান এখন নেই। আমার ব্যবহারে তোমার পাছে কোন কষ্টের কারণ ঘটে এই কেবল আমার এক মাত্র ভয়, এক

মাত্র ভাবনা। চিরকাল পুড়ে মরি সেও স্বীকার কিন্তু তোমার ছায়াকেও আমা থেকে তিলমাত্র অমঙ্গল যেন স্পর্শ না করে। আমি এখনি চলে যাব, একটিবার শুধু তোমার নিজের মুখে আমার শেষ ভাগ্য শুনতে এসেছি। কনক, আমাদের কি সত্যই আর কোন আশা নেই? তোমার দাদা কেন এ বিবাহে অসম্মত?"

কনক অশ্রু মুছিয়া বিকম্পিত স্বরে কহিল, "তিনি তোমাকে শত্রু মনে করেন?"

হি। আমাকে শত্রু মনে করেন, আমি তাঁর কি করেছি? এ ভুল বিশ্বাস কি কোন রকমে ঘোচান যায় না?

কনক নীরজার কাছে এ সম্বন্ধে যাহা কিছু শুনিয়াছিল তাহাই সংক্ষেপে বলিয়া বলিল, "তিনি যে তোমার উপর প্রসন্ন হবেন তা ত মনে হয় না। বিশেষ তাঁর যখন একান্ত ইচ্ছা আমার যামিনীনাথের সঙ্গে বিয়ে হয়।"

হিরণকুমার উন্মত্তের মত বলিলেন "কনক—সত্যিই কি তবে তুমি আর আমার হবে না? আমার এত আশা এত আকাঙ্ক্ষা সব মিথ্যা! তুমি অন্যের—

কনক অটল স্বরে কহিল "না আমি অন্যের নই, দাদার অমতে আমি কাজ করতে পারব না, কিন্তু দাদার সহস্র অত্যাচারেও আমি অন্যকে আত্মসমর্পণ করব না।"

কাহারও আর কথা কহিবার শক্তি রহিল না, দুজনে কেহ কাহাকেও স্পর্শ না করিয়া দুজনে কেহ কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া দূরে দূরে দুজনের মুখের দিকে চাহিয়া দুজনের হৃদয় স্পন্দন এক বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন। হিরণকুমার বলিলেন "কনক, আমরা মনে মনে দু'জনকে দু'জনে ভালবাসি, হৃদয়ে হৃদয়ে আমাদের বিবাহ হ'য়ে গেছে, কনক, তোমার দাদার মতের বিরুদ্ধে কি আমাদের বিবাহ হয় না?"

কনক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"না।"

হিরণকুমার ভগ্ন হৃদয়ে বলিলেন,

"তুমি আমার মত আমাকে পেতে ব্যগ্র নও বলেই ওরূপ বলছ, আমার মত ভালবাস না বলেই ওরূপ বলছ। তোমাকে না পেলে আমার চির জীবনের সুখ বিনষ্ট হবে জেনেও, তোমার দাদার একটু মনঃক্ষোভের ভয়ে তুমি আমাকে বলিদান দিতেও প্রস্তুত। কনক আমি যদি তোমার ভাই হতুম তা হ'লে এই স্বর্গীয় ভালবাসা আমার হ'ত!"

হিরণের প্রত্যেক কথা গুলি তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। কনক হিরণকে তেমন ভাল বাসে না, কেমন করিয়া হিরণকুমার এ কথা বলিলেন! কনকের কাহার জন্য তবে এত কষ্ট? কাহার জন্য এত জ্বালা? কাহাকে হৃদয় দিয়াছে বলিয়া ভ্রাতার কথায় অসম্মত, ভ্রাতার সহিত এরূপ মনোবিচ্ছেদ! ভ্রাতার অমতে কেবল কনক বিবাহ করিতে চাহে না বলিয়াই কি হিরণের এইরূপ মনে করা ঠিক! তাঁহার সহিত বিবাহ না হইলে যে কনক চিরকাল জীবন্তে মরিয়া থাকিবে হিরণকুমারের কি এই জ্ঞানটুকুও নাই? কিন্তু কনকের যতই কষ্ট হউক না, কর্ত্তব্যের বিপরীত কাজ কি করিয়া করিবে? ভ্রাতৃস্নেহ হইতে কনকের প্রণয় যতই বলবৎ হউক না, ভ্রাতার অমতে কাজ করিয়া ভ্রাতাকে কষ্ট দিবে কি করিয়া? হিরণ কেন এইটুকু বুঝিলেন না?

হিরণ তুমি বড় নিষ্ঠুর! বালিকার এই দগ্ধ হৃদয়ে আরও জ্বালা দিলে। কনক যদি দেখাইতে পারিত তো দেখিতে, তুমি তাহাকে যত ভালবাস তাহা হইতেও সে তোমাকে অধিক ভালবাসে কি না। কিন্তু কনক বালিকা, কথা কহিতে জানে না, প্রকাশে অক্ষম, তাই তুমি আজ ও কথা বলিয়া তাহাকে যাতনা দিতে পারিলে!

হিরণ আবার বলিলেন, "তবে কনক, আমি যাই, আজ অবধি সকল সুখে বিসর্জ্জন দিতে যাই, তোমার জন্যই সকল জলাঞ্জলি দিব। আর

আমার সংসারে কাজ কি ; অর্থে কাজ কি ? তোমাকেই যদি না পাই তবে আমার আর কিসে কাজ ? আমি ধন সম্পদের আকাঙ্ক্ষী নহি, আমি পদমর্য্যাদার জন্যও লালায়িত নই। তোমাকে ভালবেসে কল্পনায় জীবনের মরুভূমেও যে নন্দনকানন সৃজন করেছিলুম, তুমিই স্বহস্তে যদি তাতে দাবানল জ্বাল্‌লে, তাহলে আমার এই শূন্য, উদ্দেশ্য-হীন জীবনে প্রয়োজন কি ? আমি সংসার ছাড়ব, দেশে দেশে বনে বনে সন্ন্যাসী-বেশে ভ্রমণ করব, তাতে যদি তোমাকে ভুলতে পারি তো ভুলব, নইলে তোমারই মূর্ত্তি আজীবন ধ্যান করে কাটাব। তুমি অভাগাকে ভুলে যাও, আমার ভাবনা তোমাকে তিলমাত্রও যেন ব্যথা না দেয়। বিদায় তবে বিদায়, আর কখনো এ অভাগাকে দেখতে পাবে না।”

হিরণের অর্দ্ধেক কথাও কনকের কর্ণে প্রবেশ করিল না, কনক তখন আপনাতে আপনি ছিল না। যখন কনকের চমক ভাঙ্গিল, যখন বালিকা কনকের আজ কথা ফুটিল, যখন সে বলিতে গেল, “হিরণকুমার আমার নিজের কষ্ট আজীবন সইতে পারি, কিন্তু তোমার কষ্ট কি করে সহ্য করব ? তোমার কনক তোমার জন্য সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত।” তখন মস্তক তুলিয়া কনক দেখিল, পার্শ্বে সেই আজন্মপরিচিত পথ ঘাট ও বৃক্ষাবলী, সম্মুখে সেই অনন্ত-কালপ্রবাহিনী গঙ্গা, কিন্তু হিরণকুমার আর এখানে নাই। কনকের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, বোধ হইল তাহার চরণতলে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল পর্য্যন্ত যেন গহ্বর হইয়া গিয়াছে, কনক শূন্য অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। অজস্র অশ্রুধারা কনকের কপোল বাহিয়া পড়িতে লাগিল। হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে মর্ম্মভেদী কষ্টে অশ্রুধারা উথলিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কনক দ্রুতপদে ঘাট হইতে উঠিয়া খানিক দূর আসিল, কিন্তু সে বেশী দূর নহে। মর্ম্মাহত ক্ষুদ্র বালিকা আর কত পারিবে ? তীরে একটী গাছতলায় আসিয়া আশ্রয় জন্য একটী শাখা ধরিল, ক্রমে হস্ত পদ শিথিল হইয়া বৃক্ষতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মেঘে বিজলি

হিরণকুমারের চারি দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে, কাল তাঁহাকে এলাহাবাদ ছাড়িতে হইবে। তিনি মধ্যাহ্নে অন্যান্য চিঠিপত্র শেষ করিয়া কনককে একখানি চিঠি লিখিতে বসিয়াছেন। কতবার লিখিলেন কতবার ছিঁড়িলেন,—অবশেষে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া একখানি চিঠি শেষ করিয়া নীরবে অশ্রুজল মুছিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সে অশ্রু শুকাইল, মুখে দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভাব প্রকটিত হইল, তিনি উঠিয়া চিঠিখানি নিজে ডাকে দিয়া বাটী ফিরিলেন। গঙ্গাতীরের একটী সরকারী বাড়ীতে আপাততঃ তিনি বাস করিতেছিলেন।—যখন গৃহে ফিরিলেন তখনও সন্ধ্যা হয় নাই, উজ্জ্বল আকাশ প্রান্তে সবে মাত্র দুই একটি তারকা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তিনি বারান্দার একখানি ইজিচেয়ারে শুইয়া আকাশের সেই অস্তমান্ শেষ উজ্জ্বলতার দিকে কিছুক্ষণ নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সন্ধ্যা হইল, হিরণকুমার উঠিলেন না, ভৃত্য নীরবে দেয়ালের ধারে লিখিবার টেবিলে একটি আলো রাখিয়া গেল। রাত্রি হইল, আটটা বাজিল, হিরণকুমার উঠিলেন না, খাবার আনিতেও হুকুম দিলেন না,—বেগতিক দেখিয়া একজন ভৃত্য খবর দিল, খাদ্য প্রস্তুত। ভৃত্যের নিকট ইহা আজ নূতন ব্যাপার নহে। কয়েক দিন হইতে আহার সম্বন্ধে প্রভুর সে এইরূপ বীতরাগ দেখিতেছে। এতক্ষণ হিরণকুমার ঘুমাইতেছিলেন কি না জানিনা, কিন্তু ভৃত্যের কথায় চোখ খুলিয়া একবার তাহার দিকে চাহিলেন। তাঁহার সেই যন্ত্রণা-প্রকটিত পাংশুবর্ণ মুখ, তাঁহার সেই কোন ভয়ানক দৃঢ়সঙ্কল্প-

বিশিষ্ট অথচ অন্তিমকালের ন্যায় অসরল দৃষ্টি দেখিয়া ভৃত্য চমকিয়া উঠিল, আশ্চর্য্য হইয়া মৌনে তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আর একবার বলিল, "খাবার ঠিক।"

হিরণকুমার বিরক্তভাবে বলিলেন, "আমার ক্ষিদে নেই, আজ থাব না।" ভৃত্য দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল, আর কথা কহিতে সাহস করিল না।

হিরণকুমার তখন উঠিলেন, উঠিয়া টেবিলের সম্মুখে চৌকিতে বসিয়া কয়েকখানি পত্র লিখিতে লাগিলেন—এই সময় একজন ভৃত্য আসিয়া একটী পিস্তল দেখাইয়া বলিল, "জিনিষপত্র সবই প্রায় গোছান হয়ে গেছে, নৌকায় তুল্লেই হয়, এটা বন্দুকের বাক্সে ধরলো না, কাপড়ের বাক্সেই রাখি?"

হিরণের মনে পড়িল, একদিন একজন চোরের নিকট হইতে পিস্তলটি কাড়িয়া লইয়াছিলেন; এবং ইহা পুলিশে দেখাইয়া চোরের সন্ধান করিবার অভিপ্রায়ে সাবধানে রাখিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু পরে নানারকম কাজের ভিড়ে এতদিন পর্য্যন্ত ও কথাটা মনেই পড়ে নাই। হিরণ পিস্তলটি হস্তে লইলেন, এদিক ওদিক করিয়া দেখিতে লাগিলেন; ভাবিলেন ইহার একটি গুলিতেই তো আজ তাঁহার সমস্ত যন্ত্রণা দূর হইতে পারে। লোভ অসম্বরণীয় দেখিয়া ত্রস্তে তাহা টেবিলে রাখিলেন। কিন্তু মনে হইল তাঁহার ভয় বৃথা, উহাতে গুলি নাই। ভাবিতে ভাবিতে আবার তাহা হস্তে লইলেন, সর্প যেমন তুণ্ডিকের বংশীধ্বনি হইতে ফিরিতে অক্ষম, হিরণকুমার তেমনই সেই পিস্তল হইতে দৃষ্টি উঠাইতে অক্ষম হইলেন। এই সময় একজন অপরিচিত লোকের সহিত একজন চাপরাশি এই গৃহে আসিয়া হিরণকে বলিল,

"কদিন থেকে এই লোকটি চাকরীর উমেদারীতে আস্ছে

আমাদেরও তো আর একজন চাপরাশির দরকার, এ'কে কি রাখবেন? বন্দুক চালাতে পারে, লাঠি খেলতে পারে, জমিদারের সর্দার ছিল, খুব লায়েক লোক।"

হিরণকুমার এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না, তিনি তখন পিস্তল দেখিতে ব্যস্ত ছিলেন। দেখিতে দেখিতে পিস্তলের এক প্রান্তে কয়েকটি অক্ষর মুদ্রিত দেখিলেন, পড়িয়া তাঁহার মুখ বিস্ময়-পূর্ণ হইল; দেখিলেন ইংরাজি অক্ষরে লেখা "যামিনীনাথ রায়।" তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, 'যামিনীর পিস্তল!' নবাগত উমেদার উত্তর অপেক্ষায় সেই খানে দাঁড়াইয়া ঐ সকল দেখিতেছিল। হিরণের মুখনির্গত বিস্ময়-প্রসূত ঐ কথাটী শুনিয়া সে আস্তে আস্তে তাঁহার একটু কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; বিশেষ লক্ষ্যের সহিত দেখিয়া দেখিয়া বলিল, "হ্যাঁ বাবুর পিস্তল বলেই মনে হচ্ছে, আমাকে একবার দেখতে দেবেন?"

হিরণ বিস্মিত ভাবে উমেদারের হস্তে পিস্তলটী দিয়া বলিলেন, তুমি কি যামিনীবাবুর চাকর ছিলে?"

সে বেসুরে উত্তর করিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

বলিয়া পিস্তলটী লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বিশেষ রূপে দেখিতে লাগিল। সেই মুদ্রাঙ্কিত অক্ষরগুলি দেখিয়া তাহার মুখ চক্ষু আরক্তিম হইল, ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, এ পিস্তল আমি চিনি, এ বাবুরই পিস্তল বটে।" হিরণ তাহার ভাবে, কথায় অবাক হইয়া বলিলেন, "এ পিস্তল তবে চোরের হাতে গেল কি করে?"

"চোর! না—", বলিয়াই সে থামিল; কি একটী কথা বলিতে যেন সে ভয় পাইতেছিল। শেষে যখন তাহার কথায় অন্য সকল ভৃত্যকে প্রস্থান করিতে আদেশ করিয়া হিরণ কথা দিলেন যে বলিলে তাহার কোন হানি হইবে না, তখন সে বলিল, "মহাশয়, সে চোর না, যামিনীবাবুর দরোয়ান—"

হি। যামিনীর চাকর! সে কি পিস্তল চুরি করেছিল?

ভৃ। না, যামিনীবাবুর হুকুমে প্রমোদবাবুকে মারতে গিয়েছিল।

"যামিনী বাবুর হুকুমে প্রমোদকে মারতে গিয়েছিল!" সহসা হিরণকুমারের মলিন বিষাদ-গম্ভীব মুখকান্তি জ্যোতিষ্মান্ হইল, তাঁহার নিকটে যেন একটি রুদ্ধ-দ্বার খুলিয়া গেল। তিনি কনকের কাছে শুনিয়াছিলেন প্রমোদের বিশ্বাস, হিরণ তাহাকে হত্যা করিতে গিয়াছিলেন, আজ সহসা তাহার কারণ বুঝিতে পারিলেন। হিরণ জানিতেন, যামিনী নীরজাকে বিবাহের অভিপ্রায়ে সন্ন্যাসীর নিকট প্রমোদকে দোষী সাব্যস্ত করিতে গিয়াছিল। ভৃত্যের কথায় এখন তাঁহার মনে হইল যে তাহাব মত মন্দ লোকের পক্ষে স্বাভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য এরূপ জঘন্য ভয়ঙ্কর উপায় অবলম্বনও অসম্ভব নহে। পরে আপন দোষ যামিনী হিরণের উপর অর্পণ করিয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। হিরণ ভাবিলেন, যদি যথার্থই যামিনী দোষী হয় এবং তিনি তাহা প্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে প্রমোদের ভ্রম ঘুচিতে পারে; হিরণ আবার সুখী হইতে পারেন। হিরণকুমার ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"যামিনী প্রমোদকে মারতে পাঠান কেন?"

ভৃত্য। আমাকে কি আর সে কথা তিনি বলেছেন? কিন্তু আমি তা' বলতে পারি। প্রমোদ বাবুর সহিত নীরজার পাছে বিয়ে হয়, সেই ভয়ে—

হি। তিনিই যে মারতে পাঠিয়েছিলেন তা তুমি কি করে জানলে?

ভৃত্য। আমাকেই প্রথমে মারতে বলেন, কিন্তু আমি নারাজ হই। শেষে পাঠান্ বেটা রাজি হয়েছিল। হোক, টাকা যত পেয়েছে তা আমি জানি!

হি। রাজি হয়েছিল কি ক'রে জানলে ?

এই কথার উত্তর দিতে উমেদার ভীত হইল। যাহা বলিবে তাহাতে তাহার আত্মীয় এক ব্যক্তির কোন হানি হইবে না, এই শপথ করাইয়া লইয়া অবশেষে বলিল "বাবুর দরোয়ানের সঙ্গে আমার মামাত ভাই হরিও ঐ কাজের মধ্যে ছিল; তার কাছেই শুনেছি।"

হি। মকদ্দমা হ'লে তুমি যামিনীর বিপক্ষে সব কথা বলতে রাজি আছ ? দোষ প্রমাণ করতে পারবে ?

উমেদার সহর্ষে বলিল "তা আর পারব না ? যে আমার সর্ব্বনাশ করেছে তার বিপক্ষে সাক্ষী দিয়ে শোধ তুলব না ! কিন্তু হরেটার জন্যই ভয়, নইলে কি আর আমি এতদিনই চুপ করে থাকি !"

হি। না না তার জন্যে কোন ভয় নেই। তার সাক্ষ্যই বিশেষ দরকারী। তুমি কেবল তার কাছে শুনেছ বই ত নয়। হরি যদি সব খুলে বলে তো তাকে মহারাণীর সাক্ষী (Queen's evidence) দাঁড় করিয়ে খালাস দেওয়ান যাবে। তুমি যে শোধ তোলবার কথা বলছ যামিনী বাবু তোমার কি করেছেন ?

উ। কি করেছেন ! তাঁর জন্যই স্ত্রী পুত্র পরিবার ছেড়ে বিদেশে পালিয়ে আসতে হয়েছে। নিমকহারামের জন্য কি না করেছি ! মশায় বলব কি, বাবু যখন আমাদের দিয়ে নীরজাকে চুরী করিয়ে আবার ফন্দি ক'রে নিজেকেই সাধু দাঁড় করাবার মতলব করেন তখন আমিই ত দাঁড়ি সেজে সব ঠিকঠাক করি। প্রমোদ বাবু যেদিন কানপুরের বনে নীরজার সঙ্গে দেখা করতে যান, সেদিন আমিই ত তাঁর পিছনে লুকিয়ে গিয়ে জেনে আসি যে সন্ন্যাসী নৈমিষারণ্যে যাবেন; তাতেই ত পরের দিন চুরী হয়।

হি। তাই বটে ! এখন সব বোঝা যাচ্ছে !

উ। তা মোশাই জাতটাই শুধু খোয়ালাম, পেটটাও তাতে ভরলো

না। মনে ছিল বক্সিসটা কিছু এমন মারবো যে এর পর যাবজ্জীবন বসে খেতে পারব, আর চাকরী করতে হবে না। ওমা তাতেও বাবু নমো নমো ক'রে সারলে। আবার বলে কিনা খুন কর! আমি বেটা ফাঁসিতে ঝুলি আর উনি পায়ের উপর পা রেখে গুড়ুক ফুঁকুন! এমন চাকরীর পায়ে গড়! জানলেন মশায় তাই রাগের মাথায় দুট বেফাঁস কথা কয়ে ফেলেছিলুম! তার জন্যে এমন গোঁ! বলব কি মশায়, বেটার শরীরে ধর্ম্মজ্ঞান এক ফোঁটা নেই! তা আমিও এবার ছাড়ছি নে!

বলিতে বলিতে প্রতিশোধ স্পৃহায় সে জ্বলিয়া উঠিল। হিরণ বলিলেন, "কিন্তু বাবু তোমার কি শাস্তিটা করেছেন?"

উ। সে কথা আর কন্ কেন? মিথ্যা চুরির দাবিতে আমাকে জেলে দেবার ফন্দি। কি করি প্রাণের দায়ে মাসির কাছে এসে লুকিয়ে আছি। মেসো আমার ছিল ভাল, বাবুদের দোকানে জুতোর কাজ করে দিব্যি দু' পয়সা রোজগার করত; এখন মেসো মরেছে, মাসী পৈরাগবাসী হয়েছে। ছেলেপিলে নেই দু' দশ পয়সা যা আছে আমিই পাব। এখন এ দায়টা থেকে ছাড়ান পেলেই বাঁচি।

ভৃত্যের কথায় হিরণকুমারের সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। তাঁহার সহসা নূতন আশার সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন, আজ থেকে রামধন, তুমি আমার চাকর বাহাল হলে, তোমার শোধ তোলার ভার আমি হাতে নিলুম। এখনি আমার সঙ্গে কলকাতায় চল।"

হিরণকুমার যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া লইয়া, ভৃত্যের সহিত একটা ঠিকা গাড়িতে উঠিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া ষ্টেসনে লইয়া যাইতে হুকুম দিলেন। কাল তাঁহার কর্ম্ম স্থলে যাত্রা করিবার কথা কিন্তু এই জীবন-মৃত্যু বিপাকে সে কর্ত্তব্য ভুলিয়া, তাহার ত্রুটিতে যে ক্ষতি হইতে পারে, তাহাও গণনার মধ্যে না আনিয়া তিনি কলিকাতা যাত্রা করিতে অধীর

হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এত অধীরতা এত সত্বরতা সমস্তই বৃথা হইল। তাঁহারাও ষ্টেসনে পৌঁছিলেন, কলিকাতামুখা মেলগাড়ীও তাঁহাদের চোখের উপর দিয়া হুস হুস শব্দে চলিতে আরম্ভ করিল। হিরণকুমার হতাশচিত্তে স্তব্ধ ভাবে প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বেহাত

ঘণ্টা কয়েক পরে একটা প্যাসেঞ্জার গাড়ী কলিকাতায় যাইবে, সেই গাড়ীতেই যাত্রা করিবেন ভাবিয়া হিরণকুমার ক্ষুণ্ণ হতাশচিত্তে ষ্টেষণের বেঞ্চের উপর আসিয়া বসিলেন।

তখন প্রয়াগ হইতে রাত্রিকালেই উর্দ্ধ নিম্ন উভয় পথগামী মেল যাত্রা করিত। কিছু পূর্ব্বে প্রয়াগের মেলগাড়ী কলিকাতায় গিয়াছে, কিছু পরে কলিকাতার মেলগাড়ী প্রয়াগে আসিয়া লাগিল। গাড়ী প্লাটফর্ম্মে লাগিতেই ষ্টেষণ জনতাকোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল, তৃতীয় ক্লাসের কামরা হইতে স-চীৎকারে দলে দলে পিপীলিকা শ্রেণীর মত লোক নামিতে লাগিল। প্রথম দ্বিতীয় ক্লাশ হইতেও অল্পস্বল্প যাত্রী নামিলেন। হিরণকুমার বিষণ্ণচিত্তে অন্য মনে তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিলেন এখনো এক ঘণ্টাকাল তাঁহাকে ষ্টেষণে অপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য সহসা যাত্রীদিগের মধ্যে কাহাকে দেখিয়া চমকিত হইলেন, এ যে যামিনীনাথ! যাহার নিকট যাইবার জন্য হিরণকুমার এত ব্যস্ত সে যে স্বয়ং তাহার নিকট আসিয়া হাজির!

তাঁহার নবভৃত্য রামধন পোর্টম্যাণ্টোটা দক্ষিণ জানুর নীচে রাখিয়া

দেয়ালে ঠেশান দিয়া নাক ডাকাইয়া নিদ্রা দিতেছিল। পায়ের নীচে হইতে তাড়াতাড়ি তোড়ঙ্গটা টানিয়া লওয়ায় সে ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল "গাড়ী এসেছে ?" তিনি তোড়ঙ্গটা খুলিতে খুলিতে বলিলেন "না, আজ আর কলকাতায় যেতে হবে না,তোমার বাবু এখানে এসেছেন, আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি, তুমিও শীঘ্র এস।" বলিয়া পিস্তলটা তোড়ঙ্গ হইতে বাহির করিয়া পকেটে পুরিয়াই তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। খোলা তোড়ঙ্গটা বন্ধ করিয়া চাবিটা পকেটে রাখিয়া রামধন স্বগতঃ বলিল "বাবু এসেছে ? তা যাচ্ছি, মোদ্দা আমি দূরে দূরে থাকব, বাবুকে আজ দেখা দিচ্ছিনে।"

যামিনীনাথ তাঁহার দ্রব্য সামগ্রী কুলির জিম্মায় দিয়া, কুলিকে ভৃত্যের জিম্মায় সমর্পণ করিতেছেন এমন সময় হিরণকুমার আসিয়া বলিলেন "আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।" হিরণকে দেখিয়া যামিনীনাথ আশ্চর্য্য হইলেন। একটা কেমন অজ্ঞাত অনির্দ্দিষ্ট অমঙ্গল ভয়ে শঙ্কিত হইয়া বলিলেন "আমার সঙ্গে আপনার কথা ! আর এক সময়ের জন্য রেখে দিলে হয় না, এই মাত্র শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে এসে পৌঁছেছি।"

হিরণকুমার তখন উত্তেজিত, অপ্রকৃতিস্থ ; যেন যামিনীকে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারিলেই তাঁহার ভাগ্যস্রোত এই মুহূর্ত্তে ফিরিবে। তিনি অধীরভাবে বলিলেন "বিশেষ জরুরী কথা, আপনি এসে পড়লেন নইলে আমিই আপনার কাছে কলকাতায় যাচ্ছিলুম।"

যামিনী ভৃত্যকে বলিলেন "একটা ভাড়াটে গাড়ী ঠিক করে জিনিসপত্র ওঠা, আমি এখনি আসছি।" ভৃত্য কুলিকে লইয়া চলিয়া গেল। যামিনী হিরণকুমারের সহিত একটু তফাতে বিজন স্থলে আসিয়া বলিলেন "আপনি আমার কাছে কলকাতায় যাচ্ছিলেন, ব্যাপারখানা কি ! এত সৌভাগ্য আমার কিসের জন্য বলুন দেখি ?"

হিরণকুমার তাঁহার জোব্বার ভিতর হইতে পিস্তলটি বাহির করিয়া

বলিলেন "এই জিনিষটিকে ধন্যবাদ দিন, এরই অনুগ্রহে। চিনতে পারেন কি পিস্তলটি কার ?"

যামিনী চমকিয়া উঠিলেন,যে পিস্তলটি হিরণকে মারিবার জন্য পাঠান্‌কে দেন তাহা ফিরিয়া পান নাই মনে পড়িল, বিপদ আশঙ্কা করিলেন, কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে সপ্রতিভভাবে বলিলেন "এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন ? আমি কি করে জানব ?"

হি। আপনি যদি না জানেন তবে আমিই বলি। এ আপনারি পিস্তল—আমি আপনার চাকরের হাতে—

যামিনী ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন "আপনি কি পাগল না মাতাল কিম্বা কি কিছুই ত বুঝতে পারছিনে ! প্রমোদ যদি আপনাকে মনঃক্ষুণ্ণ করে থাকেন তার শোধ আমার উপর তোলাটা নিতান্তই অভদ্রের কাজ।"

হিরণ এই কথায় বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় আহত হইয়া বলিলেন "যামিনীনাথ তোমার মত নরাধম সংসারে নেই !"

যামিনী ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন "মুখ সামলে কথা কবেন, আপনার হাতে পিস্তল, এখনি পুলিষ ডাকব।"

"যে দিন প্রমোদকে খুন করতে পাঠান, সেদিন পুলিষের ভয় হয় নি ? পুলিষ ডাকলে আমার ভয় সেই, আপনারি ভয়।" হিরণকুমার পিস্তলের মুদ্রাঙ্কিত নাম পড়িয়া বলিলেন "যামিনীনাথ রায়।"

যামিনীর মস্তকে যেন বজ্র পড়িল, তিনি মুহূর্ত্তকাল বাক্‌শক্তিহীন হইয়া পড়িলেন। এতক্ষণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাঁহার নামাঙ্কিত পিস্তল তিনি পাঠান্‌কে দেন নাই, সেই জন্য এতক্ষণ বেশ সজোরে কথা কহিতেছিলেন। সহসা যখন ভ্রম সংশোধিত হইল, দেখিলেন মনের ব্যগ্রতা বশতঃ তাড়াতাড়িতে না দেখিয়া আপন নামাঙ্কিত পিস্তলই হস্তান্তর করিয়াছেন তখন মুহূর্ত্তকাল জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। আত্মরক্ষার আকুলতায় হিরণকুমারের হাত হইতে পিস্তলটা কাড়িবার অভিপ্রায়ে অজ্ঞাতভাবে হস্ত বাড়াইলেন,

হিরণ তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া ত্রস্তে সরিয়া দাঁড়াইলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে যামিনী আশ্বস্থ হইয়া বুঝিলেন—পিস্তল কাড়িতে গেলেই যথার্থ দোষী বলিয়া প্রমাণিত হইবেন, অথচ কৃতকার্য্য হইবারও সম্ভাবনা নাই। তিনি হৃদয়ের ভাব লুকাইয়া সরোষে বলিলেন "এ কি? কি আশ্চর্য্য? এ চুরীর পিস্তল আপনি পেলেন কোথা?"

তাহার অতিরিক্ত সাহস দেখিয়া হিরণ একটু হাসিয়া বলিলেন "চুরীর জিনিষ! সে প্রমাণে যা হয় হবে।"

যা। কি প্রমাণ? আপনি যা বলেছেন তাইত প্রমাণ সাপেক্ষ। আপনার হাতে চোরা মাল আমিই এখনি আপনাকে চোর বলে ধরব।

হি। প্রমাণসাপেক্ষ বটে! কিন্তু প্রমাণের অভাব নেই। আপনার আগেকার চাকর রামধন সর্দ্দারকে মনে আছে ত? সে হাজির।

হিরণ সেই ভৃত্যের জন্য একবার এদিকে ওদিকে চাহিয়া দেখিলেন—কিন্তু তাহাকে কাছাকাছি দেখিতে পাইলেন না। কোথা হইতে এ সমস্ত প্রকাশ হইয়াছে যামিনী তখন বুঝিলেন, বুঝিয়া সক্রোধে বলিলেন—"তাকে চোর বলে তাড়িয়ে দিয়েছি—সে মিথ্যা করে কি না বলতে পারে? কিন্তু তার মিথ্যা অপবাদে আমার কিছুই হবে না—সে জন্য আমি কিছুমাত্র ভীত নই।"

হি। না তা ভীত হবেন কেন? শুধু এ খুনের কথা নয়—নীরজার হরণ বৃত্তান্তও প্রকাশ হয়েছে। আজ রাতেই আমি প্রমোদকে চিঠি লিখব। সেখানেও আর আপনার স্থান নেই জানবেন। প্রমোদ যদি এখনো এ সব জেনে না থাকেন ত আজই জানবেন।

যামিনী বুঝিলেন—সে কথা প্রমোদ তবে এখনও শুনেন নাই। একটুখানি যেন তাহাতে আশ্বস্ত বোধ করিয়া কহিলেন, "যদি নিতান্তই নিজের মন্দ করতে ইচ্ছা হয়ে থাকে ত আমার নামে মিথ্যা দোষ আনবেন, যা করতে ইচ্ছা হয় করবেন। এখন আমি চল্লেম, এ রকম অপমান

আর দাঁড়িয়ে সহ্য করতে পারিনে।" বলিয়া ব্যগ্র চিত্তে এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

ভৃত্য ঠিকা গাড়ীতে জিনিষ উঠাইয়া প্রভুর অপেক্ষায় গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, যামিনী সেখানে আসিয়া গাড়ী চড়িয়া হুকুম দিলেন, "মিত্রালয়ে চল।"

যামিনীনাথ অবশ্য প্রমোদের কাছেই আসিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বিস্ময়ে ফেলিবেন বলিয়া পূর্ব্ব হইতে সংবাদ দেন নাই। ইতিমধ্যে এই-রূপ ঘটনা ঘটায় সহসা মতলব বদল করিয়া 'মিত্রালয়ে' থাকাই শ্রেয়ঃজ্ঞান করিলেন।

যামিনীনাথ চলিয়া গেলে রামধন হিরণকুমারের নিকট আসিয়া কহিল—"বাবুকে আমার দেখা দেবার ইচ্ছা ছিল না তাই দূরে ছেলাম। বড় ভয় করে মশায়। আমি এখানে আছি জানলে চোর বলে যদি পুলিষেই ধরিয়ে দেন। কিন্তু আপনার সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে নিশ্চয়ই আমি আদালতে সাক্ষী দেব—তাতে সন্দেহ করবেন না। কবে যাওয়া হচ্ছে?"

হিরণ বলিলেন—"এখন, ঠিক বলতে পারছিনে দেখি কি রকম দাঁড়ায়।—"

ভৃ। তবে আমাকে দুদিন ছুটি দিতে হুকুম হোক, মাসীর বাড়ী গিয়ে থাকি, আবার ডাকলেই আসব।

হিরণ দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন, সে মাসীর বাড়ী গেল, তিনি গৃহাভি-মুখী হইলেন। বাড়ী আসিয়া দেখিলেন তখনো রাত্রি অধিক হয় নাই, ১০টা মাত্র, তৎক্ষণাৎ তিনি প্রমোদকে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন।

হিরণের ভৃত্য পত্র হস্তে প্রমোদের বাটী অভিমুখে যাইতেছিল।

যদিও রাত্রি গভীর হয় নাই, তথাপি ইহার মধ্যেই পথ জনশূন্য বলিলেই হয়, কদাচিৎ দুটি একটি লোক পথে চলিতেছে, রাস্তার ধারে ধারে এখানে ওখানে দুই একটি মুক্ত দোকানে মাত্র মনুষ্যজীবনের ব্যস্ততা এখনো দেখা যাইতেছে, তাহা ছাড়া চারিদিক নিস্তব্ধ। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর নিষ্কৃতি পাইয়া কোন দোকানী দিব্য আরামে দেওয়াল ঠেস দিয়া তামাক টানিতেছিল, কেহ বা কোন খরিদ্দারের সহিত এখনো দাম চুক্তি করিতেছিল, কেহ বা দৈনিক লাভের তালিকায় দ্বিগুণ লাভ দেখিয়া মনের স্ফূর্তিতে কল্পনার সপ্তম স্বর্গে উঠিতে উঠিতে বাদসাহের কন্যাকেও বিবাহের আশা করিতেছিল। যাহা হউক, প্রায় দোকানদারেরাই সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর, কোন না কোন আমোদে নিযুক্ত। একটি দোকানে পাশাখেলা চলিতেছিল, ভৃত্যটি পাশাখেলার বিশেষ অনুরাগী; সে লোভ সামলাইতে না পারিয়া খেলা দেখিতে পত্র হস্তে সেই দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখনি রাস্তার আর একদিক হইতে অপর একজন সেখানে আসিয়া বলিল, "আঃ! চাকরী করা কি অধর্ম্মের ভোগ! একে ত সমস্ত দিনেও একটু অবসর নেই, তার উপর একটু ত্রুটি হলেই সর্ব্বনাশ!"

চাকরীর কথায় ভৃত্যের চিঠির কথা মনে পড়িল, সে খেলা হইতে চোক উঠাইয়া নবাগতের দিকে চাহিয়া বলিল, "ঠিক্ বলেছ, দেখ দশটা বেজে গেছে এখনো আমার ছুটি নেই; এই দেখ আবার চিঠি নিয়ে চলেছি।"

নবাগত বলিল,—"তুমি চিঠি নিয়ে যাচ্ছ? আমিও এইমাত্র চিঠি দিয়েই আসছি, বলব কি দুঃখের কথা, বাবুর জরুরী চিঠি, না দিলে আমার মাথা থাকৃতো না, আবার এদিকে প্রমোদ বাবুর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, কত কষ্টে যে দরজা খুলিয়ে চিঠিখানা দিয়ে এসেছি তা ভগবানই জানেন।"

ভৃত্য বলিল,

"সে কি কথা! আমিও যে প্রমোদ বাবুকে জরুরি চিঠি দিতে যাচ্ছি, যদি দরজা বন্ধ হয়ে থাকে তো কি হবে? তুমি কি করে দিলে?"

সে ব্যক্তি বলিল, "ফটকের বাইরে যে দরোয়ান থাকে, সে আমার বন্ধু। তাকে বিশেষ ক'রে ধরায় দরজা খুলে সে চিঠি খানি একজন চাকরের হাতে দিলে, তাই রক্ষে।"

হিরণের ভৃত্য বলিল, "তবে কি আজ অন্য কারো চিঠি সে দরোয়ান প্রমোদ বাবুর কাছে নিয়ে যাবে না?"

অপরিচিত বলিল, "না, তা যাবে না—"

এই কথায় ভৃত্য ভাবিতে ভাবিতে বলিল, "তবে কি করব, তবে কি ফিরে যাব? কিন্তু বাবু বলেছেন, খুব জরুরি চিঠি—একবার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়ে দেখেই আসি।"

সে ব্যক্তি বলিল "যাওয়া মিথ্যে, আমি তো এই আসছি। দশটার সময় তাঁদের দরজা বন্ধ হয়ে যায়।"

ভৃত্য বলিল, "তবে আজ যাই, কাল আসব।"

অপরিচিত বলিল, "এ কি বিশেষ দরকারী চিঠি? আজ কি না দিলেই নয়?"

ভৃ। বাবু তো বলেছেন খুব দরকারী।

সে ব্যক্তি বলিল, "আহা, তবে অমনি ফিরে যাবে, তাতে তো তোমার মনীব রাগ করবেন?"

ভৃ। তা এতে আমার কি দোষ?

সে ব্যক্তি একটু দুঃখের সুরে বলিল,

"মনীবরা তা বুঝলে কি আর ভাবনা থাকত? তা ত তাঁরা বোঝেন না, যত দোষ নন্দঘোষের উপর চাপান্। এই আজ যদি আমি অত কষ্ট

ক'রে এই চিঠি খানি প্রমোদ বাবুকে না দিয়ে আসতাম, বাবু তাহ'লে নিশ্চয়ই আমার উপর রাগ করতেন।"

ভৃ। কিন্তু আমি কি করব বল? আমার তো আর তোমার মত সেখানে কেউ জানবি বন্ধু লোক নেই।

তাহার কথায় সে ব্যক্তির বড়ই সহানুভূতি হইল, সে বলিল,

"ভাই, বুঝেছি। আহা! অমনি ফিরে যাবে, তোমার মনীব কতই রাগ করবেন। দাও তবে আমিই নিয়ে যাই, আর একবার বন্ধুটীকে ব'লে ক'য়ে চিঠি খানি প্রমোদ বাবুকে দিয়ে আসি।"

তাহার দয়া দেখিয়া ভৃত্য বড়ই আপ্যায়িত হইল, বড়ই আহ্লাদিত হইয়া বলিল, "তা আমার জন্যে আবার তুমি সেখানে যাবে? বন্ধু কি আবার তোমার কথা রাখবে?"

অপরিচিত। আহা তোমার মনীব তোমাকে কত বকবেন, তোমাকে বাঁচাবার জন্য আমি আর এইটুক করতে পারিনে? তুমিও চাকর, আমিও চাকর, আমরা একজন অন্যজনের জন্য একটু কষ্ট করব না? একটু বিশেষ করে ধরলেই বন্ধু আমার কথা আবার রাখবে এখন।"

তখন ভৃত্য আহ্লাদে চিঠিখানি তাহার হস্তে দিল, তাহাকে সে কিছুমাত্র সন্দেহ করিল না। চিঠি লইয়া যে কাহারও কোন কাজে লাগিতে পারে, ইহা সে বেচারার বুদ্ধির অতীত। পত্র লইয়া অপরিচিত ব্যক্তি প্রমোদের বাড়ী অভিমুখে গমন করিল, দেখিয়া ভৃত্যও বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া হিরণকে বলিল,

"প্রমোদ বাবুর দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কত ক'রে চিঠি খানি দিয়ে এসেছি।"

হি। উত্তর কোথায়?

ভৃ। বাবুর সঙ্গে তো আর আমার দেখা হয় নাই, আমি বাবুর দরওয়ানের হাতে চিঠি দিয়ে চোলে এসেছি।

পত্রখানি আজই প্রমোদ পাইয়াছেন জানিয়া হিরণ নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু পত্র খানি কাহার হস্তগত হইল, তাহা বলা বাহুল্য। যামিনী মিত্রালয়ে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ভৃত্য সাজিয়া এই চিঠির জন্য প্রমোদের বাটীর কাছে পথে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পরিত্যক্তা

প্রমোদ আর কনককে ডাকেন না,—তাহার কাছে আসেন না, সে নিকটে আসিলে কথা পর্য্যন্ত কহেন না। স্বামী কনকের প্রতি অসন্তুষ্ট, নীরজাও আর তাহার দিকে ফিরিয়া চাহে না। অমন ভগিনীগতপ্রাণ, দেবদুর্ল্লভ ভ্রাতার যে অবাধ্য, এমন ভ্রাতার শত্রুকে যে মিত্র করিতে চায় তাহার সহিত আবার ভাব রাখিতে আছে! তাই নীরজাও আর কনকের কাছে বসে না, তাহার সহিত কথা কহে না, দেখা হইলে মুখ ভার করিয়া চলিয়া যায়, কনক কথা কহিতে গেলে মুখ ফিরাইয়া অর্দ্ধ উত্তর দিয়া কাজের ভান করিয়া সরিয়া পড়ে। এত বড় বাড়ীটা কনকের পক্ষে যেন শ্মশানপুরী। এখানে আপনার বলিয়া দুট স্নেহের কথা বলিতেও তাহার কেহ নাই। এমন কি দাসদাসীরাও তাহার পক্ষ লইয়া একটা কথা কহিতে সাহস করে না। বামা তাহার সেই যে দরদের দাসীটি, অল্প দিন হইল তাহারও মৃত্যু হইয়াছে। কনক এই অন্ধকার রাজ্যে এখন নিতান্ত অসহায় নিতান্ত একাকী।

একদিন নীরজার মুখ খানি শুষ্ক বিষন্ন দেখিয়া কনক সাহসে ভর

করিয়া বলিল, "নীরজা, কেন ভাই, তোর মুখখানি অত শুক্‌নো? কিছু অসুখ ক'রেছে?"

নী। কি আর অসুখ করবে?

ক। তবে তোমার মুখ অত শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

নী। আমার ঐ রকমই মুখ।

ক। আমি কি ভাই, তোমার মুখ আর কখন দেখি নি?

নী। আমার মুখ আর তুমি দেখবে কেন? তোমার দাদার মুখই বা তুমি দেখবে কেন? তোমার হিরণের মুখ দেখগে।

কনক কষ্টে লজ্জায় অপমানে নিরুত্তর হইয়া রহিল।

সেদিন দ্বিপ্রহরে আহারান্তে প্রমোদ শয়নকক্ষে বিশ্রাম করিতে আসিয়া নীরজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "নীরজা তোমার ভাই কি হয়েছে? কেন অত বিষণ্ণ কমলিনি আমার?"

নীরজা বলিল, "তাও কি বুঝতে পার না সোণার চাঁদ? তোমাকে অসুখী দেখলে আমার মনে কি সুখ থাকতে পারে? সকালে তুমি অমন ভাবে চলে গেলে সেই থেকে—"

"আমি বিষণ্ণ হলেই তুই বিষণ্ণ হবি? তোকে বিষণ্ণ দেখলে যে আমার বুক ফেটে যায় সোণার কমল—"

"আর তোমাকে বিষণ্ণ দেখলে যে আমি মরে যাই সোণার মাণিক।"

ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিমাণে উভয়ের প্রেমময় বাহুবন্ধনে ও অধর-মিলনে তাঁহাদের অসুখঅশান্তি অচিরাৎ অতলসুখমগ্ন হইল। প্রমোদ বলিলেন—"এখানে থাকলে দেখছি আমাদের কারোই মন ভাল থাকবে না, বাড়ীর বাতাসটা কিরকম যেন অসুখ অশান্তিতে ভ'রে উঠেছে। চল দিন কতকের জন্য বোটে ক'রে বেড়িয়ে আসা যাক্।"

শুনিয়া নীরজার আহ্লাদ ধরিল না। সে প্রস্তাব করিল "তবে কানপুরে চল। অনেকদিন বাবাকে দেখিনি, মনটা ব্যাকুল হয়ে পড়েছে, আর—আমাদের বনটিকে, কুটিরটিকেও চল একবার দেখে আসি।" প্রমোদ আর একবার পূর্ব্বাভিনয় করিয়া সহাস্যে বলিলেন, "আমিও তাই মনে করেছি। কিন্তু বনের পাখীটি বন দেখে যেন শিকল কাটে না।"

ক্রমে দু-এক দিনের মধ্যেই তাঁহাদের বেড়াইতে যাইবার সমস্ত উদ্যোগ হইয়া গেল।

সকলই প্রস্তুত। দ্রব্য সামগ্রী যা কিছু বোটে উঠিতে বাকী ছিল সকলি উঠিল। দাসদাসীর কোলাহল আরম্ভ হইল। কনককে একাকী ফেলিয়া আজ তাঁহারা বোটে যাইবেন। অন্য সময় হইলে তিন জনেই যাইতেন; কিন্তু এখন কনক তাঁহাদের চক্ষের শূল, তাহাকে একাকী কষ্ট ভোগ করিবার জন্য রাখিয়া, তাঁহারা দুই জনেই বেড়াইতে চলিলেন।

কনক সেই সকাল হইতে একাকী বারান্দায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বোটে জিনিসপত্র উঠান দেখিতেছিল এবং কাঁদিতেছিল। যে ভ্রাতার জন্য আপনার জন্মের সুখ বিসর্জ্জন দিল, প্রাণ হইতে প্রিয়তম, আপনার হইতেও আপনার, হৃদয়সর্ব্বস্ব হিরণকে পর্য্যন্ত আজীবন কষ্টে ফেলিল, যে ভ্রাতার কষ্ট হইবে বলিয়া সে হিরণকে বিবাহ করিতেও অসম্মত হইল, সেই ভ্রাতার আচরণে কাঁদিবে না?

নীরজা আজ আহ্লাদে পরিপূর্ণ। প্রথমতঃ কানপুরে বেড়াইতে যাইতেছে, আবার পিতাকে দেখিবে,—তাহার বাল্যসখীদের দেখিবে, সেই আজন্মপরিচিত অরণ্যভূমি—যেখানে প্রমোদকে প্রথমে দেখিয়াছিল সেইখানে আবার একত্রে দুজনে বেড়াইতে পারিবে,—এই সকল সুখের কল্পনা,—ইহার উপর আবার একটা গর্ব্বময় উচ্ছাস যে, তাহার সুখের

জন্যই এ সকল আয়োজন!—নীরজার আহ্লাদ দেখে কে? তাহার ঈষৎ দর্পপূর্ণ পদনিক্ষেপ, তাহার ওষ্ঠাধরের বিকশিতভাব, তাহার চক্ষুর কটাক্ষ-আস্ফালন, সকলই তাহার উল্লাসভাবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

বেলা দ্বিপ্রহরে নীরজা বোটে উঠিতে যাইবার সময় সিঁড়িতে নামিতে নামিতে হস্তের পানের ডিবা দাসীকে দিয়া বলিল,

"ষাদি, কনক, কি কর্‌ছেরে?"

বোধ হয় কনককে একাকী রাখিয়া যাইতে নীরজার এক একবার মন কেমন করিতেছিল। নীরজা হৃদয়েব অন্তরতল পর্য্যন্ত খুঁজিয়া দেখিলে হয়তো দেখিতে পাইত যে, সে এখনও কনককে একটু একটু ভালবাসে, নহিলে তাহার জন্য অতটুকু কষ্টই বা হইবে কেন? নীরজার্‌ অনেকবারই মনে হইতে লাগিল, আহা কনক যদি আগেকার মতই থাকিত, না বদলাইয়া যাইত তো বেশ হইত! নীরজার কথায় দাসী বলিল, "দিদিঠাকরুণ বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে জিনিষপত্র তোলা দেখছেন; আহা! বৌঠাকরুণ, তাঁকে সঙ্গে নিলেনা কেন গা? আহা তাঁর মুখটি শুকিয়ে গেছে।"

শুনিয়া নীরজার একটু মমতা হইল। দাসী আবার বলিল, "দেখ বৌঠাকরুণ, দিদিঠাকরুণ দিনকের্‌ দিন শুকিয়ে যাচ্চেন, তাই পাড়ার অনেকে অনেক কথা বলে।"

নী। কি বলে।

দাসী। বলে,—ওমা, অমন লক্ষ্মী বোনটি, যেমন রূপে তেমনি গুণে, মুখে যেন কথাটি নেই; তা ভাইটা বুঝি কষ্ট দেয়, নইলে অমন শুকিয়ে যাচ্চে কেন? ভাইটা ছেলেবেলা হতে বড় দুরন্ত।

শুনিয়া নীরজা জ্বলিয়া গেল। কনকের জন্য প্রমোদের এত জ্বালা,

আবার তার উপর এই অপবাদ! কনক পোড়ারমুখী কি প্রমোদকে কষ্ট দিতেই জন্মিয়াছিল? কনকের উপর এতক্ষণ যে মমতাটুকু সে অনুভব করিতেছিল এই কথায় তাহা একেবারেই লোপ পাইয়া গেল। সে ক্রুদ্ধ হইয়া ভাবিল, বোটে গিয়াই এ কথা আগে স্বামীকে বলিয়া, ইহার একটা প্রতিকার বিধান করিবে!

একে একে তাঁহারা বোটে উঠিলেন,—কনক দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল; যখন বোট ছাড়িয়া দিল, তাঁহারা দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া পড়িলেন, তখন কনক ঘরে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ছিন্নতন্ত্রী

ক্রমে অপরাহ্ন কাল আগত; অল্প অল্প মেঘ করায় বৈকালেই সন্ধ্যা সন্ধ্যা বোধ হইতেছে। বাতাস বেশী না থাকায় নদী এখন প্রশান্ত, নিস্তব্ধ, তাহাতে তরঙ্গ-উচ্ছাস নাই। নিঃশব্দে জাহ্নবী নদী মুমূর্ষু ব্যক্তির জীবনাশার ন্যায় বহিয়া যাইতেছে।

নদীর ধারে বারান্দায় বসিয়া কনক একখানি পত্র পড়িতেছিল। পত্রখানি হিরণের। কিছু পূর্ব্বে পত্রখানি কনক পাইয়াছে। কনকের মুখখানি কি মলিন, কি বিষণ্ণ! দৃষ্টি কি ঘোরতর যন্ত্রণাব্যঞ্জক, অথচ শূন্যময়, যেন কি দেখিতেছে কি পড়িতেছে সে জানে না, কেবল তাহাতে একটি অসহ্য বেদনা অনুভব করিতেছে মাত্র। কনক চিঠিখানি দুই একবার মনে মনে পড়িল, তাহাতে যেন ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়া আর একবার মৃদু-উচ্চারণে পড়িতে আরম্ভ করিল,—

"কনক, প্রেমময়ি, আমার কনক,

"কিন্তু এ জীবনে আর তাহা হইল না। তবুও একবার তবুও এই শেষবার তোমাকে 'আমার' বলিয়া চিরজীবনের অতৃপ্ত সাধ মিটাইব। কনক, আমার হৃদয়ের কনক, কোন সম্বোধনেই আমার আশ মিটিতেছে না, পৃথিবীতে আমার ভালবাসার মত কোন সম্বোধনই খুঁজিয়া পাই না, আমার সর্ব্বস্বধন, আমি চলিলাম।

হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সম্বোধন করিয়া গেলাম, তুমি কি আমার স্পর্দ্ধায় দোষ লইবে? প্রিয়তমে, অভাগা দীন অসুখী বলিয়া অপরাধীর মুক্তকণ্ঠের এই শেষ উচ্ছ্বাসে দোষ লইও না। কনক, আমি তো মরমের নিভৃত বিজনে শত শতবার দিনে নিশীথে এইরূপ সম্বোধন করি, আজ, মুক্তকণ্ঠে তোমাকে তাহা বলিলাম বলিয়া কি তুমি দোষ লইবে?—আমার এই শেষ বিদায় বলিয়াও কি আমাকে ক্ষমা করিবে না? না, কনক, তুমি মমতাময়ী, তুমি দেবী, তুমি ইহাতে কখনই অপরাধ লইবে না। অভাগার এই শেষ চিহ্ন বলিয়াও অন্ততঃ মার্জ্জনা করিও। মুখে তোমাকে কখনো সাহস করিয়া প্রাণোত্থিত আদরের সম্বোধনে ডাকিয়া সাধ মিটাইতে পারি নাই; পত্রে আজ জনমের মত সে সাধ মিটাইলাম, কনক ক্ষমা করিও। কনক, আমি আজ সকালে তোমার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ কামনায় গিয়াছিলাম,—কিন্তু তিনি আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন, আমার সহিত তাঁহার আর দেখা হইল না, সুতরাং তোমাকে পাইবার আমার যে বিন্দুমাত্র আশা ছিল, তাহাও অবসান হইল। এখন আমি দৃঢ়সঙ্কল্প; আমি চলিলাম। সমস্তই ঠিক, কাল প্রাতঃকালেই এই স্থান হইতে চলিয়া যাইব। কয়েক দিন ধরিয়া তোমাকে ভুলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি কিছুতেই পারিতেছি না। যত চেষ্টা করি, তোমার সেই মধুর প্রসন্ন-মূর্ত্তি—তোমার সেই মমতাময়ী দেবীমূর্ত্তি আরও জলন্তরূপে দেখিতে,পাই, তোমাকে দেখিবার সাধ আরো

বৃদ্ধি হয়। না, কনক আমি আর তোমাকে ভুলিতেও চেষ্টা করিব না—তুমি আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব, তুমি আমার দেবতা, তোমাকে পাইলাম না বলিয়া তোমাকে ভুলিব! আমার কনককে ভুলিব! চিরজীবন কষ্টে কাটুক, হৃদয় চিরজীবন যন্ত্রণায় দহিতে থাকুক, তবুও কনক তোমাকে ভুলিব না, মনে মনে আজীবন তোমাকে পূজা করিয়া কাটাইব,—ঐ মধুর প্রতিমাখানি ধ্যান করিয়াই জীবন কাটাইব!

কনক! আমি যে দিন হইতে তোমাকে দেখিয়াছি সেই দিন হইতে এ হৃদয় তোমার মূর্ত্তিতেই পূর্ণ রহিয়াছে, সেই দিন হইতে পৃথিবীর অন্য সকল সুখেই জলাঞ্জলি দিয়াছি, কেমন করিয়া সেই হৃদয়াঙ্কিত কনককে আজ আমি ভুলিব! একদিন আশা ছিল তোমাকে পাইয়া সুখী হইব, সে আশা আর নাই, তবে আমি আর কোন আশায় এখানে থাকিব! আমি চলিলাম, ঐ প্রতিমাখানি হৃদয়ে ধরিয়া চিরজীবনের সুখশান্তি বিসর্জ্জন দিয়া দেশান্তরে চলিলাম। কনক, অভাগা হিরণের একমাত্র এই বাসনা—একমাত্র এই প্রার্থনা, তুমি সুখে থাক!

জীবনে মরণে তোমারি।"

চিঠি পড়া শেষ হইলে কনক ভাবিতে লাগিল—"কনক অভাগিনী, কনক চিরদুঃখিনী। ভ্রাতার জন্য কনক চিরসুখ ত্যাগ করিল, ভাই তবুও কনককে ভালবাসিলেন না। প্রাণের হিরণ—হৃদয়সর্ব্বস্ব হিরণ তিনিও আর কনককে ভালবাসেন না, নহিলে কেমন করিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন! কনককে এই ঘোর যন্ত্রণাসমুদ্রে ভাসাইয়া কেমন করিয়া হিরণ তাহার সহিত চিরসম্বন্ধ লোপ করিবার কথা মনে আনিলেন! তাহাকে এইরূপে বিসর্জ্জন দিয়া না যাইলে তবু কালে তাহাদের মিলন-আশা থাকিত, তাহার ভ্রাতার কি ভ্রম আর কখনই ঘুচিত না? ঘুচুক না ঘুচুক সেই দূরকল্পিত আশাতেই কি তাহারা ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিত না? হিরণ কনককে তেমন ভালবাসেন

না, তাই তিনি এরূপ সঙ্কল্প করিতে পারিলেন, কই কনক তো এমন কথা মনেও আনিতে পারে না! হিরণই যখন তাহাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন, কনকের তখন আর বাঁচিয়া কি হইবে? কি আশায় আর সে এই অসীম যন্ত্রণা সহ্য করিবে।”

সহসা এই সময় বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। সেই অল্প অল্প মেঘরাশি গাঢ়তর হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার করিয়া ফেলিল, বিকট গর্জ্জনে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ও আরম্ভ হইল। কনক সেই নিবিড়-মেঘাচ্ছন্ন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিবর্ষণশীল আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। শূন্যময় দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া আপন মনে কাঁদিয়া উঠিল; আবার তখনই অশ্রু-বারি মুছিয়া কি ভাবিতে লাগিল, কি যেন একটা কথা মনে আনিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না; সেই অন্ধকারময় আকাশ দেখিয়া যেন তাহার কি একটি গান মনে আসিয়াও আসিতেছিল না—তারপর সহসা গাহিয়া উঠিল—

আকাশের ঐ মেঘ এখনি তো ছুটিবে,
আবার জোছনা ভাতি এখনি তো ফুটিবে,
কিন্তু লো স্বজনি আর হৃদয়ের এ আঁধার,
এ জনমে অভাগীর কভু না ঘুচিবে।
জীবন বরষা যদি—বহায় শোণিত নদী
তবু এই আঁখিধার আর না মুছিবে।

আবার সহসা বিকট গর্জ্জনে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, কনকের দৃষ্টি ঝলসিয়া দূরে বজ্রাঘাত হইল। বালিকা কখনও উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিত না, আজ অজ্ঞানের মত উচ্চৈঃস্বরে আর একটি গান ধরিল, গাহিতে গাহিতে বজ্র ধরিবার আশায় যেন ছুটিয়া বারাণ্ডা হইতে উঠিয়া গেল।

আজ ওরে বজ্র তোরে কখনো না ছাড়িব,
আটকি হৃদয়ে তোরে এ হৃদয় দহিব।

হৃদয়ে কি কাজ আর, পুড়ে হো'ক ছারখার,
হৃদয় সর্ব্বস্ব ছেড়ে হৃদয় কেন রাখিব।
এ প্রাণ জীবন হৃদি তাহারি না হোল যদি
আমারি বা হবে কিসে, পর তারে ত্যেয়াগিব।

কনক উদ্যানে আসিয়া গঙ্গাতীর দিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া বাড়ীর সীমানা অতিক্রম করিল; অনাথিনী উন্মাদিনীবেশে সেই ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগে একাকিনী গান গাহিয়া গাহিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ঝড় বৃষ্টিতে দাসদাসীগণ কেহই তাহাকে বাটী ত্যাগ করিবার সময় দেখিতে পাইল না।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অন্ধকারে তারকা

রাত্রি অবসান প্রায়, ঝটিকাও প্রায় নিবৃত্তি হইয়াছে, আকাশও তেমন অন্ধকার নাই।

সমস্ত নিশার পর্য্যটনে অবসন্ন হইয়া, গাছে, শাখায়, কণ্টকে দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দীনবেশে আলুলায়িত কুন্তলে উন্মাদিনী বালিকা গান গাহিতে গাহিতে গঙ্গাতীরস্থ একটি মুক্ত অট্টালিকাদ্বারে প্রবেশ করিল। ভিতরে ঢুকিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল, সেইখানে হিরণকুমারকে দেখিয়া বালিকা অস্ফুট চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। হিরণকুমার বাহিরে বারান্দায় বসিয়াছিলেন! সমস্ত রাত্রি তিনিও চক্ষুর

পাতা বোজেন নাই, যতক্ষণ ঝড় বৃষ্টি হইতেছিল বারাণ্ডায় বসিয়া সেই অন্ধকার ঝটিকাময় নিশার সহিত আপনার অদৃষ্টের তুলনা করিতেছিলেন। মধ্যরাত্রে কেবল একবার তাঁহার সে চিন্তা ভঙ্গ হইয়াছিল। রামধন কতকগুলি পুলিসের লোক সঙ্গে কয়েক জন দস্যুকে ধৃত করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছিল। আবার তাহারা আসিতে পারে এই ভাবিয়া সদর দ্বার খোলা রাখিয়াই তিনি উপরে গিয়া চৌকিতে বসিয়াছেন মাত্র এই সময় সহসা কনককে এই অবস্থায় দেখিয়া তিনিও আশ্চর্য্য হইলেন। কনক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, তিনিও অজ্ঞানবৎ তখনি তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া পালঙ্গে আনিয়া শয়ন করাইলেন এবং তাহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে কনকের মোহ ভাঙ্গিল, হিরণকে দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল,

"তুমি কে? দেবতা? আমি যে তোমাকে ধ্যানে দেখেছি। আমি কি গান গাচ্ছিলুম, মনে করে দেও তো, আমি গাই।"

হিরণ দেখিলেন, কনক উন্মাদিনী। তাহার কথা শুনিয়া তাহার সেই মোহময় আলুথালু বেশ দেখিয়া হিরণের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

বলিলেন, "কনক আমার, আমি যে তোমার হিরণকুমার, আমাকে চিনতে পারছ না?"

উন্মাদিনী বলিল, "হিরণকুমার! কৈ তোমার মুখ আমাকে ভাল করে দেখাও দেখি। কনক শয্যা হইতে উঠিয়া বসিল, হিরণকুমারের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া তাহার হাত খানি স্বহস্তে লইয়া দেখিয়া দেখিয়া বলিল, "ঠিক বলেছ, তুমিই হিরণকুমার; হিরণ, একটি গান কর না। আমি গাব? তুমি শুনবে?" বালিকা গাহিল,

"আঁধার নিশীথে একা আমি অভাগিনী—

না, একি! তুমি দেবতা! কৈ আমার হিরণ কোথায় গেলেন? হিরণ—হিরণ—চিরবিচ্ছেদ—চিরবিচ্ছেদ—কি?"

বালিকা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শয্যা হইতে উঠিয়া হিরণের পদ গ্রহণ করিয়া বলিল,

"দেব, আমি তোমার পূজা করব, আমাকে বর দাও, আমার হিরণ কোথা ?"

হিরণকুমার তাহাকে উঠাইয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "কনক, আমি যে তোমার হিরণ, কনক আমার, তুমি উন্মাদিনী !"

কনক বলিল, "তুমি দেবতা, তুমিও কাঁদ, সকলেই কি কাঁদে, তবে আমিও কাঁদি।" বালিকা হিরণের কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাঁদিতে লাগিল। হিরণ তাহাকে শোয়াইবার জন্য হাত ধরিয়া বিছানায় বসাইয়া বলিলেন, "কনক, শোও দেখি।"

নিদ্রায় শান্তি পাইয়া যদি কনকের জ্ঞান জন্মে, সেইজন্য তাহাকে ঘুম পাড়াইতে হিরণ ব্যস্ত হইলেন।

কনক বলিল, "তুমি বসে থাকবে, আমি শোব কেন ? তুমি দেবতা, তুমি আগে শোও।"

হিরণ নিরুপায় হইয়া বলিলেন, "তুমি না শুলে দেবতা রাগ করবে, তোমার কি ভয় হচ্ছে না।"

"রাগ করবে ? তবে আমি পালাই।" বলিয়া বালিকা আপনার আর্দ্র চুল লইয়া খেলিতে খেলিতে গুণ গুণ করিয়া গাহিয়া গাহিয়া, বিছানা হইতে উঠিল। হিরণ বিপদে পড়িয়া বলিলেন "না, না, রাগ করব না, তুমি শোও দেখি।" বালিকা তাঁহার কথা না শুনিয়া আপন মনে হাসিয়া উঠিয়া উল্লাসে করতালি দিয়া বলিল,

"মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, সেই সুর ! তোমার সেতার কৈ ? বাজাও আমি গাই,

ধরি সুর তানে মরমের গানে,
অবাধে, লো সই, গাহিব আজ ;

প্রাণ যারে চায়, মিলিবে গো তায়
লোকের কথায় পড়িবে বাজ।

হিরণ সেতার বাজাইতে জানিতেন, তাঁহার সেই ঘরেই সেতার ছিল, তিনি বলিলেন, "তুমি যদি শোও, তাহলে আমি সেতার বাজাব।" হিরণকুমার তাঁহার সেতারটি আনিলেন। বালিকা সেতার শুনিতে বড় ভালবাসিত, সে তাহা শুনিবার আশায় বিছানায় আসিয়া শয়ন করিল, বাজনার মধুর তানে কনককে ঘুম পাড়াইবার জন্য হিরণ আস্তে আস্তে সেতার বাজাইতে লাগিলেন। বালিকা শুনিতে শুনিতে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল,

"কই, কই, তোমার সে হাসি কই, তুমি আজ হাসবে না? তুমি যে আমার হিরণকুমার, একটিবার হাস না হিরণকুমার।"

উন্মাদিনীর কথায় হিরণকুমারের ওষ্ঠাধর ঈষৎ বিষাদময় হাসির রেখায় অঙ্কিত হইল, তাহা দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বালিকার চক্ষু বুজিয়া আসিল, ক্রমে ক্রমে সেই পদ্মনেত্র নিমীলিত হইল, বালিকা ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার সেই ঈষৎ ভিন্ন ওষ্ঠাধরে মৃদু হাসির রেখা শোভিত হইয়াই রহিল।

হিরণকুমার তাহাকে নিদ্রিত দেখিয়া সেতার রাখিয়া তাহার সুষুপ্ত-মুখকান্তি দেখিতে লাগিলেন। পাছে নিদ্রা ভঙ্গ হয় সেই ভয়ে হিরণকুমার প্রতিক্ষণে ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। প্রত্যেক বায়ুর শব্দে হিরণের মনে হইতে লাগিল, বালিকা উঠিয়া পড়িবে। তিনি ভয়ে ভয়ে যাহাতে তাহার ঘুম না ভাঙ্গে তাহা দেখিতে লাগিলেন। এই সময় সহসা মনুষ্য পদশব্দ হইল, হিরণ সৌৎসুক্যে সেই দিকে কাণ পাতিলেন। পদশব্দ আরো সুস্পষ্ট হইল, বুঝিলেন গৃহমধ্যে এখনই কেহ প্রবেশ করিবে। তিনি তাহা নিবারণ করিতে অতি ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া গৃহ হইতে উঠিয়া গেলেন।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ঝটিকাবসানে

এদিকে প্রমোদ ও নীরজা ঝড়ের উপক্রম দেখিয়া তীরে বোট লাগাইতে কহিলেন। কিন্তু বোট না লাগাইতে লাগাইতেই প্রবল বেগে বাতাস বহিতে লাগিল, মাঝিরা অতিশয় যত্ন করিয়াও বোট শীঘ্র তীরে লাগাইতে পারিল না। ঝড়ের অপ্রতিহত প্রভাবে বোট ক্রমাগত উজানে তাঁহাদের বাটীর দিকেই যাইতে লাগিল; মাঝিরা ক্রমে হাল ছাড়িয়া দিবার উদ্যোগ করিল। চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল; মাঝে মাঝে এক একবার বিদ্যুতের আলোকে গঙ্গার রুদ্র মূর্ত্তি, ও ছোট ছোট নৌকাগুলির বায়ুতাড়িত অবস্থা বোটস্থিত লোকদিগের মনে দারুণ বিভীষিকা-তরঙ্গ তুলিতে লাগিল। নীরজা প্রমোদের ভয়বিহ্বল বক্ষে মস্তক রাখিয়া অজ্ঞানপ্রায় হইয়া পড়িল। প্রমোদ নিরাশার বলে বলিষ্ঠ হইয়া মাঝিদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বোট বাহিতে আজ্ঞা দিতে লাগিলেন।

এদিকে বোট বায়ুভরে প্রধাবিত হইয়া কখনও উচ্চে, কখনও নীচে, কখনো যেন পর্ব্বতে, কখনও যেন পাতালে উঠিতে লাগিল। তাঁহাদের বাটী আর বহুদূর নাই, কিন্তু বোটও আর তিষ্ঠায় না। বাতাসের একটি প্রবল ঝঙ্কায় বোটের মাস্তুল ভাঙ্গিয়া কোথায় উড়িয়া গেল। পরে বোটখানিও তরঙ্গ প্রভাবে তীরে ধাক্কা খাইয়া বিচূর্ণ হইল।

সুখের বিষয় এই যে, প্রমোদ নীরজাকে বক্ষে লইয়া কূলের নিকট স্বল্প জলে লাফাইয়া পড়িতে পারিয়াছিলেন। অজ্ঞান প্রায় নীরজাকে-বক্ষে ধারণ করিয়া তিনি কিনারায় কিনারায় বাটী অভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

কিন্তু একে সেই বৃষ্টিধারাযুক্ত বাতাসের প্রবল বেগ তাহাতে আবার উন্মূলিত বৃক্ষশাখা প্রভৃতি প্রতিপদে তাঁহার গমনে বাধা দিতে লাগিল। তিনি সত্বর অগ্রসর হইতে না পারিয়া মূর্চ্ছাপন্ন নীরজাকে লইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। সহসা কিছু দূরে বৃক্ষের অন্তরালে ক্ষীণদীপালোক দৃষ্ট হইল, আশার আশ্বাসে বৃক্ষ কণ্টকাদির আঘাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, দ্রুতপদে তিনি সেই দিকে চলিতে লাগিলেন। কিছু দূর আসিলে সেই আলোটিও চক্ষুর অগোচর হইল; তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। নীরজাকে লইয়া তিনি কোথায় যান! বৃক্ষতলে দাঁড়াইবার যো নাই, প্রতিক্ষণে ঝড়ের বেগে শাখা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে! তিনি নিরাশচিত্তে মুহূর্ত্তকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া পড়িলেন, সহসা সেই ঝড় বৃষ্টি-গর্জ্জনের মধ্যে কোন মনুষ্যের কাতর-চীৎকার তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। সেই সময় বিদ্যুতালোকে তিনি দেখিলেন, এক জন মনুষ্য তাঁহার নিকট দিয়া অতি দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। আর একবার বিদ্যুৎ হানিল, তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সম্মুখে কিছু দূরে এক ধবলাকার পদার্থ। কোন ভগ্ন অট্টালিকা হইবে—এই আশা করিয়া সেই দিকে আসিলেন, কিন্তু সেখানে আসিয়া বিদ্যুতালোকে যাহা দেখিলেন, তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। দেখিলেন একজন মৃতপ্রায় মনুষ্য কষ্টব্যঞ্জক অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিতেছে।

প্রমোদ বুঝিলেন, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাহারই চীৎকার তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। এবং যে ব্যক্তিকে তাহার নিকট দিয়া পলায়ন করিতে দেখিলেন, ভাবিলেন, সেই ইহাকে আহত করিয়া গিয়াছে।

মূর্চ্ছাপন্ন নীরজা তাঁহার বক্ষে, আর আহত মুমূর্ষ ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে হয়তো যত্ন করিলে সে এখনো বাঁচিতে পারে, প্রমোদ যে কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। এই সময় আর এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া

দাঁড়াইল, সে আসিয়া প্রমোদকে এবং ভূপতিত ব্যক্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনারা বিপদে পড়েছেন? আমি চীৎকার শুনেই দৌড়ে এসেছি, কাছেই এই গাছের আড়ালে আমার কুটির, সেইখানে চলুন। আমি এ লোকটিকে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।"

তাহাকে দেখিয়া প্রমোদ যেন প্রাণ পাইয়া তাহার সহিত একত্রে কুটিরে আসিয়া পৌঁছিলেন। কুটিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গৃহ পার্শ্বে একটি অগ্নিপাত্র। তিনি তাহার নিকট একখানি মাদুরে নীরজাকে শয়ন করাইয়া উত্তাপ দিতে দিতে ক্রমে তাহার জ্ঞান সঞ্চার হইতে লাগিল।

এদিকে অপর ব্যক্তি সেই আহত ব্যক্তিকে মাটীতে ফেলিয়া দেখিল, একটি পিস্তলের গুলি তাহার স্কন্ধ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বুঝিল তাহা সাংঘাতিক নহে অল্প যত্নেই সে আরোগ্যলাভ করিবে। সে ক্ষতস্থান বন্ধনে যত্নপর হইল। ইহার মধ্যে নীরজাও সজ্ঞান হইয়া উঠিয়া বসিল। তখন প্রমোদ সুস্থির হইয়া আহত ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। নীরজাও বসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, দেখিবামাত্র সহসা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, প্রমোদও সন্ন্যাসীকে চিনিতে পারিলেন। চিনিয়া নীরজা পিতার নিকট আসিয়া ব্যাকুলভাবে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহাদের যত্নে সন্ন্যাসী অনেকটা শান্তিলাভ করিলেন, তাঁহার কথা কহিবার সামর্থ্য জন্মিল। তখন তিনি ব্যগ্রতা সহকারে বলিয়া উঠিলেন,

"তোমরা একজন কেহ এখনি পুলিষে যাও। নহিলে আজ এখনি হত্যাকাণ্ড হবে।"

সকলে আশ্চর্য্য ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, যেন তাঁহার কথার অর্থ বুঝিতে অক্ষম। পিতাকে কথা কহিতে দেখিয়া আহ্লাদে নীরজা তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। সন্ন্যাসীও

আহ্লাদে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসীকে ঈষৎ সুস্থ দেখিয়া শুশ্রূষাকারী বলিল "মশায়, আর ভয় কি, রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে। ভাগ্যিস্ গুলি হাড়ে লাগেনি শুধু মাংসের উপর দিয়েই চলে গেছে, নইলে কি আর রক্ষা থাকত? এখন ত আরামই হয়ে গেছেন বল্লে হয়। এখন বলুন দেখি কি ক'রে এ রকমটা হোলো?"

তাহার প্রতি এবার প্রমোদের দৃষ্টি পড়িল, তিনি দেখিলেন সে যামিনীর পূর্ব্ব ভৃত্য। যখন তাঁহারা কানপুরে বেড়াইতে যান সে তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিল। নীরজাও তাহাকে চিনিয়া আশ্চর্য্য-বিস্ফারিত-নেত্রে বলিয়া উঠিল, "আমি কি ঠিক দেখ্‌ছি? তুমি কি সেই নৌকার্ দয়াবান দাঁড়ি নও? তুমিই কি আমাকে অসীম বিপদে প্রথমে আশ্বাস দাও নি?"

রামধন সন্ন্যাসীর মুখে পানীয় দিতে দিতে বলিল, "হ্যাঁ আমিই সেই দাঁড়ি। তা সেই এক বিপদ আর এই এক বিপদ; কি করে এমনটা হোল মশায়?"

সন্ন্যাসী আরও কিছু সামর্থ্য পাইয়া বলিলেন, "বেণীঘাট থেকে পার্ব্বতী মন্দিরে যাচ্ছিলেম—ঝড় বৃষ্টি দেখে পথে একটী ভগ্ন দেবালয়ের মধ্যে আশ্রয় নিলেম। অনেকক্ষণ হল, ঝড় থামল না, কি করব ভাবছি, এমন সময় বিদ্যুতের আলোতে দেখলেম তিন চার জন লোক সেই দেবালয়ের দিকে আসছে। তারা এল, কিন্তু ঘরে না ঢুকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কি কথা বার্ত্তা কইতে লাগল—"

সকলেই উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, কি কথা!"

স। আমি সকল কথা শুনিতে পাই নি। কিন্তু মাঝে মাঝে দুই একটা যা' শুনলেম তাতে এইটে বুঝলেম যে তাদের অভিসন্ধি ভাল নয়।

ব্যগ্রভাবে সকলে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম?"

স। হিরণকুমার ব'লে একজনকে খুন করতে যাবার আগে তারা কজন মিলে আর একজন সঙ্গীর জন্য অপেক্ষা করছিল। অনেক ক্ষণ অপেক্ষার পর একজন বল্লে আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব, চল, যাওয়া যাক !"

অন্য সকলে। তারপর ?

স। তার পর, তারা গিয়েছে ভেবে আমি ঐ অভিসন্ধির কথা প্রকাশের অভিপ্রায়ে তাড়াতাড়ি মন্দির থেকে বাইরে এসে দেখি, দস্যুদের মধ্যে তখনো একজন যায় নি, কেবলমাত্র সেই যাবার উদ্যোগ করছে। আমাকে দেখে সে বুঝলে আমি তাদের সকল কথা শুনেছি, অমনি আমাকে লক্ষ্য করে পিস্তল ছুঁড়লে, আমি পড়ে গেলেম। পরে কি হল আর জানি না। যা হোক্ এখনি এ অভিসন্ধির কথা পুলিসে জানান দরকার।"

প্রমোদ বলিলেন, "নিশ্চয়ই।"

রামধন তখন সেই ঝড়বৃষ্টি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া পুলিসে সংবাদ দিতে চলিল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

পাপের ফল

কিছুক্ষণ পরে রামধন কুটিরে প্রত্যাগমন করিল; তাহার মুখচক্ষু ক্রোধ-পরিতৃপ্তি-জনিত হর্ষ-বিকম্পিত। সে আসিয়া প্রমোদকে বলিল, "মহাশয় খুনীদের মধ্যে যে প্রধান সেই ধরা পড়েছে। তিনি কে

শুনবেন ?—তিনি আপনার বন্ধু যামিনী বাবু, আমার আগেকার মনীব।”

শুনিয়া প্রমোদ ও নীরজা অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, সন্ন্যাসী একটু শান্তি পাইয়া তখন অল্প ঘুমাইতেছিলেন, তিনি একথা শুনিতে পাইলেন না। প্রমোদের কিন্তু ও কথায় বিশ্বাস হইল না, তথাপি তিনি আশ্চর্য্যভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “যামিনী বাবু এ ঘটনার মধ্যে কি করে আসবেন ? তিনি তো কলকাতায় !”

সে বলিল, “মশাই, সবটা শুনুন তো ; আমি পুলিসে খবর দিলেই অমনি জন কতক পুলিসের লোক এসে হিরণবাবুর বাড়ীর দুই পাশে লুকিয়ে রইল, আমিও তাদের সঙ্গে রইলাম।”

প্রমোদ বলিলেন, “একটা কথা আগে জিজ্ঞাসা করি হিরণ-কুমারটা কে ?

রাম। তিনি আলিপুরের ডিপুটিম্যাজিষ্টর, অল্পদিন হ’ল এখানে এসেছেন।

প্রমোদও সেই সন্দেহ করিয়া এ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সে আবার বলিল,

“আমরা লুকিয়ে আছি, কিছু পরে চারজন লোক আস্তে আস্তে বাড়ীর কাছে এসে দাঁড়াল, আর একজন একটু তফাতে রইল, তখনি আমরা সেই পাঁচজনকেই ধরে ফেল্‌লাম, তার ভিতর দেখি—যামিনী বাবু একজন।”

প্রমোদ আশ্চর্য্যভাবে বলিলেন, “তিনি তবে সেই সময় আর কোন কারণবশতঃ হিরণের নিকট যাচ্ছিলেন, এক সঙ্গে ধরা প’ড়ে ঐ দলে মিশে গেছেন।”

প্রমোদের অবিশ্বাস বাক্যে সে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, “তাই বটে। বড় সাধু পুরুষ ! কিন্তু তিনিই আপনাকে খুন করতে লোক

পাঠিয়েছিলেন। আর আমি আপনাকে মারতে রাজি হইনি তাই আমার এই দশা করেছেন, তাঁর ভয়েই তো আমার দেশ, পরিবার ছেড়ে এখানে পালিয়ে আসতে হয়েছে।"

তখন রামধন নীরজার অপহরণের কথা, প্রমোদকে হত্যা করিতে লোক প্রেরণের কথা, যাহা যাহা হিরণকুমারকে ইতিপূর্ব্বে সে বলিয়াছিল সমস্তই বলিল। বলিতে বলিতে আবার তাহার মুখচক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। শুনিয়া নীরজার হৃদয় যেন স্তম্ভিত হইয়া আসিল, প্রমোদ বিস্মিত অথচ অপ্রত্যয় ভাবে বলিলেন, "তা কি ক'রে হবে, আমি যে স্বচক্ষে অন্য একজন ভদ্র-লোককে পিস্তলহাতে ছুটে পালাতে দেখেছি।"

রামধন বলিল, "বুঝেছি, আপনি কাকে দেখেছেন? হিরণবাবুর কথা বলছেন বুঝি?"

প্রমোদ সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি কি করে জানলে?"

রামধন হিরণের বাড়ী গিয়া যাহা দেখিয়াছিল ও শুনিয়াছিল তখন সেই সকল বলিল।

প্রমোদ বলিলেন, "হিরণ তো ওরূপ বলতেই পারে, তার কথায় বিশ্বাস?"

রামধন রাগিয়া বলিল, "না ভদ্রলোকের কথায় বিশ্বাস নেই, খুনীর কথাই সত্যি। হিরণবাবু শুধু কি বলেছেন? আমাদের হরের কাছেই সব শুনেছি"।

মনের ঝোঁকে হরির নামটা আর সে ঢাকিয়া রাখিতে পারিল না। এবং একবার তাহার নামটা প্রকাশ করিবার পর তখন অসঙ্কোচে ভাল করিয়া আগাগোড়া সব কথা খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া প্রমোদ স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন, তথাপি কৈন সম্পূর্ণরূপে যামিনীকে দোষী ভাবিতে না পারিয়া, পরে এই বিষয়ের সম্পূর্ণ

অনুসন্ধান করিবেন স্থির করিলেন। এই সময় একজন বৃদ্ধা এই কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা সেই ভৃত্যের মাসী। সে কিছু দূরে পরপারে দেবদর্শনে গিয়াছিল, পথে ঝড় বৃষ্টি পাইয়া ভিজিতে ভিজিতে গৃহে ফিরিল। এখানে অনেক লোকজন দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত হইল, কিন্তু ইহাঁরা ঝড় বৃষ্টিতে এই কুটিরে আশ্রয় লইয়াছেন শুনিয়া তখন আশ্বস্তভাবে আস্তে আস্তে অগ্নির নিকট বসিয়া হস্তপদ সেঁকিতে সেঁকিতে অর্দ্ধেক আপনমনে অর্দ্ধেক প্রকাশ্যে বলিল,

"তা বাপু বেশ—এই ঝড় বৃষ্টি—এ সময়ে কি পথ চলা যায় বাপু! তোমরা এসেছ বেশ করেছ—বাবা, কি এক্ রোখা মেয়ে গা?"

নীরজা ভাবিল, বৃদ্ধা তাহাকে ভাবিয়াই বলিতেছে, ঈষৎ ক্রুদ্ধ, ঈষৎ অপ্রস্তুত ভাবে সে বলিল, "কেন, বাপু, আমি কি করেছি, আমাকে কিসে এক রোখা দেখলে?"

বৃদ্ধা। তুমি কেন গো? আজ এই দুর্য্যোগের সময় নৌকা থেকে কত কষ্টে বেঁচে যখন নদীর ধার দিয়ে বাড়ী আসছি, তখন দেখি একটি কাদের মেয়ে—আহা! এমন সুন্দর মেয়ে, কেউ কখনো দেখেনি—একেবারে যেন উন্মত্ত হয়ে ছুটে ছুটে বেড়াচ্চে। আহা! একরাশি চুল সব এলোথেলো, বৃষ্টিতে ভিজে গিয়ে সব সোটা সোটা হয়ে পড়েছে, তা দিয়ে আবার ঝর ঝর জল ঝরছে।

প্রমোদ ও নীরজা দুজনেই একত্রে বলিয়া উঠিলেন, "আহা! কাদের মেয়ে গা?"

বৃদ্ধা। ওগো, কাদের মেয়ে জানিনা, কেবল গান গায়। আমি শোধালাম, 'তুমি কাকে খুঁজছ গা?' তা সে বল্লে,

"হিরণ হিরণ সোণার বরণ,
যাঁরি হাতে বাঁচন মরণ।"

এই কথায় প্রমোদ অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "এ তো আমাদের কনক নয়? তার বয়স কত গো?"

বৃদ্ধা। এই বাপু পনর ষোল হবে।

এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত প্রমোদ নীরজাকে বলিলেন, "তুমি এইখানে থাকো। আমার নিশ্চয়ই মনে হচ্চে এ কনক, আমি একবার দেখে আসি।"

নীরজা বলিল, "কনক যদি এতক্ষণে আরবারের মত জলেই বা পড়ে গিয়ে থাকে?"

বৃদ্ধা। ওগো সে মেয়েটি জলে পড়েনি গো, আমি তাকে বল্লুম "আমার সঙ্গে আসবে," তা সে অমনি গান গাইতে গাইতে ঐ কোটা বাড়ীর ভিতর ঢুকলো, তারপর কি হয়েছে জানিনা। বৃদ্ধা প্রমোদের সহিত কুটিরের বাহিরে আসিয়া সেই বাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। তখন বিদ্যুতের মত প্রমোদ সেইদিকে ছুটিলেন! অল্পক্ষণের মধ্যেই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দ্বিতলে উঠিলেন। হিরণ ইহাঁরই পদশব্দ শুনিয়া কক্ষের বাহির হইয়াছিলেন। হিরণকে দেখিবামাত্র প্রমোদ উন্মত্তের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কনক কোথায়?" কথার গোলে পাছে কনকের নিদ্রা ভঙ্গ হয়, এই ভয়ে হিরণকুমার তাহাকে ধীরে ধীরে বলিলেন, "এই ঘরে, কিন্তু চুপ! চুপ! কনক ঘুমোচ্ছেন, গোল ক'রনা ঘুম ভেঙ্গে যাবে, ও ঘরে যেওনা।" প্রমোদ সে কথা অগ্রাহ্য করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। হিরণকুমার ব্যাকুল-ভাবে তাহার অনুসরণ করিলেন। কনকের শয্যাপার্শ্বে গিয়া প্রমোদ মনের ব্যগ্রতা ভরে ডাকিলেন,

"দিদি আমার, কনক!" হিরণ তাহা শুনিয়া মৃদুস্বরে ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "চুপ! চুপ! কথা কয়োনা, গোল ক্যোরোনা, এখনি কনকের ঘুম ভেঙ্গে যাবে।" প্রমোদ সে কথা না শুনিয়া কনকের

গলদেশ বেষ্টন করিয়া আগ্রহ সহকারে আবার ডাকিলেন, "দিদি আমার, কনক, ওঠ ওঠ আমার সঙ্গে একটিবার কথা কও।"

কনক জাগিয়া উঠিল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

বিজয়া

নিদ্রার মত মনের ব্যাধির মহৌষধ আর কিছুই নাই। কিছুক্ষণ ঘোর নিদ্রামগ্ন থাকিয়া কনক যখন জাগিল, তখন যেন তাহার ভ্রংশ-বুদ্ধি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। কিন্তু সহসা প্রমোদকে সেইরূপ আদরের ভাবে কথা কহিতে দেখিয়া সম্মুখে হিরণকুমারকে ম্লান বিষণ্নভাবে দাঁড়াইতে দেখিয়া, সে যেন কিছুই বুঝিতে পারিল না, তাহার মুখে কেবল আনন্দ বিভাসিত হইল। তাহাকে জাগরিত দেখিয়া প্রমোদ আহ্লাদে বলিলেন, "কনক, আমি তোর কাছে কত অপরাধে অপরাধী, কনক, দিদিটি আমার, আমি সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব; হিরণ যাই হোক, আমি তার সঙ্গে তোর বিবাহ দেব।"

তখন সমস্ত ঘটনা কনকের মনে পড়িয়া গেল, ভ্রাতার নিষ্ঠুরতা, হিরণের নিষ্ঠুরতা পর্য্যন্ত মনে পড়িল। কতদিন পরে তাহার ভাই তাহাকে আদর করিয়া ডাকিলেন, আবার হিরণকুমার তাহার শয্যার পাশেই দাঁড়াইয়া, কনকের এত আহ্লাদ যেন সহ্য হইল না, কনক আবার অন্ধকার দেখিল, মস্তক আবার ঘুরিয়া আসিল, হৃদয়ে রক্তের প্রবাহ ভীষণ বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, কনক বলিল,

"দাদা, এরূপ আদরের কথা আমি যে তোমার মুখে কখনো শুনি নি? আমার ভাগ্যে যে এমন সুখ কখনো হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি—"

কনকের উপাধান অশ্রুসিক্ত হইয়া প্রমোদের হাত ভিজিতে লাগিল। কনক সুখময়-বিষাদে অর্দ্ধ নিমীলিত-চক্ষে হিরণকুমারের দিকে চাহিল, চাহিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল,

"হিরণকুমার, এ জনমে আর হৃদয়ের সাধ পূরল না—কিন্তু প্রার্থনার যদি ফল থাকে, বিশুদ্ধ-প্রেমের যদি পুরস্কার থাকে, তা হ'লে মরণে আমার দুঃখ নেই, তা হলে পরলোকে আমাদের মিলন হবেই।" অতি কষ্টে এ কথাগুলি কহিয়াই কনক থামিল। কনকের কথার মর্ম্ম যেন হিরণকুমার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, যাতনাব্যঞ্জক শূন্যদৃষ্টিতে কেবল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন মাত্র। প্রমোদ আর অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

কনক আবার কথা কহিবার ইচ্ছায় মুখ খুলিল, অতি ধীরে ধীরে অতি কষ্টে বলিল—"হিরণকুমার, কোথায় তুমি? একটিবার শেষবার—ভাল ক'রে"

এইটুকু বলিয়াই কনক আবার ঢুলিয়া পড়িল;—আর কথা কহিল না।

প্রমোদ বলিলেন—"দিদি আমার অমন করছ কেন?" কনকের যন্ত্রণা বুঝিতে পারিয়া প্রমোদ কাঁদিয়া উঠিলেন। হিরণকুমার পাগলের মত প্রমোদকে বলিলেন "চুপ কর! কনকের ঘুম আসচে, তুমি ঘুম ভাঙ্গিও না।"

হিরণ কাছে বসিয়া শিশুর ন্যায় আস্তে আস্তে তাহাকে ঘুম পাড়াইতে লাগিলেন। কনক আর একবার চক্ষু খুলিয়া হিরণকে দেখিল, তাহার ওষ্ঠাধর মৃদু হাস্যে সুশোভিত হইল, মুখখানি একটি

অপূর্ব্ব সুখের ভাবে পরিপ্লুত হইল, কনকের আবার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল, ভ্রাতার হস্তে মস্তক রাখিয়া কনক অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িল, না ফুটিতেই মুকুল ঝরিয়া পড়িল, দীপ জ্বলিয়াই নির্ব্বাণ হইল। প্রমোদ বুঝিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, হিরণকুমার আবার বালকের মত বলিলেন—

"চুপ চুপ, কনকের ঘুম ভেঙ্গে যাবে।"

হিরণের ইচ্ছাই পূর্ণ হইল, কনকের ঘুম আর কখনই ভাঙ্গিল না, অনন্ত নিদ্রায় সে চিরশান্তি লাভ করিল।

উপসংহার

আরও কয়েক বৎসর অতীত হইয়াছে। এই অল্পকালের মধ্যেই ধ্বংসশীল জগতের ক্ষতিগ্রস্ত ভাগ কত পূরিয়া উঠিয়াছে। কত মরু কত শ্মশান শ্যামলক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, কত শুষ্ক নদনদী জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। এই অল্পকালের মধ্যেই কত দরিদ্র ধনবান হইয়াছে, কত পলাতক রাজা আবার আপন রাজ্যে অধিবেশন করিয়াছেন। কত মাতার পুত্রশোক লাঘব হইয়া আসিয়াছে; কত বন্ধু বন্ধুর শোক ভুলিয়াছেন, কত পত্নীব্রতস্বামী যাঁহারা একদিন স্ত্রীর নিকট শপথ করিয়া বলিয়াছিলেন, স্ত্রীর মৃত্যু হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদেরও প্রাণবিয়োগ হইবে, তাঁহারা আবার দ্বিতীয়বার দারগ্রহণ করিয়া সুখে সংসার নির্ব্বাহ করিতেছেন। প্রমোদও এই অল্পকাল মধ্যে কনককে ভুলিয়াছেন, কেবল মাঝে মাঝে ঃস্বপ্নের ন্যায় কখনও কখনও কনকের কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হয় াত্র। প্রমোদের এখন একটি কন্যা ও একটি পুত্র। তাহাদের দেখিয়া খান কোনও সময়ে প্রমোদের শৈশবকাল মনে পড়ে, একআধবার নককে মনে পড়িয়া একটু কষ্ট হয়, কিন্তু আবার নীরজার মুখের দিকে চাহিয়া সকল ভুলিয়া যান।

কনকের মৃত্যুর পর হইতে হিরণের উপর আর প্রমোদের বিদ্বেষ ব রহিল না; হিরণের তিনি বিশেষ বন্ধু হইয়া পড়িলেন, হৃদয়ের হৃত তাঁহার সমদুঃখী হইলেন। কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে যে ব্যক্তির দুমাত্র দয়া পাইলেও হিরণ চিরসুখী হইতে পারিতেন, এখন হার নিকট হইতে সহস্র মমতা পাইয়াও তাঁহার দুঃখের ভার দুমাত্র কমিল না। অনেক ক্ষতি কালে পূরণ হয় বটে, কিন্তু

সকলরূপ ক্ষতি কাল পূরণ করিতে পারে না, সকলরূপ যন্ত্রণা কাল নিবাইতে পারে না। কত মহা সমুদ্র লোপ হইয়াছে কালে তাহার চিহ্ন মাত্রও নাই, কত মহানগরী ধ্বংস হইয়াছে এখন তাহার নাম মাত্র অবশিষ্ট আছে; কত পর্ব্বতশৃঙ্গ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহা আর উঠে নাই, হিরণের ভগ্নহৃদয়ও আর জোড়া লাগিল না; তাঁহার হৃদয়ের আগুন আর নিবিল না!

একদিন প্রমোদ প্রত্যুষে উদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে নদী তীরে আসিয়া দেখিলেন, জলের অব্যবহিত উপরে, সোপানে এক ব্যক্তি শয়ান, মাঝে মাঝে সোপানপ্রতিহত জলরাশি উচ্ছ্বলিত হইয়া তাঁহার অঙ্গে ছড়াইয়া পড়িতেছে, সে ব্যক্তির তাহাতে চেতনা নাই যেন গভীর নিদ্রায় অভিভূত। প্রমোদ নিকটে আসিলেন, শোকবিহ্বল-চিত্তে দেখিলেন, সে ব্যক্তি হিরণকুমার—দেখিলেন হিরণকুমার মুমূর্ষু, প্রমোদ নিকটে আসিয়া তাহাকে সোপান হইতে উঠাইতে চেষ্টা করিলেন, তখন হিরণকুমার ধীরে ধীরে একবার চক্ষু উন্মীলিত করিলেন, অশ্রুময় নেত্রে প্রমোদের চক্ষুতে চক্ষু সংলগ্ন করিয়া অন্তিমকালের যাতনাকম্পিত স্বরে বলিলেন, "আমায় উঠিও না—আমি এইখানেই মরব, এইখানেই শুনেছিলাম, কনক আমাকে ভালবাসেন।

বলিতে বলিতে হিরণ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল; প্রমোদ বিষাদাকুলচিত্তে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হিরণের এই শেষ কথা গুলি অনেকদিন পর্য্যন্ত তাঁহার মনে াগিয়া ছিল।

সমাপ্ত।